শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক

ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সুহৃদবরেষু

ভূমিকা

এই উপন্যাসটি আমি লিখেছিলাম ১৯৬১ সালে। অধুনালুপ্ত একটি প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে। তারপরে এটি হারিয়ে যায়, দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে হঠাৎ-ই এক যোগাযোগে খুঁজে পেলাম। পাঠকদের এটি খুবই ভালো লেগেছিল।

জাহাজ তীরে লাগলে যে ঠিকাদাররা এর বিবিধ কাজ হাতে নেয়, তাদের জীবিকার সূত্রও বাঁধা হয়ে যায় এই জাহাজ বা জাহাজগুলোর সঙ্গে। তাদের নিজেদের বাড়িও যেন হয়ে ওঠে এক একটি জাহাজ; বাড়ির লোকজনও হয়ে যায় জাহাজী লোক। মাটির ওপর গড়ে ওঠা এই জাহাজ, আর জলের ওপর চলমান জাহাজ, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে বেড়ে ওঠে যে জীবন, সেই জীবন আর জীবন-যন্ত্রণা, আর তা থেকে উত্থিত যে উপলব্ধি, তারই পরিচয় এই উপন্যাসে বিধৃত।

কেন্দ্রে রয়েছে আমার দেখা একটি নারী চরিত্র, যিনি বাঙালী হয়েও বাঙালী নন, জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে তাঁর সেই বহুদিনের ফেলে-আসা 'দেশ'-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বাক্স থেকে বার করেন তাঁর জীর্ণ হয়ে যাওয়া 'মনসার ভাসান'-এর পুঁথিটি, দেশকে প্রাণপণে আবার ছুঁতে চান, কিন্তু পারেন না।

দেশ, ধর্ম আর ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাঁর আধুনিকমনা তরুণী নাতনীটি। এই তিনটিকেই সরিয়ে রেখে সে ছুঁতে চায় সমগ্র পৃথিবীকে। তার বাবা গ্রীক, মা ইজিপ্সিয়ান, দিদিমা বাঙালী তথা ভারতীয়। সেজন্য এই তিনটি দেশকেই সে ভালোবাসে। তার প্রশ্ন, তিনটি দেশকে যদি সমান ভালোবাসতে পারলাম, তাহলে সারা বিশ্বকে পারবো না কেন?

৭ বি / ১ সি, মহেশ দত্ত লেন,
কলকাতা-২৭

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখকের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ :

বন্দরে বন্দরে (বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত), নাট্যদেউলের বিনোদিনী, শচীন্দ্রনাথের কিশোর গল্প, জনপদবধূ, স্বাতীনক্ষত্রের জল, জলকন্যার মন, কর্ণাটরাগ, নগরনন্দিনীর রূপকথা, শান্তির স্বাক্ষর, দ্বিতীয় অন্তর, সীমান্তশিবির, সিন্দুর টিপ, তোমার পতাকা, অভিমানী আন্দামান, সীমাস্বর্গ, এ জন্মের ইতিহাস, পটমঞ্জরী প্রভৃতি।

সামনের জেটিতে একটা জাহাজ বাঁধা পড়ছে, কিন্তু তাদের জেটি শূন্য। গঙ্গার বুক থেকে ঢেউ চিকচিক করা সূর্যাস্তের আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ওপার থেকে ভেসে-আসা শঙ্খধ্বনি ক্ষীণ হয়ে কানে এসে বাজলো, দূরাগত ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ জলের বুক ছুঁয়ে ওর কাছে এসে যেন বলতে চাইলো, দিন শেষ হলো, এখনো বসে আছো ?

সত্যিই সে বসে আছে। পরণে সাদা প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট, হাতে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ। দুই তরুণ চোখে অপরিমিত আশার দীপ্তি। চুপ করে বসে আছে শিশির, কখন জাহাজ আসবে তার প্রতীক্ষায়।

সামনের জেটিতে জাহাজ লাগার ক্রি-রি-রিং শব্দ, পাইলট উঁচু ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন চোঙা মুখে করে। আর জেটির সম্মুখভাগে ক্যাপস্টানে দড়িটা ঘোরাচ্ছে খালাসির দল। এরা জাহাজের কেউ নয়। এরা পোর্টের খালাসি। গানের একটা ধুয়া তুলছে, রাতের আঁধার, ঝড়ের মেঘ। দুটিই ওদের প্রতিপক্ষ। রাতের আঁধারে পথ চলা কঠিন। ঝড়ের মেঘে নৌকোর গতি ঠিক রাখা ততোধিক কঠিন।

শিশির একটা ক্যাপস্টানের মাথায় চুপচাপ বসে আছে। এরই নাম এসপ্লানেড মুরিং। ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালে অতিকায় হাওড়ার পোলটা চোখে পড়ে। বিপরীত দিকে, গঙ্গার ওপারে, কলকারখানা, টিনের শেড। এ-সবই লক্ষে আসে। কিন্তু তার পিছনে কিম্বা তার সংলগ্ন কোথায় আছে দেবমন্দির, যেখান থেকে প্রতি সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি ওঠে, ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়।

মুন্সিজী কোথায় যেন গিয়েছিল, ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওর কাছে এলো, বললে,—এ শিশিরবাবু। আভি তক বসে আছেন ? আজ আর জাহাজ আসবে না আপনার, বাড়ি চলিয়ে যান।

এই মুন্সিজী এক অদ্ভুত মানুষ। মেটিয়াবুরুজের মুসলমান, কিন্তু ওদের বাড়িতে যখন-তখন আসে, সেজোবাবু মেজোবাবুর সঙ্গে গোপনে কী সব

ফিসফাস করে, আবার চলে যায়। সরু করে গোঁফ ছাঁটা, গোঁফের প্রায় সব কটা চুলই সাদা হয়ে গেছে, নিচের পাটি ওপরের পাটি মিলিয়ে বেশ গোটাকয়েক দাঁত নেই, পকেটে খুব ছোট্ট হামানদিস্তার ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো পেতলের একটি বস্তু আছে, পানের খিলি নিয়ে তাতে পিষে তারপর মুখে পুরে দেয়। পাতলা শুকনো চেহারার লোক, দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফিটের বেশি নয়, লম্বাটে মুখ। গায়ের রঙ খুব কালো না হলেও রোদে পুড়ে পুড়ে বেশ কালো দেখায়। ছোট ছোট গোল গোল ধরণের চোখ, ঘন ভুরুর নিচে কখনো সন্ধানী শ্বাপদের মতো জ্বলে ওঠে, কখনো প্রসন্ন কৌতুকে ঝিলমিল করতে থাকে। প্রায় রহস্যময় চরিত্র বলা চলে। কখনো মাথায় গোল কালো টুপি, কখনো আবার ফেজও পরে। তবে বেশির ভাগ সময়েই মাথায় কিছু থাকে না, ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো অনুক্ষণ দৃশ্যমান, অধিকাংশই পাকা। দাড়ি রাখলে স্বভাবতই পাকা দাড়ি হতো। গোঁফ পাকা, কিন্তু অদ্ভুত ওর ভ্রূ দুটি। ঘন কালো চুলে ভর্তি, সেখানে একটি-দুটিও শুভ্ররেখা চিহ্নিত হয়ে ওঠেনি।

লোকটা হাফসার্ট, পাজামা পরে। কখনো সার্টের নিচে আবার ধুতিও পরে। কখনো ধবধবে ফর্সা লক্ষ্ণৌর কাজ-করা নক্সা-কাটা ঝলমলে পাঞ্জাবি পরে চোস্ত্ পাজামার ওপরে। তখন শিরোদেশে শোভা পায় নক্সা-করা পাতলা সাদা কাপড়ের টুপি।

সেই যে হঠাৎ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঢেউ উঠেছিল একদিন? সেদিনও মুন্সিজী ঠিক এসেছে হিন্দু পাড়ায় বাবুদের বাড়িতে। পূজা আর্চায় কলা-পাতায় মুড়ে প্রসাদ নিয়ে গেছে বাল-বাচ্চাদের জন্য। তখন ধুতি-সার্ট পরা মুন্সিজীকে কে চিনবে অহিন্দু বলে? আর চিনলেও ও পাড়ার কেউ ওকে কিছু বলে না কখনো। কারণ, ও পাড়ার প্রাসাদোপম বাড়িগুলোর বড়ো-মেজো-সেজো-ছোটবাবুর দল ওকে দেখলেই ডাকে, গুজগুজ ফিসফিসের ধুম পড়ে যায়। শুধুই বা ওদের বাড়ি বা পাড়া কেন? অফিসপাড়ার লোকেরাও ওকে চেনে, ডেকে-ডুকে কথা বলে। এমন কি জাহাজের সঙ্গে ব্যবসা করে এমন যে সব কোম্পানী আছে, সে সমস্ত জায়গাতেই মুন্সিজীর যাতায়াত। কখন যে কোন্ বাড়ি থেকে ও বেরোবে, কোন্ বাড়িতে ঢুকবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সময় অসময় নেই। তাদের অফিস থেকে মুন্সিজী ভাউচার সই করে টাকা নেয়। আবার এ-ও জানে শিশির, তাদের মতো অন্য কোম্পানীতে গিয়েও মুন্সিজী ভাউচার

সই করে অবলীলাক্রমে টাকা নেয়। এ নিয়ে তারও কোনো মাথাব্যথা নেই, মাথাব্যথা নেই কোনো কোম্পানীর কোনো সেজোবাবু-বড়বাবুদের।

শুধু একটি দিন মাত্র মুন্সিজীর টিকিটিও কেউ দেখতে পাবে না। শত কাজ থাকলেও না। এমনকি জেটিতে জাহাজ বাঁধা, লোকজন নিয়ে হৈ-হৈ শব্দে কাজ চলছে, বড়বাবু-সেজোবাবুদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। কিন্তু মাথা খুঁড়লেও মুন্সিজীর সাক্ষাৎ যেদিন কেউ পায় না, সে দিনটি হচ্ছে, শনিবার।

ওদের বাড়ির মেজোবাবু যিনি, তিনি পায়ে একটু খোঁড়া। কখনো অফিসের বাইরে যান না। অফিসের বাইরে মানে, বাড়ির বাইরে। কারণ তাদের অফিসটা বাড়িতেই। জাহাজে যাওয়া, এজেন্টদের কোম্পানীতে গিয়ে সাহেবসুবোদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা, সে সব কাজে বড়বাবু-সেজোবাবু মত্ত থাকেন। মেজোবাবু নয়। তিনি টেবিলে মুখ গুঁজে লেখালেখির কাজ করেন শুধু।

এই মেজোবাবুর মেজাজ একটু গরম, সবাই এঁকে ভয় করে। বলা বাহুল্য, মুন্সিজীর গুজগুজ-ফুসফাস চলে এঁরই সঙ্গে বেশি।

এ-হেন মুন্সিজীকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা এসপ্লানেড মুরিং-এ দেখে শিশিরের প্রথমেই যেটা মনে হলো, সেটা হচ্ছে আজ তাহলে শনিবার নয়। শনিবার হলে ওকে চোখে কে দেখতে পাবে?

একা একা বসে বসে শিশিরেরও অস্বস্তি হচ্ছিল, ওকে দেখে একটু নড়ে-চড়ে বসলো, বললো, তুমি কোথা থেকে, মুন্সিজী?

মুন্সিজী ওর পাশটিতে ক্যাপস্টানের নিচে শানবাধানো জায়গাটায় অবলীলাক্রমে বসে পড়লো। পকেট থেকে ক্ষুদে হামানদিস্তাটি বার করতে করতে বললে,—আর বোলেন কেন! রিভার রিপাট আনতে গিয়েছিলুম।

'রিভার' কথাটা ঠিক বললেও 'রিপোর্ট' শব্দটা শুদ্ধ করে বললো না মুন্সিজী। এটা ওদের এক অদ্ভুত মানসিকতা। প্রচলিত ইংরেজি শব্দ ওরা অদলবদল করে নিজের মনের মতো করে বলবেই। যেমন জাহাজের 'ডেক ডিপার্টমেন্টকে ওরা বলবে, 'ডেক-ডিপাট।' 'ইঞ্জিন ডিপার্টমেন্ট'-কে বলবে 'ইঞ্জিন ডিপাট।' আবার কতগুলো শব্দকে একেবারে নতুন করে বানিয়ে নিয়েছে ওরা; ক্যাপ্টেনকে বলবে 'বাড়িওলা'।

যাই হোক, কোন্ জাহাজ কবে আসবে, কখন আসবে, কোন্ জেটিতে

লাগবে, এসবই পোর্ট কমিশনার্স অফিস থেকে ছেপে বেরোয়। আর বেরোয় সাধারণত বিকেলের দিকে। তাদের কোম্পানীর মতো জাহাজের বিভিন্ন ঠিকাদারী যারা করে, তাদের প্রত্যেকেরই ব্যবস্থা থাকে, বিকেলে লোক গিয়ে রোজ 'রিভার রিপার্ট' নিয়ে আসে। কখনো সে আনে, কখনো মুন্সিজী আনে, কখনো অন্য কর্মচারী কেউ আনে, কোনো ঠিক নেই।

শিশির সাগ্রহে বললে,—দেখি রিভার-রিপোর্টটা ?

মুন্সিজী তখন কাগজের মোড়ক থেকে খিলিপান বার করে হামানদিস্তায় থেঁতো করবার উদ্যোগ করছে। চুপসানো মুখে অল্প একটু হেসে বললে,—দাঁড়ান, পানটা খেয়ে লি।

তারপরে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—রিপার্ট দেখে আর কী কোরবেন ? আপনার জাহাজ আজকেই আসছে এক নম্বর ইসপ্লানেড ম্‌রিং-এ, বেলা পাঁচটার সোময়।

শিশির বললে,—পাঁচটা বাজতে বাকি আছে নাকি ? জাহাজের টিকিটিও তো দেখা যাচ্ছে না !

মুন্সিজী কথার ওপর কথাটা না বলে পান ছেঁচতে লাগলো তার ছোট্ট হামানদিস্তাটিতে। মুখে মৃদু মৃদু রহস্যময় হাসি। ধীরে সুস্থে পান ছেঁচে মুখে পুরে দিয়ে হামানদিস্তাটা পকেটে রাখলো। তারপরে মুখ ফেরালো শিশিরের দিকে। বললো,—গঙ্গামাইয়ার মর্জির কাছে ওদের টাইম-ফাইম সবকুছ অদল বদল হইয়ে যায়। দেখেন, কোথায় চড়ায়-উড়ায় আটকে-উটকে গেছে কিনা !

শিশির শিউরে উঠলো। জাহাজ চড়ায় আটকানোর অনেক গল্প সে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে, এই অমুক জাহাজ চড়ায় আটকে ডুবে যাচ্ছে, সবাই নেমে গেছে জাহাজ থেকে, ক্যাপ্টেন নামছে না, জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ডুববে, জাহাজ ছাড়া ক্যাপ্টেনের আর জীবন কী ?

এই ধরনের অনেক গল্প। যাদের অফিসে সে কাজ করে, সেই বাবুদের এই ঠিকাদারী ব্যবসা তিন পুরুষের। তার বিধবা মা দেশ থেকে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে এবাড়িতে কাজ করতে এসেছিল ঝি-হিসাবে। তার শিশির নাম এবাড়িরই কারও দেওয়া। এঁরা জাতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে তা নয়। মা মারা যাবার পর থেকে এ বাড়িতেই সে আছে, এ বাড়িতেই সে বড়বাবু-মেজোবাবু-

সেজোবাবুদের ফাইফরমাশ খেটে মানুষ হয়েছে। সারা বাড়িতে শুধু রব উঠতো,—শিশির, শিশির! এর সিগারেটটা নিয়ে এসো, ওর খিলি পান, দিদিমণিদের চকোলেট।

মা বেঁচে থাকতে কাছের এক পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল মা। সেখান থেকে করপোরেশন-স্কুলে। যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ, টাকা-আনা-পাইয়ের অঙ্ক, আব 'ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান' করতে না করতে মা-ও হঠাৎ ভেদবমি করে মরে গেল, কিছু দিন পরে তারও লেখাপড়া যাকে বলে, তা একরকম শিকেয় উঠলো। তাবপরে আব কী? ঝি-চাকরদেব মধ্যে আগাছার মতো বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো শিশির। এই শিশির মুন্সিজীদের কাছে যে কী করে একদিন শিশিববাবু হয়ে উঠলো, সে এক ইতিহাস।

শিশিব বাড়ির আর সব চাকর বাকরদের মতো নয়। কারণ, তারা মাস গেলে মাইনে পায়, বছবে ছুটিও পায় বাড়ি যাবার জন্য। কিন্তু তার সে সব ছিল না। সে দিনের মধ্যে অসংখ্যবার দোতলা-তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে-নিচে নামছে ছুটে ছুটে। তবু ধমকের বিরাম নেই।

— এই শিশির কোথায় থাকিস?

সে মুখ ম্লান করে কিছু বলতে যেতেই—

—আবার মুখে মুখে তর্ক? এখনি চলে যা। ছ'খানা অমুক সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে আয়। এই নে টাকা।

এই সব নানা রকম কাজে শিশিরকে ব্যস্ত থাকতে হতো। সিনেমার টিকিট, ছোট দিদিমণির পাড়ারই গানের ইস্কুলে তাকে পৌঁছে দেওয়া আর নিয়ে আসা। কখনো কখনো সরকার মশায়ের অসুখ করলে বাজারে যাওয়া, এটুকুই ছিল তার দূর জগতের সঙ্গে পরিচয়।

মুন্সিজীকে তখনো দেখতো শিশির। তখন মুন্সিজী তাকে 'বাবু' বলতো না, আর সবার মতোই ডাকতো 'শিশির—শিশির' করে।

মনে আছে, যে মেজোবাবুর সঙ্গে মুন্সিজীর অতো ভাব, সেই মুন্সিজীকেই একদিন রেগে গিয়ে চড় মারতে উঠেছিলেন মেজোবাবু। মুন্সিজী কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাছে চলে এসেছিল। বুঝিবা তাকেই বলেছিল—এ শিশির, একটো বিড়ি দে।

—বিড়ি আমি খাই না।

তেলেবেগুণে যেন জ্বলে উঠেছিল মুন্সিজী, বলেছিল, —আবে নবাবপুত্তুর, বিড়ি তুই ছাড়লি কবে? সেদিনও দেখেছি, তালিমারা হাফপ্যান্ট পরে রাস্তা দিয়ে চলেছিস বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে!

কথাটা মিথ্যা নয়। তবে বড়ো হয়ে কবে যে ঐ অভ্যাসটা সে ত্যাগ করলো, শুধু সেই কথাটাই জানে না মুন্সিজীরা।

ছোটদিদিমণিকে একদিন গানের স্কুলে পৌছে দিতে যাচ্ছিল শিশির। তখন অবশ্য তার পরণে হাফপ্যান্ট ছিল না, ছিল বাবুদেরই দেওয়া মোটা ধুতি আর সার্ট।

স্কুল দূরে নয়, এগলি সে গলি করে সবশুদ্ধ পথটা আধমাইলও হবে না। একা একা খুবই হেঁটে যেতে পারে দিদিমণি, কিন্তু বাড়ির সুনাম ও আভিজাত্যের দিকে তাকিয়ে তাকে তা করতে দেওয়া হতো না. শিশির যেতো সঙ্গে।

দিদিমণির গানের খাতাটা গোলাপী মলাটের। ওপরে একটি সরস্বতীর মূর্তি আঁকা। চিরকাল নীরবেই পথ হেঁটেছে দিদিমণি। বয়সে শিশিরের থেকে বছর দুয়েকের ছোটই হবে, কিন্তু গাম্ভীর্যে আর চালচলনে এমনই একটা ভাব ফুটে উঠতো যে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে সাধ্য কার? বাড়িতেই বা তাকে দেখা যেতো কতটুকু? সর্বক্ষণ নিজের ঘরের মধ্যে বসে হয় গান করছে, না হয় তো বই পড়ছে। ছোট থেকেই তাকে দেখছে শিশির, কতবার কতো চকোলেটই না এনে দিয়েছে, কিন্তু শাড়ি পরা শুরু করার পর থেকে সে যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে. সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী।

এ হেন যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দিদিমণি, সে সেদিন চলতে চলতে হঠাৎ বলে বসলো, শিশির, তুমি বিড়ি খাও?

কথাটা কানে আসতেই চকিতে একবার ফিরে তাকিয়েছিল দিদিমণির মুখের দিকে। সুন্দর মুখখানা অসীম বিতৃষ্ণা আর ঘৃণায় আকুঞ্চিত হয়ে আছে।

লজ্জায় যেন সেদিন মরমে মরে যাচ্ছিল শিশির।

ব্যস, সেই একটি কথা। মুখ ফুটে বারণ করা নয়, কিছু নয়, তবু সেই থেকে শিশির সত্যিই অন্য ধরণের হয়ে গেল। আর সে খবর মুন্সিজীরা জানবে কী করে?

মনে আছে, বিকেলের দিকে সবার পরিত্যক্ত বাংলা খবরের কাগজখানা

নিয়ে এসে নিজের গোটানো বিছানাটার তলায় রাখতো, রাত্রিবেলা সেই কাগজখানাই পড়তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাংলা না পেলে ইংরেজি কাগজও আনতো। পড়াশুনা করবার মানুষ সে নয়। তবু এক ধরণের পড়ার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠতে লাগলো। তখনকার মুন্সিজী এসব খবর জানবেই বা কী করে? সে মেজোবাবুর তাড়া খেয়ে তাদের কাছে এসে বসলো। মনে আছে, শিশির সেদিন বলেছিল মুন্সিজীকে,—তোমাকে তেড়ে মারতে উঠেছিল কেন, হঠাৎ? কী হয়েছিল?

মুন্সিজী বিড়বিড় করে বলে উঠলো, আবে ছোড়ে দাও ও-বাৎ! মেজো-বাবুকে আমি থোড়াই কেয়ার করি!

ওর মুখের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকিয়েছিল শিশির। মুন্সিজী বলে কী? মেজোবাবুর সঙ্গেই তার যত গুজগুজ ফিসফাস, আবার মেজোবাবু-কেই সে সমীহ করে চলে সব থেকে বেশি। আজ তাড়া খেয়ে তার নামে এসব কী বলছে মুন্সিজী?

মুন্সিজী সমানে বকবক করে চলেছে, আমি শালা ওদের বাপের আমলের লোক। হাঁড়ির খবর আমি জানবো না তো কি দোসরা লোকে জানবে? শালার ঐ মেজোকত্তার বাৎ-টাই ধরো না কেন? শালা ইংলিশ জানে? পেটে বোমা মারলেও ইংলিশ জবান এক টুকরোও বেরোতো না। কতদিন ওর বাপ ওর কান ধরে চরকিবাজী করিয়েছে না? ইস্কুলে ফি বছর গাড্ডু মারতো, হেডমাষ্টারের হাতে পায়ে ধরে কেলাসে উঠতো। শালা মেট্রিকও পাস নয়, আমাকে তেড়ে আসে মারতে?

মনে মনে ততক্ষণে রীতিমত কৌতুক অনুভব করছিল শিশির। মেজোবাবু ভীষণ বদরাগী, তার হাতের চড় চাপড় বা বকুনি খায়নি এমন চাকরবাকর বাড়িতে আছে খুব কম। তবে, মুন্সিজীর গায়ে হাত তুলতে যাওয়া, সে দেখেছিল সেই প্রথম।

—হয়েছিল কী?

মুন্সিজী বললে, শালার ঘোড়ারোগ। আমি যেমন টিপ্‌স্‌ আনি, তেমনি এনেছি। শালা ট্রিপল টোটে এক রাশ রুপিয়া হেরে বসবে, তার আমি কী জানবো বলো? আমার কী কসুর? মুন্সিজীর টিপ্‌স একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। তা ঘোড়া যদি তোমার এসটার্ট না নেয়, তো আমি কী করবো?

তোমার নসীব। রেগে গিয়ে আমি তোর বাপের বয়সী, সেই আমাকেই তুই মারতে তেড়ে এলি? তোর হাতখানা খসে যাবে না?

এই সব খেদোক্তি। কিন্তু তারপর? পরদিনই মেজোবাবুর 'মুন্সিজী মুন্সিজী' বলে ডাক, আর মুন্সিজীরও হাত কচলাতে কচলাতে মেজোবাবুর অফিস ঘরের ভিতরে ঢুকে তাঁর কাছে মুখ নিয়ে গুজগুজ-ফিসফাস করা।

এ ছিল এবাড়ির একদিককার চিত্র। অন্য দিকে, সিনেমার টিকিট আনবার পর থেকে বাড়ির বউ-ঝিদের দুপুর থেকেই সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যার শো-তে সিনেমা, আর বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই মেয়েদের গা ধোয়া, চুলবাঁধা, শাড়ি বাছা শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই মেয়েরাই যে সিনেমায় না গিয়ে সন্ধ্যা পার হতে না হতে ঘরের আলো নিভিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে থাকবে, এটাও কি ভাবতে পারে কেউ?

শিশির গিয়ে টিকিটগুলো বিক্রি করে দিয়ে আসতো। এসে দেখতো, বড়বাবু-মেজোবাবু-সেজোবাবু মোটরে করে চলে গেছে কালীঘাট কিম্বা দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে, আর বউঝিরা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে, বাড়ির ছেলেপিলেরাও অবস্থা বুঝে চুপচাপ হয়ে গেছে। শুধু ছোটদিদিমণির ঘরে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে, একটা মোটা বই খুলে তন্ময় হয়ে পড়ছে ছোটদিদিমণি।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারতো না শিশির। মুন্সিজীও তখন থাকতো না ধারে কাছে, সে-ও সুযোগ বুঝে চট করে কোথাও কেটে পড়তো, অন্যদিনের মতো বাইরের রকে বসে এর-ওর-তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতো না। এরকম ব্যাপার দু-চারদিন দেখার পর শিশির একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে ছোটদিদিমণিরই শরণাপন্ন হলো।

বাইরে থেকে গলাখাঁকারি।

—কে?

—আমি। শিশির।

দিদিমণি চেয়ারে হেলান দিয়ে দরজার দিকে তাকালো, বললো,—কী?

শিশির ঘরের ভিতরে ঢুকতো না, বড়োজোর দরজার চৌকাঠটা পেরুতো।

তুই-তোকারি করে কারও সঙ্গেই কথা বলে না ছোটদিদিমণি। আজও বললো না। জিজ্ঞাসা করলো, কী? বলো না?

কৌতূহলে তাড়িত হয়ে দরজা পর্যন্ত এসেছে শিশির, কিন্তু তারপর আর কথা সরতে চায় না মুখ দিয়ে।

ছোটদিদিমণির নাম সুষমা। সুষমার দৃষ্টি একটু কোমল হলো, বললে,—বলো না, কী বলতে এসেছো?

অনেক দ্বিধার পর আমতা আমতা করে শিশির শেষ পর্যন্ত বলে ফেললো কথাটা। আর কী আশ্চর্য, অমন গম্ভীর মেয়ে, হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো, বললো,—এতদিন জাহাজে আছো, আর এই ব্যাপারটাই জানো না?

—জাহাজ!—অবাক হয়ে শিশির বললে,—আমি তো কখনো জাহাজে যাইনি!

—যাওনি, কিন্তু আছো তো জাহাজে,—সুষমা ওকে বোঝালো,-এই বাড়িটাই তো একটা জাহাজ। দেখছো না, কতো লোকজন। কতো হৈ হল্লা, কতো কাজকর্ম?

শিশির বিস্মিত হয়ে সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুষমার আয়ত চোখ দুটিতে গভীর দৃষ্টি, বললে,—তা ছাড়া এবাড়ির ভাগ্যও তো জাহাজের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। জাহাজ আসেনি, সবাই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। ছেলেমেয়েরাও সেদিন চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি করলে চড়-চাপড় খায়। আর, জাহাজ যেদিন আসে? বাড়ির আলো নিভতে রাত দুটোর কম নয়। বাড়ির মেয়েরা গয়নাগাটি আর শাড়ি ব্লাউজের ঝলমলানি দেখিয়ে সিনেমায় যাবে, ফিরে এসেও সেই সিনেমার গল্প। কাজকর্ম আর এবাড়ির মেয়েদের করতে হয় কতটুকু?

কথাগুলো শেষের দিকে যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছিল সুষমা, বলতে বলতে তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল শিশির। ছোটদিদিমণি এতগুলো কথা একসঙ্গে বলছে, আর তাও তার মতো মানুষের সঙ্গে, এ এক পরম বিস্ময় তার কাছে! তারপরে যে কথাগুলো বলছে, সেগুলো আরও বিস্ময়কর, আরও অভিনব, বলা যায় অশ্রুতপূর্ব।

ছোটদিদিমণি মোজাইক-করা সুকঠিন মসৃণ মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। নির্বাক, যেন আপন বিষাদ চিন্তার গভীরে অবগাহন করছে। তারপরে সেইভাবে ধীর স্তিমিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—তুমি হয়ত বলবে, আপনি কি এ বাড়ির মেয়ে নন? হ্যাঁ, আমি এ বাড়িরই মেয়ে, কিন্তু আমার সঙ্গে এদের মেলে না। আর মেলে না বলে অশান্তিরও শেষ নেই।

বলতে বলতে মুখ তুললো সুষমা। বললো,—কৌতূহল তোমার মিটেছে তো? এবার যাও।

অপ্রতিভ হয়ে শিশির তাডাতাডি চলে আসছিল। সুষমা পিছন থেকে ডাকলো,—শোনো?

ঘুরে দাঁড়ালো শিশির। সুষমা বললে,—এরকম জবুথবু হয়ে থাকো কেন? তুমি কি এ বাড়ির চাকর-বাকর?

এ-কথা শুনে শিশির সত্যিই স্তব্ধবাক হয়ে গেল। তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন তোলপাড হতে লাগলো। ইচ্ছা হলো চিৎকার করে বলে, তবে আমি কী?

দিদিমণি বললে, কাল সকালে এসো, আমি তোমাকে টাকা দেবো, একটু ভদ্রগোছের জামাকাপড কিনে আনবে। তৈরি-টৈরি করার দরকার নেই, রেডিমেড জিনিসও আজকাল ভালো পাওয়া যায়। দেখে শুনে কিনবে। ভালো দোকান থেকে। বুঝলে?

শিশির যেন একটি যন্ত্রের মতো মাথা হেলিয়ে তার কাছ থেকে সরে এসেছিল সেদিন। এসে নিজের ঘরে বসে চুপচাপ কথাগুলো ভাবছিল। সেদিন তাকে আর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করেনি কেউ। জাহাজ আসেনি বলে সবাই মনমরা, হাঁকডাক করবেই বা কে? সে খবরের কাগজ পডতে লাগলো নিজের মনে। কখনো কখনো ইংরেজি খবরের কাগজ নিয়েও সে পড়তে চেষ্টাকরে।

সে এক অদ্ভুত দিনই গেছে বটে। দিদিমণির টাকায় সে দু প্রস্থ ধুতি-সার্ট কিনে এনেছিল। মুন্সিজী ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতভম্ব। মুন্সিজী নিজে বিচক্ষণ ব্যক্তি। ওকে দেখে সে-ই প্রথম 'বাবু' সম্বোধন করলো। বললে,—আই বাপ! তোমার ভোল পালটে দিলো কে?

নিদারুণ একটা সংকোচ অনুভব করছিল শিশির। কিছুতেই দিদিমণির নামটা বলতে পারে নি। বলেছিল মিথ্যে কথা। বলেছিল, বড়বাবু দিয়েছে।

দুচোখ কপালে তুলেছিল মুন্সিজী, তারপরে বলেছিল,—চোখে পড়ে গিয়েছো তাহলে, অ্যাঁ? না শিশিরবাবু, তোমার চেহারাটা চোখে পড়বার মতো বটে! খাসা গায়ের রঙ! সাবান দিয়েছো বুঝি? চেহারায় জেল্লা দিয়েছে কেমন!

শিশির সেদিন আর কিছু বলে নি। কিন্তু মুন্সিজীর ভাষায় তার 'নসীব' ততদিনে তাকে নিয়ে নিদারুণ ভাঙাগড়া শুরু করে দিয়েছিল। দিন কয়েকের

মধ্যেই হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে তার নসীবটা সত্যিই ফিরে গেল। জাহাজী ব্যাপার নিয়ে ওদের ঠিকাদারী, হঠাৎ ঠিকে-মজদুররা একদিন ধর্মঘট করে বসলো। সে এক মহা বিপর্যয় কাণ্ড! দিনরাত বড়ো-মেজো-সেজোবাবুদের ঘুম নেই, বাড়ির ভিতরে মেয়েদেরও গল্পগাছা গানবাজনা নেই, এমন কি ছোটদিদিমণি পর্যন্ত নীরব, তারও হারমনিয়ামের সুর আর শোনা যায় না।

দিন তিনচারের মধ্যেই কী একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল। দেখা গেল, ঠিকে-মজুরদের অনেকেই নেই, কিছু পুরোনো কিছু নতুন মজুর নিয়ে দল গড়া হলো। আর অফিসে যে বাবুরা কাজ করতো, তাব মধ্যে দুজনের চাকরি চলে গেল। শোনা গেল, তারাই নাকি মজুরদের এই আকস্মিক ধর্মঘটের মূলে।

যে দুজনের চাকরি গেল, তারা বয়সে তরুণই ছিল। একজনের নাম শৈলেশ, অন্যজনের নাম অতুল। তারা দুজনেই বাবুদের দেওয়া প্যান্ট-সার্ট পরে, হাতে চকচকে চামড়ার হাতব্যাগ নিয়ে জাহাজে জাহাজে যাতায়াত করতো। তারাও বিদায় নিলো, সেজোবাবু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তাকেই ধরে ওদের একজনের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। ডাকলেন—এই শিশির, শোন ?

শিশির সেজোবাবুর মনের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝবে কী করে? বাবুদের কারুরই মেজাজের স্থিরতা নেই, এটা বুঝে চাকব বাকররা যে যেখানে পারে আড়াল আবডাল দিয়ে চলে, পারতপক্ষে সামনে আসতে চায় না। শিশিরেরও অবস্থা ছিল তাই। সেজন্য সেজোবাবু ডাকতেই, যাকে বলে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে গেল। সেজোবাবু আপাদমস্তক ওকে নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে হঠাৎই মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন – ফ্যাশান করে খুব যে বড়ো বড়ো চুল রেখেছিস দেখছি!

এবাড়িতে চাকর-বাকরদের চুল ছোটকরে ছাঁটাই নিয়ম। কে যে কবে এনিয়ম প্রচলিত করেছে কে জানে! কেউ বড়ো চুল দৈবাৎ রাখলেই বাবুরা তা নিয়ে তির্যক বাক্যালাপের স্রোত বইয়ে দেবেন। আর তার ঢেউ মুন্সিজীর স্তরে এসে পৌছতে কতক্ষণ? চোপসানো মুখ আর তোবড়ানো গালে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ফুটিয়ে মুন্সিজী বলবে, কী বাওয়া, হাজামের পয়সা বাঁচাচ্ছো, না

সিনেমার হিরো সাজবার মতলব করছো? জলদি গিয়ে রাস্তায় হাজামের সামনে ইঁট পেতে বোসো, নইলে মেজোবাবু দেখবে তো ঘাড়ে দেবে এক রদ্দা!

কিন্তু বেশবাসের পরিচ্ছন্নতার জন্যই বোধহয় ইদানীং মুন্সিজীরা তার কেশকলাপ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতো না। আর করতো না বলেই শিশিরেরও চুল ছাঁটবার কোনো তাগিদ ছিল না। মাথার চুল দেখতে দেখতে যথেষ্টই বেড়ে উঠেছে।

সেদিন তাই সেজোবাবুর কথায় লজ্জা পেলো শিশির। মাথায় হাত দিয়ে চুলের গোছা চেপে ধরলো। যেন, পারলে এই মুহূর্তে নিজেই ওগুলো নির্মূল করে ফেলতে পারে!

সেজোবাবুর চোখদুটো যে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের দীপ্তিতে ঝলমল করছে, এটা সে বুঝতে পারেনি। সেজোবাবু বললেন, জামা-কাপড়েও যে একটু ভদ্রস্থ হয়েছো দেখছি, তা হ্যাঁরে, অঙ্ক-টঙ্ক একটু-আধটু জানিস?

শিশির কোনক্রমে বললো,--সামান্য। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, লঘুকরণ, ঐকিক নিয়ম...

এই পর্যন্ত শুনেই সেজোবাবু যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মনে হলো। জিজ্ঞাসা করলেন,—আর ক্ষেত্রফল?

শিশির বললে,—হ্যাঁ, তা পারবো। স্কুলে তো শিখেছিলাম।

—স্কুলে তুই গিয়েছিলি?

শিশির বললে,—হ্যাঁ। মা ভর্তি করে দিয়েছিল পাঠশালায়। তার পরে করপোরেশন স্কুলে। মা চলে যাবার পরও···

সে থেমে গেল। সেজোবাবু মনে করতে লাগলেন, তাদের ঝিয়ের এই ছেলেটা স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল কখন? ও তো ছোট থেকেই ফাইফরমাস খেটে খেটে অস্থির। হবেও বা, দুপুরবেলায় বাড়িশুদ্ধ মেয়েরা সব ঘুমোয়, ছেলেরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন ওকে আর কার কতটুকু দরকার? হয়ত তখনই ও স্কুল করতো। সেজোবাবু তবু বললেন,—ঠিক বলছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেজোবাবু বললেন,--তাহলে তো ইংরেজিও একটু-আধটু শিখেছিলি। নিজের নাম ইংরেজিতে সই করতে পারিস?

—তা পারবো না কেন ? ফার্স্ট বুক শেষ করে সেকেণ্ড বুকও প্রায়—

সেজোবাবুর মুখখানা এবার প্রকাশ্যেই খুশি খুশি দেখাতে লাগলো, তিনি পরম উৎসাহে ওর পিঠখানাই চাপড়ে দিলেন, বললেন,—তবে আর কী, লেগে পড় দেখি ? তোকেই গড়ে পিটে মানুষ করে নিচ্ছি। আয় আমার সঙ্গে।

এবাড়ির বাবুদের স্বভাবই এই। যখন যেটা ঝোঁক চাপবে, তক্ষুনি সেটা করা চাই। হাঁকডাক করে ড্রাইভারদের একজনকে ডেকে গাড়ি বার করিয়ে তাকে নিয়ে একেবারে চৌরঙ্গি-ধর্মতলা অঞ্চল। রেডিমেড সাদা ভালো ড্রিলের প্যাণ্ট আর সিল্ক টুইলের সার্ট। একেবারে একসঙ্গে তিন প্রস্থ। তার সঙ্গে জুতো, মোজা। পোর্টফোলিও ব্যাগ। সঙ্গে সেজোবাবুর পুরানো একটা রিস্টওয়াচও জুটলো। এবং আর দেরি নয়. পরদিন থেকেই সেজেগুজে সে জাহাজে বেরোতে লাগলো সেজোবাবুর সঙ্গে। প্রথম প্রথম ভয় ভয় করতো বই কি ! পরে সবই অভ্যস্ত হয়ে যেতে লাগলো। ইংরেজি ভালো বুঝতেও পারতো না, বলতেও পারতো না। তখন ভাঙাচোরা হিন্দী। অবশ্য একটা সুবিধে আছে। তারা যে সব লাইনের জাহাজে কাজ করে, তাদের মধ্যে ইংরেজ খুব কম। অধিকাংশ জাহাজই গ্রীক, নরওয়ে, জার্মাণ, জাপানী, এইসব। কিছু কিছু আমেরিকান জাহাজও আছে।

জাহাজ জেটিতে লাগবার পর সিঁড়ি ফেলামাত্রই কাষ্টম্‌স, পুলিশের ভিড়ের সঙ্গে সে-ও ঢুকে যেতো। কাষ্টম্‌স ও পুলিশদের বেশি সময় কাটতো না ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তারা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা বলেই চলে যেতো চীফ অফিসারের কাছে। অথবা চীফ অফিসার তাদের নিয়ে নিজের ঘরে চলে যেতো। ক্যাপ্টেন তার পরেই খোঁজ করতো ঠিকাদারদের।

—ইয়ু ফ্রম মজুমদার কোম্পানী ? ডি-এল-মজুমদার ?

শিশির বলতো, ইয়া।

—ভেরি গুড। দিস ইজ দ্য লিস্ট অব দি ওয়ার্ক।

বলে একটা তালিকা দিতো তার হাতে। আর বলতো, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করো। সেখানেও কাজ আছে। আর,—চোখ কুঁচকে ক্যাপ্টেন বলতো, হোয়ার ইজ মজুমদার ? কামিং টু-মরো মর্নিং ?

শিশির উত্তর দিতো, ইয়া।

বিকেলে বা সন্ধ্যায় যে সব জাহাজ আসতো, তাদের এই উক্তি। আর

সকালে যারা আসতো, তারা বলতো,—হোয়েন মজুমদার ইজ কামিং ? দিস আফটারনুন ?

—ইয়া।

ক্যাপ্টেন বলতো,—ও-কে।

জাহাজে রং করা, ট্যাঙ্ক বা বয়লার পরিষ্কার করা, হাতুড়ি মেরে মেরে জাহাজের লৌহনির্মিত শরীর থেকে মরচে উঠিয়ে ফেলা, এইসব কাজই তাদের অফিসের বেশি। কোনো কোনো জাহাজে আবার সে-সব কাজ করতো অন্য ঠিকাদার। ওরা সেখানে করতো খাদ্য বস্তু সরবরাহ। যাকে জাহাজী ভাষায় বলে 'ডুবাসিং'।

ডুবাসিং-এর বেলায় দেখা করতে হতো চীফ ষ্টুয়ার্ডের সঙ্গে। এই কাজে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো শিশিরের। তরিতরকারির ইংরেজি নাম সে কিছুই জানতো না। ষ্টুয়ার্ড বলতো,—ফাইভ হাণ্ড্রেড পাউণ্ড অব কিউ-কম্বার। ডু ইউ নো কিউকম্বার ?

শিশির নির্বোধের মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। ষ্টুয়ার্ড বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কী বলে উঠতো, তার পরে হেডকুককে ডেকে জিনিসটা আনিয়ে তুলে ধরতো ওর চোখের সামনে। শিশির বলতো,—শশা!

—আ! ডাম ইয়োর শাশা—ইট্স্ কিউকুম্বার। রাইট ?

—ইয়া।

—ভেরি গুড।

সব থেকে মজা হতো গ্রীক জাহাজগুলোতে। তাদের ষ্টুয়ার্ডরা অধিকাংশই ইংরেজি জানতো না। আন্দাজে আন্দাজে বোঝাতে চেষ্টা করতো, কিন্তু সে-সব অদ্ভুত উচ্চারণের ইংরেজি শব্দ শিশিরের পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো না। ষ্টুয়ার্ড রেগে গিয়ে নিজেই নিয়ে আসতো একটা ঝুড়িতে করে একটা একটা করে সব জিনিসের নমুনা। সেই সব দেখে তার খাতায় বাংলায় টুকে আনতো শিশির। কতো পাউণ্ড লাগবে, সে সব তারা বোঝাতো একটা একটা করে আঙুল মট্কে মট্কে! পাঁচটা আঙুল মট্কানো মানে হলো, পাঁচশো পাউণ্ড।

একবার একটা ঐরকম গ্রীক, না ইটালী, কোন্ জাহাজে যেন শূয়োরের মাংস দরকার। তার নমুনা জাহাজে ছিল না। আর থাকলেও শিশিরের পক্ষে

তা বোঝা সম্ভব ছিল না। ষ্টুয়ার্ড ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না। ও-ও বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ষ্টুয়ার্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে দুটো হাত তুলে মুখ সরু করে নাকে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠলো।

শিশির তখনো বুঝতে পারে নি। কিন্তু এর পর যদি সে বলে বোঝেনি, তাহলে ষ্টুয়ার্ড বোধহয় তাকে ঘাড় ধরে জাহাজ থেকে বার করে দেবে।

প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ করেই সেদিন বাড়ি ফিরেছিল শিশির। সেজোবাবু সেদিন খোস মেজাজে ছিলেন তাই রক্ষে, নইলে কী যে হতো বলা যায় না। শিশির বললো, সব বুঝলাম, একটা জিনিস বুঝলাম না।

—কী জিনিস।

শিশির 'ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-এর অভিনয় করামাত্র সেজোবাবু বুঝে নিলেন। নিয়ে, ওকেও বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, যে আমাদের মাছ দেয়, লক্ষ্মণ? তাকে অর্ডারটা দিয়ো। সে ঠিক তার লোক দিয়ে জাহাজে পৌছে দিয়ে রসিদ নিয়ে আসবে'খন।

শিশির বললে,—তাই হবে। কিন্তু আমাকে আর জাহাজে টাহাজে পাঠাবেন না। কোন্ দিন মার খেয়ে মরবো। এসব হলো গিয়ে রীতিমত লেখাপড়া জানা লোকের কাজ, আমার দ্বারা কি সম্ভব?

সেজোবাবুকে ভালো মেজাজে পেলে এধরণের কথা প্রায়ই বলে শিশির। আর সেজোবাবুও কথাটা শুনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এবাড়ির বাবুরা বেশিদূর লেখাপড়া করেন নি। কারণ, তিন পুরুষের জাহাজী ব্যবসা, সেজন্য কোনরকমে স্কুলের সীমানাটা পেরুলেই তো ব্যবসা শিখতে শুরু করার পালা। কী হবে কলেজে টলেজে পড়ে? ওসব পড়া তো চাকরি-বাকরির জন্য? তা, এবাড়ির ছেলেরা কি চাকরি করতে বেরোবে নাকি, যে বি-এ, এম-এ ডিগ্রির প্রয়োজন? সে বরং ফ্যাশানের জন্য বাড়ির মেয়েরা পড়তে পারে ইচ্ছে করলে। ছেলেরা কেন? এই ছিল যুক্তি।

তার ফলে হয়েছে এই যে, বাড়ির কর্তারা কর্মচারি হিসেবে কোনো ডিগ্রি-ধারীকে রাখতে চাইতেন না। আছেন ঐ এক অ্যাকাউণ্টবাবু, পার্টটাইমে কাজ করেন, ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত খাতাপত্তর-গুলো ঠিক মতো দেখেশুনে দিয়ে যান।

এ এক অদ্ভুত মানসিকতা এবাড়ির কর্তাদের। তাঁদের ধারণা, যে কোনো লোককেই এলেম দিয়ে তাঁরা যে-কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। আর

করতেনও তাঁরা তাই। অতএব, শিশিরের মতো ছেলেরা যখন তাঁদের কাছে গিয়ে অসহায়ের মতো কাজের অসুবিধের কথা জানাতো, তখন তাঁরা মনে মনে এতো খুশি হতেন যে বলার নয়। তাঁরা যে কাউকে কিছু বিদ্যাদান করতে পারছেন, এটা কি কম আত্মপ্রসাদের বস্তু ?

আর এই মানসিকতা তাঁদের ভেতরে অহরহ কাজ করতো বলেই শিশিরের মতো পরগাছা যুবকের এই আশাতীত পদোন্নতি। এখন তার একটা নির্দিষ্ট মাইনে, তার একটা টেবিল অফিসঘরের মধ্যে, তার পরণে সার্ট-প্যাণ্ট, হাতে রিষ্টওয়াচ, পোর্টফোলিও ব্যাগ। এই রীতিতে সৎ ও নিষ্ঠাবান যুবক শেষ পর্যন্ত সত্যিকার কাজের মানুষ হয়ে গড়ে উঠলেও কর্তাদের দৃষ্টিকোণ কিন্তু বদলাতো না। এ-ও এক আশ্চর্য কাণ্ড! তাঁরা আর শিশিরকে 'সিগারেট নিয়ে আয় পান নিয়ে আয়' করতেন না বটে, কিন্তু সে পূর্বে যা ছিল, তাঁদের কাছে তা-ই রয়ে গেছে। একজন অসহায় আশ্রিত ব্যক্তি, তাঁদের ঝিয়ের ছেলে। শিশির খাওয়া-পরা-থাকা ছাড়াও কিছু টাকা মাইনে পায়, শিশির কাজের সময় গাড়িও চড়ে, শিশির কিন্তু সেই শিশিরই রয়ে গেছে তাঁদের কাছে। মাঝে মাঝে এ সত্যটা হঠাৎ তার বীভৎসতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—ও লোকটি কে, মজুমদার বাবু ? বেশ কাজের লোক।

কোনো বাইরের ভদ্রব্যক্তি হয়ত প্রশ্ন করলেন কর্তাদের। সে একটু আড়াল থেকে শুনেছে কর্তাদের উত্তর,—ও আমাদের এক ঝিয়ের ছেলে।

প্রথম প্রথম কথাটা শুনে মনে একটা আচমকা ধাক্কা লাগতো। পরে সয়ে যেতো অবশ্য। মনে মনে ভাবতো, কথাটা তো মিথ্যে নয়। নিচু জাতের ছেলে, লেখাপড়া শেখেনি, বাবুদের ফাইফরমাস খেটে বড়ো হয়েছে, আর এ বাড়িতে তার মা ঝিয়ের কাজ করতো, এ কথাটাও তো মিথ্যে নয়। বিশেষ করে এ সত্যটা প্রকট হয়ে উঠতো মেয়েদের কাছে। অফিসের অন্যসব কর্মচারীদের কাছে সে শিশিরবাবু হয়ে উঠলেও অন্তঃপুরে ছোট-বড়ো সবার কাছেই সে সেই শিশির।

তার পরণে সার্ট-প্যাণ্ট দেখে প্রথম প্রথম হাসাহাসি করলেও পরে এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। তুমি প্যাণ্টই পরো, আর যা-ই করো, তুমি যে এ-বাড়ির এক ঝিয়ের ছেলে, তা-ও ছোট জাত, ছোট থেকে এখানেই মানুষ হয়েছো, একথাটা অন্তঃপুরিকারা ভুলবে কেন ? তারা সেই আগের মতো, ওকে বাগে

পেলে,—'শিশির আমাকে একটা জবাকুসুম এনে দিয়ো তো ? 'শিশির, কাল সকালে গিয়ে পাঁচখানা সিনেমার টিকিট কিনে আনবে, কেমন ?'

পরিবর্তনের মধ্যে 'তুই' থেকে 'তুমি।'

গম্ভীর হয়ে গেছে একমাত্র ছোট দিদিমণির মুখ। সে প্রথমদিনই তার শুভ্র প্যাণ্ট-সার্টের দিকে তাকিয়ে মুখ কালো করে জিজ্ঞাসা করেছিল,—এ পোষাক পরালো কে ?

একটু লজ্জিত হয়েই শিশির বলেছিল,—সেজোবাবু।

হুঁ, বলে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল দিদিমণি, আর কিছু বলে নি।

এ-বাড়ির একটা প্রাচীন প্রথা আছে, ভোরবেলায় ঘুম থেকে না ওঠা। বাইরে থেকে যে সব কর্মচারীরা কাজ করতে আসে, তারা ঠিক দশটায় এসে কাজে বসে যায়, বাবুরা নিচে নেমে টেবিলে বসতে এগারো, সাড়ে এগারো-টার কম নয়, তা-ও জাহাজ থাকলে। না থাকলে—বারোটা। এই নিয়মে বাড়ির সব কাজই ঢিলেঢালা। এই নিয়মে চাকর-বাকররাও দেরিতে ওঠে। ফলস্বরূপ, এবাড়ির যারাই স্কুল-টুলে বেরিয়ে যায়, তারা কোনোরকমে ফোটা ডাল আর আলুভাতে দিয়ে গরম ভাতটুকু মুখে তোলবার অবকাশ পায়। ছোটদিদিমণিও তা থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

আর, জাহাজে কাজ থাকলে সকালে বেরিয়ে যায় শিশির। তার বেরুনোর সময় উনুনে আগুনটুকুও পড়েনি, চায়ের কেটলিটি পর্যন্ত বসে নি। বেলা দশটা নাগাদ সে যখন ফিরলো, তখন একদিকে ফোটা ডাল আর আলুভাতে দিয়ে ছোট দিদিমণি হয়ত রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে খেতে বসেছে, আর অন্যদিকে উনুনে দ্বিতীয় দফার চায়ের জল গরম হচ্ছে।

ছোট দিদিমণিকে খেতে বসতে দেখে শিশির আর জামাকাপড় ছাড়লো না। কারণ, এখুনি তো দিদিমণি স্কুলে রওনা হবে, তাকে পৌঁছে দিতে যাবে কে ? দিদিমণি কিন্তু তাকে দেখেই মুখ গম্ভীর করলো, বললো,—থাক, তোমাকে যেতে হবে না, আমি রামরূপকে সঙ্গে নিচ্ছি।

রামরূপ হচ্ছে বাড়ির দারোয়ান।

শিশির স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। দারোয়ানকে নিয়ে তার সামনে দিয়েই দিদিমণি স্কুলে চলে গেল কোন দিকে না তাকিয়ে।

কিন্তু সে নিয়ে ভাববার অবকাশই বা কোথায়? ভিতর থেকে সেজোবাবুর ডাক শোনা যাচ্ছে,—শিশির? শিশির?

—যাই, বলে সাড়া দিয়ে তখুনি তাকে ছুটতে হলো সেজোবাবুর কাছে। অথচ ব্যাপারটা নিয়ে কাউকে কিছু বলারও নেই। এমন কি ছোটদিদিমণিকে পর্যন্ত বলা চলে না যে, এ অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হলো কেন? যাই হোক, বাড়ির সবার কাছে তো সে সেই আগেকার শিশিরই আছে? অবশ্য কদিনের জন্যই বা? কিছুদিন পরেই ছোট দিদিমণি স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিলো। সামনে বুঝি ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার সময় গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, রামরূপ আছে। পরীক্ষার পরে ছুটি। ছুটিতে মামাবাড়িতে গিয়ে থাকলো। তারপরে ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হলো। কিন্তু কলেজে আর হেঁটে যাওয়ার পালা নয়। গাড়ি আছে। ড্রাইভার আছে। এক কথায়, শিশিরের সঙ্গে আর সংযোগ রইল কতটুকু?

মাঝে মাঝে সিঁড়িতে উঠতে-নামতে দেখা হয়ে যেতো।

—শিশির, আমায় কয়েকটা বই কিনে এনে দিও তো, বুকলিস্ট দেখে?

—আচ্ছা।

টাকা আর বুকলিস্ট, বইয়ের পাড়া। বই আর ক্যাশমেমো। ফিরে এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চুড়ি পরা সুগোল সুগৌর দুখানা হাতের ওপর বইগুলো তুলে দিলো সে। ব্যস, এই পর্যন্তই।

এই পর্যন্তই সব। তার অতীত, সম্ভবত তার ভবিষ্যৎ-ও।

এসপ্ল্যানেড মুরিং-এ তখন রাত্রি আরও গভীর হয়ে এসেছে। মুন্সিজী তার পিছন দিকে বাঁধানো ঝকঝকে শানটার ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাসিকা গর্জনই শিশিরের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিলো। শিশির তাদের সেই জাহাজের মতো বিরাট বাড়িটার কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনছে না কোনো একক কণ্ঠের মৃদু করুণ স্বর। সে বসে আছে জেটির পাশে একটা আপাত-নিঃসঙ্গ ক্যাপস্টানের ওপরে, জাহাজ আসার প্রতীক্ষায়। কখন দেখা দেবে জাহাজের মাস্তুল?

শিশির হাতঘড়িতে দেখলো, রাত তখন নটা বাজে। তার জাহাজ আসেনি

সত্যিই। তার সামনে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলো জেটির পাষাণ-চত্বরে বাহু বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করে যাচ্ছে!

চারদিকে তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসলো শিশির। মুন্সিজী যে হঠাৎ এভাবে একেবারে ঘুমিয়ে পড়বে, এটা তার ধারণার অতীত ছিল। সে উঠে গিয়ে মুন্সিজীর গায়ে ধাক্কা দিলো,—মুন্সিজী? এ মুন্সিজী?

ধড়মড় করে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো মুন্সিজী, বললে,—এসেছে! জাহাজ এসেছে!

শিশির বললে,—এই যে তুমি বললে জাহাজ আসবে না, আপনি বাড়ি যান। আর এখন জাহাজ এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? শুয়েই বা পড়লে কেন, হঠাৎ?

চোপসানো মুখে তার অভ্যস্ত হাসিটুকু খেলে গেল। মুন্সিজী বললে,—জাহাজ আসবে কিনা খোদা মালুম! লেকিন আমি যে আপনাকে পাহারা দিচ্ছি, এটা সমঝ্‌তে পারছেন না কেন?

—পাহারা!

উঠে বসলো মুন্সিজী। তেমনি বাঁকা হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বলতে লাগলো,—আমি জানি আপনি সাচ্চা আদমী। লেকিন বাবুরা বিশোয়াস করবে কেন? ওরা ভাবে, আপনি জাহাজে যাবার নাম করে হয়ত কোনো সিনেমা হাউসে ঢুকে পড়লেন।

—বলছো কী?

মুন্সিজী বলতে লাগলো, আপনার বাচ্চা উমর থেকে আপনাকে দেখছি, তাই একটু মায়া পড়ে গেছে আপনার উপর। আর মায়া পড়েছে বলেই বলছি, আমাকে পাঠিয়েছে মেজোবাবু, দেখে আয় তো শিশির সাচমুচ এসপ্লানেড মুরিং-এর বসে আছে কিনা?

শিশির হতবাক হয়ে বসে পড়লো পরিত্যক্ত ক্যাপস্টানটার ওপরে। মুন্সিজী ওর কাছে এলো। বললে, এতে আপনার ভালই হলো শিশিরবাবু। বাবুরা বুঝবে, আপনি সাচ্চা আদমী, ঝুটা কারবার আপনার মধ্যে নেই!

ছোট থেকেই দুঃখের অগ্নিদাহে পুড়ে শিশির একটু ভিন্ন ধরণে গড়ে উঠেছে। অপরের দেওয়া ব্যথা, লাঞ্ছনা অন্তরে গভীর হয়েই বাজে, কিন্তু সেটাকে সামলে উঠতে পারে সহজেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে স্বাভাবিক করে তুললো শিশির। অবশ্য ঠিক তখনই সে কথা বলতে পারলো না, নীরব হয়ে রইলো।

মুন্সিজী বললে—বসে থাকুন আউর ঘণ্টাখানেক। অনেকসময় জাহাজ আসতে সাচমুচ দেরি হয়ে যায়। কোন্ কাজটা আর আজকাল টাইম মতো হচ্ছে বলুন?

শিশির গলাটা একটু পরিস্কার করে নিয়ে বললে,—তুমি এখন কোথায় যাবে মুন্সিজী? তোমার কাজ তো হয়ে গেল। মেজোবাবুর কাছে যাবে?

মুন্সিজী বললে, ছোড়ুন মেজোবাবুর কথা। সে শালা—

বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গেল মুন্সিজী। চোখ ছিল তার গঙ্গার দিকে। কি দেখে তার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবিষ্ট হয়ে রইলো। তারপরে বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলে উঠলো—শালা রেজাকের নৌকো এদিকে লাগছে কেন?

শিশিরও দেখছিল ব্যাপারটা। তাদের অনতিদূরে জেটিতে লাগা জাহাজটার পিছন দিকে একটা ছইওয়ালা পান্‌সি এসে ছপছপ করে ভিড়ছে। কিন্তু এরকম নৌকোর আনাগোনা তো সবসময়ই চলছে, এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে?

মুন্সিজী তার আরও কাছে এসে ফিসফিস করে বললে, ও জাহাজটা কাদের কোম্পানীর, জানেন?

—জানি বই কি, ধর কোম্পানীর।

এর অর্থ, ঐ জাহাজের মালিক বা এজেন্ট ধর কোম্পানী নয়, ঠিকাদার ধর কোম্পানী। মুন্সিজী বললে, রেজাক হচ্ছে চাটুজ্যে-কোম্পানীর লোক, ও ধর কোম্পানীর জাহাজে যাচ্ছে কেন?

রেজাককে শিশিরও দেখেছে। প্রতিযোগী ঠিকাদার কোম্পানীর লোকজন পরস্পরের কাছে অন্তত মুখচেনা থাকবেই। সে হিসাবেই রেজাককে দেখেছে সে, মুখে বসন্তের দাগ, মুন্সিজীর মতোই বিচিত্র পেশার মানুষ।

কিন্তু তাকে এখন শিশির দেখতে পেলো না। নৌকোতে যে রেজাক আছে, এটা মুন্সিজী বুঝতে পারলেও শিশির পারে নি। তবে এটুকু শিশির জানে, রেজাকের নৌকো বলতে রেজাক যে ঐ নৌকার মালিক, একথা বোঝায় না। রেজাক নৌকোটা সাময়িকভাবে ভাড়া করেছে, এইমাত্র। শিশির বললে, কই, নৌকো থেকে নেমে আসছে না তো কেউ? ও জাহাজের দিকে যাচ্ছে, বুঝলে কী করে?

মুন্সিজী বললে, জাহাজে যায় নি, যাবে হয়ত। শালা রেজাক নৌকোর মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আমাদের দেখতে পেয়েছে নাকি? আলোর কাছ থেকে আঁধারে সরে আসুন তো শিশিরবাবু। বসে বসে দেখি শালাদের কারবার।

তাকে একরকম টেনেই শেডের কাছে নিয়ে গেল মুন্সিজী। এখানটা ছায়া ছায়া আছে, দাঁড়ালে বা বসলে চট করে কেউ বুঝতে পারবে না।

শিশির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, নৌকোটা জেটির নিচে, জেটির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। অন্ধকারে লোকগুলোকে চেনা যায় না, সিগারেট বা বিড়ি ধরিয়েছে, তারই বিন্দু বিন্দু আলোগুলো দেখে বোঝা যায়, জনাতিনেক লোক রয়েছে নৌকোয়।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে কেটে গেল। মুন্সিজী রুদ্ধ নিশ্বাসে ঐ দিকে তাকিয়ে ছিল, এইবার সজোরে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো, না শিশিরবাবু ও জাহাজে কেউ যাবে না, শালাদের অন্য মতলব আছে। চুপচাপ বসে থাকুন, অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

এ জেটিতে জাহাজ নেই বলে জায়গাটা নির্জন, ক্রেনটা স্থবির গম্বুজের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। শুধু অনতিদূরের আলোটা ওর গায়ে একটা জায়গায় পড়ে চিক চিক করছে। 'সাবধান' বলে যে ফলকটিতে লেখা থাকে, সেই ফলকটিতে উৎকীর্ণ কঙ্কালের মুখ আর দুটো হাতের ওপর আলোর রশ্মি পড়ে স্থির হয়ে আছে।

পার হয়ে গেল আরও কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। কেমন যেন একটা অবসন্ন অন্যমনস্কতা ঘিরে ধরছিল শিশিরকে। হঠাৎ সে চমকে উঠলো মুন্সিজীর একটা অস্ফুট চাপা উক্তিতে,—মেয়েছেলে!

শিশির তাকালো। একটা কালো মোটর গেট পেরিয়ে একেবারে জেটির কাছাকাছি এসে থেমেছে নিঃশব্দে। তার ভিতর থেকে ঘোমটা টানা ঝলমলে শাড়ি পরা একটি মেয়েমানুষ সত্যিই নেমে পড়েছে, সঙ্গে একটি পায়জামা-পরা লোক। সে-ই পথ দেখিয়ে মেয়েটিকে গঙ্গার কিনার পর্যন্ত নিয়ে এলো। ততক্ষণে নৌকোর লোকেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির হাত ধরে সন্তর্পণে নৌকোর একটি লোক নামিয়ে নিলো নৌকোতে। পাজামা পরা লোকটি ফিরে গেল কালো মোটরটার কাছে, আর নৌকোটা মেয়েটাকে নিয়ে মুখ ফেরালো গঙ্গাবক্ষের দিকে। চোখের সামনে ঘটলো ব্যাপারটা।

শিশির ঠিক এধরণের ঘটনা আগে কখনো দেখেনি। দেখলে এতটা অবাক সে হতো না। সে বলে উঠলো—ব্যাপার কী, মুন্সিজী ?

মুন্সিজী চোখ ছোট ছোট করে মৃদুমৃদু হাসছিল, বললে,—শালার রেজাক আচ্ছা কারবার ধরেছে দেখছি !

—কী কারবার ! মেয়েটি কে ?

মুন্সিজী বললে,—মেয়েটা আবার কে ? কসবী ! রামবাগান, কি সোনাগাছি থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে !

—তা যাচ্ছে কোথায় ?

মুন্সিজী থুত্‌নিতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—যাচ্ছে কোথায় সেটাই তো ভাবছি ! নৌকো বাইছে দক্ষিণ মুখো ! না, কারবারটা না দেখলে তো চলছে না ! আপনি বসুন শিশিরবাবু, আমি এখুনি ব্যাপারটার পাত্তা লাগিয়ে আসছি।

বলতে না বলতেই ছিপছিপে লোকটি হনহন করে এগিয়ে গেল ওদিককার জেটির কাছে। জাহাজটা যেখানে বাঁধা আছে, সেটা ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল। তার পরে আর তাকে দেখা গেল না।

শিশির সামনের দিকে তাকালো। জেটি পেরিয়ে গঙ্গার বুকে 'বয়া' ভাসছে, ঐ বয়াতেও জাহাজ এসে বাঁধা পড়ে, যদি না জেটিতে জায়গা পায়। ঐ বয়ার জন্যই এখানকার চালু নাম—এসপ্লানেড মুরিং।

সামনের উধাও গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউ খেলা করে বেড়াচ্ছে ; একটা ছোট মোটর লঞ্চ ঢেউ তুলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে গেল।

এভাবে চুপচাপ বসে থাকা কাজের লোকের পক্ষে সত্যিই দুষ্কর। কিন্তু শিশির কি কাজের লোক ? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো শিশির। কাজের লোকই হোক, আর সাচ্চা আদমীই হোক, শিশিরের কিন্তু সময়টা অদ্ভুত ভালোভাবে কেটে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ সে সিগারেট খায়নি। এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে একটা দুমড়ানো প্যাকেট বার করলো, সস্তা দামের সিগারেট, গোটা চারেক পড়ে আছে। বাড়িতে সে সিগারেট খেতে পারে না, কখন কে দেখে ফেলবে কে জানে ! বাবুদের সামনে কর্মচারী বলেই খেতে পারে না, আর অন্যদের সামনে সিগারেট বার করলেই তারা এমন হৈ হৈ শুরু করে যে বলার নয়। সেজন্য, বাড়িতে ভয়ে ভয়ে সিগারেট সে বারই করে না। তার বিশেষ ভয় ছোট দিদিমণিকে। তার কানে গেলে, তার সুন্দর মুখখানা কীভাবে

যে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, সেটা যেন এখান থেকেই কল্পনায় দেখতে পায় শিশির!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আবার ওর মনটা বাড়ির দিকে ছুটে গেল। রাত এখন নটার ওপর। মনে হচ্ছে চায়ের পালা শেষ হয়েছে। রান্না চেপেছে, বাড়ির বাচ্চারা গরম গরম ঝোল ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বে। রান্না নেমে আর সবার খাওয়া শেষ হতে হতে যার নাম বারোটা। এগারোটা থেকে খাওয়ার পালা শুরু হয় সাধারণত।

বাড়িতে চাকরবাকর, আশ্রিত পরিজন নিয়ে খাওয়ার লোকও প্রচুর। যার যখন প্রয়োজন, পিঁড়ি পেতে 'ঠাকুর' বলে ডাক দিলেই হলো। কে যে কখন খাচ্ছে, এক ঠাকুর ছাড়া খোঁজ রাখছে না কেউ। কেউ না খেলে জিজ্ঞাসাও করা হবে না, অমুকের খাওয়া হয়ে গেছে কিনা। এমনকি, বাড়ির আসল লোকগুলো পর্যন্ত পরস্পরের খাওয়া দাওয়ার খোঁজ রাখে না। বিচিত্র মানুষ এরা। কিম্বা বৃহৎ সংসারের চেহারাটাই এই, কেউ কারুর অন্তরঙ্গ পরিচয় রাখে না।

শিশির জানে না, কখন সে অপেক্ষমান জলচর জাহাজ ছেড়ে ঐ নিশ্চল গতিহীন বিচিত্র জাহাজটির চিন্তায় গভীরভাবে অবগাহন করেছে। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়ে শেষ হলো, দু-একটা টান দিয়েছে, কি দেয়নি। পাশের জেটির জাহাজের জনরবও মিলিয়ে গেল, ক্রেনটা ঘর্ঘর করে সরতে আরম্ভ করেছে, টালিক্লার্করা ডিউটিতে এসে গেছে, মজুররাও মাল নামাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জাহাজের ডেরিকগুলো প্রবলতর ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে তাদের কাজ শেষ করছে। জাহাজের পিছন দিকটার পাঁচ নম্বর 'ফলকা' খোলা, আর সামনের দিককার দুনম্বর ফলকার ঢাকা খোলা হলো বুঝি। কী এসেছে জাহাজে করে? চাল, না গম? জেটির ওপরে এতো আনকোরা 'গানি ব্যাগ' বা চটের থলের আমদানি কেন?

কথাটা ওর মনকে মাত্র ছুঁয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। ও আবার ডুবে গেল ওর নিশ্চল জাহাজটার স্বপ্নে। এক একদিন রাত্রে সে যখন ফেরে, তখন বিপরীত ফুটপাথ থেকে সত্যিই দেখায় বাড়িটাকে বড়ো একটা জাহাজের মতো। সামনের লনটাকে নিচের ডেকে ধরলে ওপরের বারান্দা নিয়ে তেতলা বাড়িটাকে সত্যিই 'মিডশিপ'-এর মতো দেখায়। ছাদের চিলেকোঠাটাকে মনে হয়

হুইল হাউসের মতো। তার সামনেকার ছাদের অংশটা ঠিক যেন নেভিগেশন ব্রীজ। ওখানে জ্যোৎস্না রাতে অনেক সময় বড়বাবু একা একা পায়চারি করেন। তখন মনে হয় ব্রীজে ক্যাপ্টেন ঘোরাঘুরি করে জাহাজের গতিপথ নিরীক্ষণ করছেন।

এক একটা জাহাজে, অর্থাৎ এইসব মালবাহী জাহাজে, অফিসার, খালাসি, মাল্লা, সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ষাটজন লোকও থাকে। তা ও বাড়ির লোকজন সবশুদ্ধ ধরলে পঞ্চাশ-ষাটজন না হলেও তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হবে নিশ্চয়। ছোট গ্রীক যে সব 'ট্রাম্প জাহাজ' আসে, তার লোকসংখ্যাও হবে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। তফাৎটা কোথায়? এ বাড়ির সবাই জাহাজী মাঝি-মাল্লা, প্যাসেঞ্জার বলে মনে হয় শুধু একজনকে, সে সুষমা, ছোটদিদিমণি। তানপুরা হাতে ও মেয়েটিকে এই জাহাজী পরিবেশে ঠিক যেন মানায় না! ও যেন অনেক দূরের যাত্রী, অনেক বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হয়ে জাহাজ যেন একদিন ওর নিজের বন্দরে গিয়ে পৌছবে, জাহাজের গ্যাং-ওয়ে নেমে যাবে ঘরঘর করে, আর তখন কোনো দিকে তাকাবে না, খুশির ছন্দে দুটি কোমল পা ফেলে ও নেমে যাবে মাটিতে, চলে যাবে দৃষ্টিপথের বাইরে, ওর একান্ত নিজের দেশটিতে।

তন্ময় হয়ে এইসব কল্পনার ছবি এঁকে চলছে শিশির, হঠাৎ চমকে উঠলো মুন্সিজীর কণ্ঠস্বরে। মুন্সিজী এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। বললো,—দশটা বাজলো, সাচমুচ এখনো বসে আছেন? আমি ভাবলাম চলেই গেছেন বুঝি এতক্ষণে।

যেন স্বপ্ন থেকে জাগরণে উত্তীর্ণ হলো শিশির। বললে,—মুন্সিজী, জাহাজ তাহলে সত্যিই এলো না!

মুন্সিজী বললে—কই আর এলো! দশটা বাজলো, আর আসবার চান্স নেই।

শিশির উঠে দাঁড়ালো—চলো, বাড়িই যাই।

মুন্সিজী বললে,—ওদিকে কী কারবার হয়েছে জানেন?

—কী?

মুন্সিজী বললে, শালা রেজাক কসবীকে নিয়ে ঠিক একটা জাহাজে গিয়ে উঠেছে! দেখি, জাহাজটা আমার চেনা। বছর চারেক আগে এসেছিল। আমি শালা টালিক্লার্কদের সঙ্গে ভিড়ে একরোজ উপরি রোজগার করে

নিয়েছিলুম। তখন থেকেই জানি ও-জাহাজের ব্যাপার স্যাপার। জান পয়চান দু-চার জনের সঙ্গে থাকতে পারে ভেবে এক শালা পান্‌সি ঠিক করে ঠেলে উঠলুম গিয়ে জাহাজে। কোথায় আছে জাহাজটা, জানেন? সেই চাঁদপাল ঘাটের কাছে একটা বয়াতে বাঁধা। জাহাজটা চাটুজ্যে কোম্পানীরই বটে। কিন্তু হলে হবে কী? এ কারবার হচ্ছে রেজাক শালার নিজের। উপরি আয়। উঠে দেখি, ও শালা কসবীটাকে নিয়ে সোজা বাড়িওলার ঘরের দিকে চলে গেল।

—তার মানে ক্যাপ্টেন?

—বিলকুল। তারপরে রেজাকের সঙ্গে গিয়ে ভাব করলুম। ও আমাকে দেখে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। ভ্রূ কুঁচকে বললে,—আবে, তুই এ জাহাজে কেন? আমি বললুম, তুমি শালা যে জন্যে এসেছো, আমিও তাই। উপরি আয়। ব্যস, জমে গেলুম দুজনে। আমাকে বললে, দুপয়সা পাইয়ে দেবো, শালা, বেইমানি করে পুলিশের কানে গিয়ে লাগিয়ো না। আমি বললুম, তওবা তওবা! তা কী হয়! আর কী? হয়ে গেল দোস্তি।

শিশির বললে, তা চলে এলে যে?

মুন্সিজী বললে, মনে হলো আপনি বোধ হয় এখনো বসে আছেন। এলুম আপনাকে খবরটা দিতে।

বলে, আরও কাছে সরে এসে কানে কানে কথা বলার মতো স্বরে শুরু করলো, বাড়িওলাটা শাহেনশা আদমি, বুঝলেন? বিলকুল সবাইকে ছুটি দিয়েছে জাহাজ থেকে। জনা কয় যারা নেহাৎ ডিউটিতে থাকবার, তারা আছে। ব্যস।

—রেজাক কী করছে?

মুন্সিজী ফোকলা দাঁতে মাড়ি বার করে হাসতে লাগলো, বললে, শুনবেন? আমি গিয়ে প্রথমে দেখলুম, মেয়েটাকে নিচে, সিঁড়ির কাছে রেখে রেজাক তড়াক করে ওপরে উঠে গেল বাড়িওলার কাছে। আর যে কোয়াটার মাষ্টারটা ডিউটিতে ছিল, সেটা শিষ্‌ দিতে দিতে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে ইংলিশে বললে, হ্যালো গর্জস?

—মানে?

মুন্সিজী বললে, মানে কি আমিই বুঝি ছাই? আমি জাহাজের লস্করদের

সঙ্গে মিশতে মিশতে কথাটা শিখে নিয়েছি। ওরা আমাদের শাড়ি, গয়নাপরা জবরজঙ্গ মেয়ে দেখলেই বলে ওঠে, হ্যালো গর্জস!

শিশির একটু অবাক হয়েই ওর কথা শুনছিল। মুন্সিজী বললে, তারপরে হলো কী, শুনবেন? ওকে ইংলিশ বলতে দেখে মেয়েটা আরও ঘোমটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটা তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজার কাছে দেখতে পেলো আমাকে। বললে, হে ইউ?

কাছে গেলাম। বললাম, মাই ফ্রেণ্ড গো আপ—দিস গ্যাল ফর ক্যাপিতান।

আইনো-আইনো, —বলে লোকটা অন্যদিকে চলে গেল। আমি দেখলাম এই সুযোগ। গুটি গুটি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, ডরো মৎ বিবি, আমি রেজাকের দোস্ত্। তোমার নাম কী? মেয়েটা মাথার ঘোমটা একটু উঠিয়ে আমাকে দেখলো, তারপরে ফিসফিসিয়ে বললে, রোশনী। আমি হেসে বললুম, রোশনী তো সবাই। তোমার আস্‌লি নাম কী? তা কোনো জবাব দিলো না, মুখ নিচু করে রইলো। বললুম, ঠিক আছে, ও রোশনীই সই। হুঁসিয়ার থেকো, এরা বড়ো মাতোয়ালা হয়। তাছাড়া, এ জাহাজের ক্যাপি-তানকে আমি জাহাজে ওঠবার সময় নিচে থেকে দেখে নিয়েছি। ওকে আমি চিনি। চার বছর আগে এই জাহাজেই 'বড়া মালিম' (চীফ অফিসার) হয়ে এসেছিল, এখন ক্যাপিতান হয়েছে। মেয়েটা আমার কথায় হ্যাঁ না কিছুই বললো না। আমিও একটুক্ষণ চুপ করে আছি, এমন সময় ওপর থেকে রেজাক নেমে এলো। আমাকে দেখেই হাঁক দিলে, কোন হায় রে? বললুম, আমি দোস্ত্। তারপরের কথা তো আপনাকে বলেছি, শালার সঙ্গে আড়ালে গিয়ে একটু বাৎচিৎ করলুম, বাস, সাচমুচ দোস্তি। হবে না কেন বলুন? তুমি ভি পেটের জন্যে এসেছো, আমি ভি পেটের জন্যে এসেছি।

—তারপর?

মুন্সিজী একটু দম নিয়ে বলতে লাগলো, আমাকে পেয়ে শালার বোধ হয় দিলের জোর বাড়লো। আমাকেও পিছনে পিছনে আসতে বললে। গেলুম ওর সঙ্গে। পিছনে পিছনে মেয়েটা। ওপরে, সেলুনে একটা সাহেব বসেছিল, সে আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। মেয়েটাকে দেখে তার লাল লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কী! কিন্তু আমরা তাকে গ্রাহ্য না করে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছি দেখে কিছু বললে না। শিষ দিতে দিতে সেলুনের ভিতরেই

ঢুকে গেল। ওপরে, তার ঘরের কাছে দাঁড়িয়েছিল বাড়িওলা। আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচ্কে উঠলো, হেঁকে বললে, হুজ দেয়ার? রেজাক বললে, মাই ফ্রেণ্ড। সাহেব আমার চেনা, সেলাম করে সে কথাই বলতে যাচ্ছি, সাহেবের চোখ ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে। রোশনীর দিকে তাকিয়ে সাহেব থ। আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে সোজা হাত ধরলো মেয়েটির। তারপরে গটগট করে ওকে নিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে গেল। রেজাক একটুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে আমাকে বললে, নিচে চল। এলুম নিচে। স্টার বোর্ড সাইডে রেলিং ঘেঁষে দুজনে বাৎচিৎ করতে লাগলুম। তারপরে কী মজার কাণ্ড হলো জানেন? জাহাজে ঠিকাদারের কুলিরা খাটছিল তো? বয়লার না ট্যাঙ্ক কোথায় কাজ করছিল। তাদের মধ্যে এক-আধটা ছিঁচকে চোরও থাকে। কখন চুপিসারে ওপরে উঠে গেছে কেউ টেরও পায়নি। রেজাকই দেখতে পেলো ওকে। শালার চোর ওপর থেকে শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এসব চুরি করে পালাচ্ছিল। বেড়াল যেমন ইঁদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি করে অমন সা-জোয়ান চেহারার রেজাক গিয়ে পড়লো লিকলিকে চেহারার লোকটার ঘাড়ে। একটা হৈ-হৈ পড়ে যেতো। কিন্তু রেজাক তার মুখে হাত চাপা দিয়ে একরকম পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলো আমার কাছে। চোরটাকে বললে, চিল্লাবি তো টুটি টিপে দরিয়ায় ফেলে দেবো! আমার তো চোখ ওদিকে ছানাবড়া, বুঝলেন? এ শাড়ি, জামা, সায়া যে ঐ রোশনী মেয়েটার! রেজাক ততক্ষণে লোকটার দুহাত মুচড়ে পিছনে এনে ঘাড়টা নিচু করে ধরেছে। সাপের মতো হিসহিস করে রেজাক বললে, কোথা থেকে পেলি, বল শালা বেইমান? চোরব্যাটা কোনোরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ওপরে। রেজাক বললে, ওপরে তো বুঝলুম, ঠিক কোন জায়গাটায় পেয়েছিস? চোর বললে, বাড়িওলার ভেতরের ঘরের সামনে। রেজাক বললে, ঘর খোলা ছিল, না, বন্ধ? চোর বললে, বিলকুল বন্ধ। রেজাক তখনো ফুঁসছে, বললে, শালা পেট ভরাবার আর উপায় পাওনি? ক্যাপিতান তাড়াতাড়ি শোবার ঘর বন্ধ করেছে, বাইরের ঘর বন্ধ করেনি! আঃ সেখানেই মেয়েছেলেটা—কাপড় চোপড় খুলে—! শালা, মেয়েছেলের পরণের কাপড় চুরি? চোর বললে, আর করবো না। রেজাক বললে ঘর কোথা? চোর বললে, মেটেবুরুজ। রেজাক বললে, কোন্ মহল্লা? চোরটা মহল্লার নাম করলো। রেজাক বললে, —শালা তুমি ইয়াকুবের বস্তির লোক? ইয়াকুব আমার

দোস্ত্, তা জানিস? কী কাম করছিলি? চোর বললে, কাম নেই। আজ এসেছিলুম, কিন্তু 'রোজ' জোটেনি। রেজাক ওর পিছনে একটা লাথি মেরে বললে, কাল আমার গ্যাং-এ আসিস, রোজ দেবো। লেকিন খবরদার, চুরি-চামারি করবি তো টুটি টিপে মেরে ফেলবো। আমার নাম রেজাক সরদার, ইয়াদ রাখিস। লোকটা যেন ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। আমি আপনাকে বলবো কী শিশিরবাবু, আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। লোকটা চলে যেতেই শাড়িটাড়িগুলো হাতে নিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করে ওপরে উঠে গেল রেজাক। আমিও গেলুম সঙ্গে সঙ্গে। রেজাক বাড়িওলার কেবিনে ঢুকে ভিতরের দরজার সামনে ওগুলো আলতোভাবে রেখে চট করে পিছু হটে এলো। কোথায় কে যেন রেডিও চালিয়েছে, বিদেশী যন্ত্রের গাঁক গাঁক বাজনা ভেসে আসছে। রেজাক আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসলো। হাসলুম আমিও। তারপরে আবার নেমে এলুম নিচে। আবার সেই স্টার-বোর্ড সাইডের রেলিং। রেজাক বিড়ি ধরালো, আমাকেও দিলো একটা। বললে, বাড়িওয়ালাটা আজব চীজ। কিছুতেই জাহাজ ছেড়ে বাইরে যাবে না। লেকিন চার বছর আগে যখন 'বড়া মালিম' ছিল, তখন আমাকে নিয়ে বেড়াতো। এবার বেরোলো না, বললে, ক্যাপিতান হয়েছি, আমার কি বেরোনো চলে? ওসব জায়গায় আমার লোকজনরা আমাকে দেখলে ভাববে কী? শেষ পর্যন্ত একগাদা টাকা কবলে জাহাজেই মেয়ে আনালে, যত লোককে পেয়েছে ছুটি দিয়েছে। লেকিন এসব খবর কি জানাজানি হতে বাকি থাকে? এইরকম আরও খানিকটা বাৎচিৎ করে আমি চলে এলুম আপনার কাছে।

শিশিরের কৌতূহল তবু যায় না, বললে, —মেয়েটার কী হলো?

—কী আবার হবে? ওখানেই আছে। বাড়িওলার ভেতরের ঘরে।

শিশির এসব ব্যাপারে সত্যিই অনভিজ্ঞ। বললে, —ওর শাড়িটাড়ি বাইরের ঘরে এলো কী করে?

এবারে উচ্চকিত হেসে উঠলো মুন্সিজী, বললে,—আপনি ছেলেমানুষ শিশিরবাবু, এতদিন জাহাজ জাহাজ করেও ওসব আজব আদমিদের চিনতে পারলেন না!

ওরা কথাবার্তা বলছে তন্ময় হয়ে, এমন সময় আরও একখানা গাড়ি এসে থামলো ওদের পিছনে। ওরা প্রথমটায় খেয়াল করে নি। পরে হঠাৎই

নিজের নামটা শুনে শিশির চমকে ফিরে তাকালো। গাড়ি থেকে নামছেন সেজোবাবু। দোহারা চেহারা, গায়ের রং কালো হলেও একটা লাবণ্য আছে। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। পরণে ছাই রঙের ট্রপিক্যাল স্যুট, কিন্তু মাথার চুল এলোমেলো। সারা মুখে তখনো ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে, সব মিলিয়ে যেন বিপর্যস্ত চেহারা। এঁর ছোট একটি ভাই ছিল, তিনি মারা গেছেন বহুদিন আগে মেনেনজাইটিস হয়ে। সেইজন্য সবাই বলে, সেজোবাবু।

সেজোবাবু দরজা খুলে নিজেই এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। চলার ভঙ্গিতে ক্লান্তি, গলার স্বরও নির্জীব। মুন্সিজীর উপস্থিতি সম্ভবত তিনি তখন ঠিক আশা করেন নি, তাই ওকে দেখে একটু যেন চমকেই উঠলেন মনে হলো। বললেন, তুমিও আছো? ওঠো গাড়িতে।

শিশির না বুঝলেও মুন্সিজীর অনুভব করতে বাকি নেই, কোথাও নিদারুণ কিছু একটা ঘটেছে। সে ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, কী হয়েছে সেজোবাবু?

সেজোবাবু মুখ তুললেন। কোটের বুক পকেটে ভাঁজ করা রুমালখানি শোভা পেলেও হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন, তারপরে বললেন—এখানে কী করছিলে? জাহাজের জন্য বসেছিলে তো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সেজোবাবু বললেন—জাহাজ কোথায়?

—আজ্ঞে আসে নি, সেই বিকেল থেকে বসে আছি, এখন রাত দশটা বেজে গেল—

কথা বলে যাচ্ছিল মুন্সিজীই। শিশিরকে নিরুত্তর দেখে তারই দিকে মুখ ফেরালেন সেজোবাবু, বললেন,—জাহাজ এসেছে।

ওরা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলো,—কোথায়?

সেজোবাবু বললেন, গার্ডেনরীচ জেটিতে।

—সে কী!

সেজোবাবু বললেন,—জোয়ার ভাঁটার কী ব্যাপারে জাহাজ এখানে না এসে ওখানে গেছে। আন্দাজ সাড়ে সাতটায় জেটিতে ভিড়েছে। আমি বাড়ি ছিলাম না, বাড়ি ছিলেন বড়দা। জেটি থেকে একজন জানাশোনা টালিক্লার্ক বড়দাকে ফোন করে। বড়দা তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। উপায়

তো নেই ? যেরকম কম্পিটিসনের বাজার, কে গিয়ে কখন ভুজুং-ভাজুং দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেয়, কে জানে ! তাই বড়দা নিজেই হড়বড় করে গ্যাংওয়ে দিয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে একেবারে—

সেজোবাবু কথাটা শেষ না করেই থামলেন। ওরা শুনছিল রুদ্ধশ্বাসে। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—তারপর ?

সেজোবাবু হাত দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছলেন,—ততক্ষণে আমি বাড়ি পৌঁছেছি। আবার ফোন এলো। বড়দার অ্যাক্সিডেন্ট। পি-জিতে বড়দাকে দিয়ে আবার ছুটলাম জাহাজে। অর্ডার পত্র আমরাই পেয়েছি। বড়দার ঐ ব্যাপার হওয়ায় ক্যাপ্টেন বরং সিমপ্যাথেটিক হয়ে সব কাজই আমাদের দিয়ে দিলেন।

মুন্সিজী বললে,—কেয়া তাজ্জব ! বড়বাবুর চোট—

সেজোবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, ডাক্তার সন্দেহ করছে, ফ্র্যাক্‌চার। একস্‌-রে করলে জানা যাবে।

শিশির বললে, হাসপাতালে কে আছে বড়বাবুর কাছে ?

—কে আবার থাকবে ? নার্সরা,—সেজোবাবু বললেন,—ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে। স্পেশাল কেবিন, স্পেশাল নার্স। কিন্তু থাক ওসব কথা, তোমরা ওঠো, অনেক কাজ আছে। জাহাজ বেশিদিন থাকবে না, কাজ দিয়েছে সে আন্দাজে অনেক। আমি আজই একটা গ্যাংকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। তাছাড়া জাহাজে গোলমালও আছে। জাহাজের পার্সার খুব অসুস্থ। তাকেও হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হলো। ঐ পি-জিতেই। এজেণ্ট-টেজেণ্ট সবাই জাহাজে গেছে ভিড় করে। নাও, আর বকতে পারি না, ওঠো।

ওরা আর কোনো কথা না বলে গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো, সেজোবাবু উঠলেন পিছনে।

তাদের জাহাজপ্রতিম বাড়িটা ভবানীপুরে, হরিশ মুখুজ্যে রোডের ওপর। গাড়ি গঙ্গার ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে পি-জির পাশে এলো। গাড়িতে এলে সাধারণত সার্কুলার রোড বরাবর এসে ডাইনে হরিশ মুখুজ্যে রোডে বাঁক নিতে হয়। এবার গাড়িটা পি-জির পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়লো। সেজোবাবু বললেন, বড়দা ভিতরের দিকে আছে, দোতলায়।

সারা রাস্তাটা অন্ধকার, লোকজন নেই, একটা ছমছমে ভাব যেন আপনিই

বুকের ওপর চেপে বসতে চায়। গাড়িটার গতি মন্থর হয়ে এলো, কিন্তু পি-জির গেটের কাছে থামলো না।

শিশির বললে, বড়বাবুকে দেখতে যাবো না একবার?

সেজোবাবু উত্তর দিলেন, এখন দেখা বারণ।

শিশির নির্বাক হয়ে গেল। দেখতেই যদি পাবো না, তো এই ভয়-ভয় করা রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি কেন? কিন্তু কথাটা তার মনে জাগলেও মুখ ফুটে বলতে পারলো না সে। গাড়ি মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো। একটু দূরে, সামনে, ডানদিকেই পড়বে পুরোনো পাঁচিলঘেরা একটা কবর স্থান। কিন্তু সেটা আসবার আগেই গাড়ি বাঁদিকে মোড় নিলো, গতি বাড়লো, একেবারে সোজা বাড়ি।

নিঝুম নিথর একটা হালভাঙা জাহাজ যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারের সমুদ্রে স্থির হয়ে আছে। দারোয়ান গেট খুললো, গাড়ি গিয়ে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালো। ওরা তিন-চারটি প্রাণী যেন মুহূর্তে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মুন্সিজী আর কোথায় যাবে? নিচের তলার সামনেকার অংশটা অফিস ঘর। ক্যাশবাবু-কেরাণীবাবু কেউ নেই, টাইপরাইটার যন্ত্রদুটো নিঝুম হয়ে বসে আছে। চেয়ারগুলো শূন্যতায় ভরে আছে, দেওয়ালের বড়ো ঘড়িটার পেণ্ডুলাম শুধু দুলে দুলে চলেছে। মুন্সিজী যে কেন এলো, তা নিজেই জানে না। সেজোবাবু যে তাকে গাড়িতে কেন তুললেন, কে জানে? এখন আর কেউ তাকে ডাকছে না। দারোয়ানের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে সে বেরিয়ে এলো কালো পিচের রাস্তায়। রাত অনেক। শেষ বাসটা আবার না ছেড়ে যায়। মুন্সিজী যাবে তার ডেরায়। তিন নম্বর বাসটা ধরে মমিনপুরের মোড়ে নামবে, ব্যস, সেখান থেকে পায়দলে তার বস্তি। বুড়ো বয়সে বউ যার মারা গেছে, তার আর দুনিয়ায় কেউ নেই ধরতে হবে। এখানে মেয়ে জামাইয়ের কাছে সে থাকে। বস্তিটাতে ঢুকেই বাঁহাতি একখানা চার-বাই-ছ ফিট ঘর, ঝাঁপ খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়লো মুন্সিজী। কোথা থেকে কড়া মশলায় রান্না গোস্তের খোশবু আসছে। বার কতক শুঁকে নিয়ে তার জন্য ঢাকা দিয়ে রাখা খান কতক চাপাটি, অড়হর ডাল একটা ছোট্ট বাটিতে, একটু নুন আর এক গ্লাস জল, এইসব সে তার কাছে টেনে নিলো। দরজার কাছে কালিপড়া

চিমনির একটা হ্যারিকেন জ্বালানো ছিল, সেটা ও খাবারের কাছে আনলো। রাতের বেলা চোখে ঠিক ঠাওর পাওয়া যায় না ; শালার আরশোলাগুলো ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ করে উড়ছে, কোনোটা ডালের বাটির ওপর পড়লো নাকি ?

বস্তির কোন্ শালা আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 'আই বাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। মুন্সিজীর চোখে ঘুম কম, সারা রাতে কতটুকুই বা ঘুমোয় সে ? জেগে জেগে নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। তার পাশের খুপরিটা বেশ বড়ো। সেটাতেই থাকে তার মেয়ে-জামাই। একদিকে চট টানিয়ে একটু আড়াল করে নিয়েছে। সে আড়ালে মেয়ের দুই ছেলে—আফজল আর মতিন শুয়ে থাকে। আফজল বছর পনেরোর হবে, মতিনটা দশ বছরের। আর বাচ্চা মেয়ে—তিন বছরের ফতিমাটা মা-বাপের কাছেই শোয়। ছেলেদুটো মক্তবে যায়, আর অন্য সময় একটা বিড়ির দোকানে কাজ শেখে। জামাই পোর্ট কমিশনার্সের মজদুর, সা-জোয়ান চেহারা। সারা সন্ধ্যেটা এদিক-ওদিক আড্ডা দিয়ে রাত দশটার মধ্যে ফেরে। এক একদিন রাত্রে মেয়ে-জামাইতে দিব্যি ঝগড়া বেঁধে যায়, পাশের ঘর থেকে বুড়ো মুন্সিজী সব শোনে। শুনতে শুনতে দন্তহীন মুখে নীরবেই হেসে ফেলে, তারপরে কানে হাত চাপা দেয়। মেয়েটাকে জামাই পেয়ার করে খুব। কিন্তু এক এক রাত্রে কী হয়, মেয়ে বেঁকে বসে, জামাইকে সে কিছুতেই কাছে আসতে দেবে না, লেগে যায় ঝগড়া। মেয়ে বলে, তিনটে আছে, দুটো গেছে, আর চাইনা বাবা। জামাই নিচু গলায় কী সব ফিসফিস করে বলে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু মেয়ে আস্তে কথা বললেও তা শোনা যায়। মেয়ের গলার স্বরে বেশ একটু জোর আছে, ঠিক ওর মায়ের মতো। ওর মায়েরও ঐরকম ছিল।

কিন্তু আজ কাঁথা, মাদুর, বালিশ ঠিক করে নিয়ে শুতে শুতে মুন্সিজীর মনে হয়, ওদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন ? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ? অন্য দিককার কোন ঘর থেকে আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কে বলে উঠলো, ভোঁ কাট্টা!

—দূর শালা!—বিড়বিড় করে উঠলো মুন্সিজী। ঘুমিয়েও কারুর ঘুঁড়ি কাটছিস! তুই শালা নির্ঘাৎ দোজখে যাবি।—বলতে বলতে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো মুন্সিজী।

পি-জিতেও তখন আলো নিভে গেছে বোধহয় বিশেষ একটা কেবিনে। অনন্ত অন্ধকারের চন্দ্রাতপ ওদের দুজনকে ঢেকে দিলো একই সঙ্গে। মুন্সিজীর

মনে পড়তে লাগলো একটি দিনের কথা। তখন মুন্সিজীও সা-জোয়ান। খোকাবাবু পরীক্ষা দিতে গেছে। দুপুরবেলা মা-জী নিজে গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে এসেছেন ডাব আর সন্দেশ। আর বিকেলে টমটম হাঁকিয়ে কে যাবে খোকাবাবুকে আনতে? ডাকো এই মুন্সিকে। তার মুন্সিজী নাম সেই তখন থেকে। কে যে তাকে প্রথম ঐ নামে ডাকলো আজ আর মনে নেই—কী কারণে ডেকেছিল তাও মনে নেই—এই নামের আড়ালে তার আসল নাম ক্ষয় হতে হতে এক সময়ে লোপ পেয়ে গেল।

যাইহোক, গাড়োয়ানের পাশে বসে টমটম চড়ে খোকাবাবুকে আনতে গেল সে। কী ঝকঝকে দেখতেই না ছিল টমটমটা! কর্তাবাবুদের নিজেদের টমটম। ঘোড়া দুটো ওয়েলারই হবে, বাবুরাই কিনেছিল, থাকতো সেই আলিপুরে অ্যান্টুনি সাহেবের আডগডায়। বুড়ো অ্যান্টুনি বলতো, রেসের ঘোড়া, বাতিল হয়ে গেছে বলে এখন গাড়ি টানে। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে কে জানে। আজ আর সেই ঘোড়া দুটোও নেই, এ্যান্টুনি সাহেবও নেই। খোকাবাবুকে দেখতে তখন ছিল ঠিক যেন রাজপুত্তুরটি। গাড়িতে ওঠবার আগে মুন্সি সেলাম করতেই বললে, তুমি নতুন এসেছো, না?

—জী।

—কী নাম?

—মুন্সি বলে সবাই ডাকে।

খোকাবাবু একটু হেসে গাড়িতে উঠলো। বড়ো আচ্ছা মেজাজের আদমি ছিল ঐ খোকাবাবু। এখন বড়ো হবার পর পাঁচ ঝামেলা মাথার ওপর, সব সময় মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। তাছাড়া, ঐ খোঁড়া মেজোবাবুই কি ওকে জ্বালায় কম? ঝামেলা বাধাতেই আছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুকটা ধ্বক করে উঠলো মুন্সিজীর। সর্বনাশ! খোকাবাবু ইয়ানে—বড়বাবুও শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে না তো!

এদিকে জাহাজী বাড়িতে ঘড়িতে ঢং করে 'একটা' বাজলো। এ-বাড়ির বৃহৎ ছাদের কোণে সারি সারি কতগুলো অ্যাসবেস্টাসের চাল-ছাওয়া ছোট ছোট ঘর আছে। তারই একটাতে থাকে শিশির। আলো নিভিয়ে ঠাকুর চাকরদের মতো সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী মনে করে হঠাৎ জেগে উঠলো। ঘুম ঠিক নয়, সারাদিনের ক্লান্তির পর একটু তন্দ্রা। পাশের ঘরে ঠাকুরের নাক ডাকছে। চাদের

কাছে কয়েকটা চৌকো চৌকো ইঁটের ফাঁক আছে হাওয়া চলাচলের জন্য, সেখান থেকেই আসছে গর্জনের ধ্বনি। এ ধ্বনি তার গা সওয়া, কিন্তু আজ তার সারা মন জুড়ে একটা অস্বস্তির ঢেউ বয়ে চলেছে। ছোট একটা তক্তপোষের ওপর তার শক্ত বিছানাটা, তার ওপর বার কয়েক এপাশ ওপাশ করেই উঠে পড়লো শিশির। ছাদে এলো। বিরাট ছাদ। মাথার ওপরে কালো আকাশটা যেন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। তারাগুলো যেন পুলিশের চোখের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে সব কিছু লক্ষ করছে। কোথায় অনেক দূরে কুকুর ডাকছে। অনেক দূরের পাড়ায়। হয়ত বা পটোপাড়ার ঐদিকে। পটোপাড়ায় চিরদিন গোলমাল লেগেই আছে। বিশেষ করে কোনো পুজো-পার্বন যখন আসন্ন হয়ে ওঠে, তখন তো বটেই। ভারী ভারী লরির শব্দ, ছেলেদের চিৎকার, দুর্গা কিংবা সরস্বতী মাঈ কি জয়! দিনের বেলা টের পাওয়া যায় না, রাত গভীর হলেই সেই দূরাগত ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে!

ছাদের যেদিকে দাঁড়ালে পটোপাড়ার খানিকটা দেখা যায়, ঠিক সেইদিকে এসে দাঁড়ালো শিশির। একটা পাখি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একবার ডেকে উঠলো। ডাক শুনেই বুঝলো, প্যাঁচা। সাদা রঙের নাকি? লক্ষ্মী প্যাঁচা? তাহলে আয় না বাবা, এবাড়ির কোথাও এসে বোস। প্যাঁচা বসলে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ এসে পড়ে সে বাড়িতে। ধনে মানে ঐশ্বর্যে উপচে পড়ে সেই গৃহস্থের সংসার! কিন্তু এখানে বসলো না প্যাঁচাটা, বার কয়েক ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনখানা বাড়ির পরে গিয়ে চুপ করে বসলো। ঈস্! কী ভাগ্য বাড়িটার! নতুন উঠেছে, কারা ও বাড়িতে থাকে কে জানে! গ্যারেজে একটা বিরাট গাড়ি আছে, পন্টিয়াক না কী যেন! কে যেন বলছিল, ওদের বাল্‌বের ব্যবসা। এই যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, তারই বাল্‌ব।

শিশির ঘরে আসবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই হঠাৎ প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠলো। সিঁড়ির কাছে আলসের পাশে সাদা শাড়ি পরা কে যেন দাঁড়িয়ে। কালী চাকরটা ঠাকুরের ঘরের পাশেই শোয় অন্য চাকরদের সঙ্গে। কালী বলতো, এ-বাড়িতে ভূত আছে। বাড়ি হবার আগে এখানটায় নাকি একটা জলা ছিল। সেই জলায় খুন হয়েছিল একটা মেয়েমানুষ, মেমসাহেব। অন্যরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলতো, —হ্যাঁ, তুই দেখেছিস!

কালী বলতো, আমি দেখবো কেন? আমি কি জন্মেছি তখন? আমি শুনেছি।

প্রায়ই কালী বলতো, সাদা ঢিলে জামা-কাপড় পরা মেয়েছেলে ঘুরে বেড়ায় ছাদে। জোছনাতেই তেনাকে দেখা যায় বেশি।

অন্য লোকেরা পরস্পর গা-টেপাটেপি করে হাসতো, বলতো, গাঁজা-টাজা খায় আর কী? বোঝো না?

এ অপবাদ সত্যি কিনা কে জানে, কিন্তু আজ বুকটা ছ্যাৎ করে উঠতেই কালীর কথা মনে হলো। এ-ও তো ঢিলেঢালা সাদা জামা-কাপড়! তার চোখের ভুল নয় তো? হাত দিয়ে দুটো চোখ রগড়ে নিলো শিশির। না, ভুল নয়, ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে! ঐ তো একটু নড়লো! কিন্তু না, মেমসাহেব নয়, শাড়ি পরা বাঙালী মেয়ে। আগাগোড়া সাদা। জামা সাদা, শাড়িও সাদা। কালো শুধু মাথার কালো খোঁপা। শিশির নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি কয়েক পা এগিয়ে গেল সেদিকে।

মূর্তিটি আবার নড়লো, মুখ ফেরালো তার দিকে। আর আশ্চর্য, তাকে দেখে একটুও চমকে উঠলো না। বরং চোখ তুলে শান্ত দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকালো।

অবাক হয়ে গেল শিশির। শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। বুকটা সজোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। সর্বনাশ! ও এখানে কেন? এতো রাত্রে?

—ঘুমোও নি কেন?—উল্টে সে-ই প্রশ্ন করলো শিশিরকে।

কেমন একটা অবিশ্বাস্য ভয়ে তার পা দুটো তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে উঠছে, উত্তর দেবে কেমন করে?

ছোটদিদিমণি কিন্তু সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর এক সময় বুকের আঁচলটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে,—বড়দার খবর শুনেছো তো?

কোনক্রমে শুষ্ককণ্ঠে এবার উত্তর দিলো শিশির,—হ্যাঁ।

সুষমার গলার স্বরটা গাঢ় হয়ে এলো, বললে,—এই বাড়িতে, ঐ একটি মানুষ। ঐ একটি মানুষকেই আমি ভালোবাসি। বাবা নেই, মা নেই, ঐ বড়দাই বাপ-মা, একাধারে সব।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সুষমা সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

এবারে মুখ ফেরালো তার দিকে, বললো, ঘুম আসছিল না, তাই উঠে এলাম ছাদে, তোমরা যে এখনো ঘুমোওনি, জানবো কী করে ?

শিশির বললে, আর সবাই ঘুমিয়েছে।

সুষমা বললে, তাতে কী হলো ?

লজ্জা ও সঙ্কোচের জড়িত ভঙ্গিমায় শিশির বললে,—না, এই বলছিলাম—

সুষমা বললে, সারাদিন খেটেখুটে এসেছো, এখন আর জেগে থাকবার দরকার কী ? বড়দার কথা ভাবছো ? বড়দা তোমাদের কে ? মনিব বই তো নয় ?

শিশির যন্ত্রচালিতের মতো আরও কয়েক পা এগিয়ে এলো। কী যে সে বলবে ঠিক করতে না পেরে ফট করে বলে উঠলো, মনিবই তো সব। মনিবের কিছু হলে চাকর-বাকরের ঘুম হয় ?

মুখ তুললো সুষমা, ওর চোখের দিকে তাকালো, বললে,—হচ্ছে তো ঘুম। শুনতে পাচ্ছো না ?

বাস্তবিক, ওখান থেকেও ঠাকুরের নাসিকাগর্জন শোনা যাচ্ছিল।

সারাদিনের সব কিছু ঘটনা যেন পরপর এসে ওকে হঠাৎ সাহসী করে তুলেছিল। শিশির বললে, ওটা না ধরে, আমার কথাটাও তো ধরতে পারতেন !

সুষমা বললে, হচ্ছে না কি, বড়দার জন্য কোনো দুঃখ ?

কী এক অব্যক্ত আবেগ যেন এসে শিশিরের গলাটা হঠাৎ চেপে ধরলো। সে কোনো কথা বলতে পারলো না, চোখ দুটো বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই ছলছল করে উঠলো।

এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল সুষমা, হঠাৎ আলসে ছেড়ে ওর কাছে সরে এলো। বললে, কী যে তোমার অবস্থা হবে, তাই ভাবছি।

চমকে উঠলো শিশির, একথার মানে ?

সুষমা বললে, মানেটা কালকেই জানতে পারবে সেজদার কাছ থেকে। সেজদারও যেমন খেয়াল, যাকে তাকে দিয়ে ওসব কাজ হয় নাকি ?

শুনতে শুনতে উত্তরোত্তর ভীত হচ্ছিল শিশির। বললে—কী ব্যাপার। আমাকে বলুন না ? আমি কি কোনো দোষ করেছি ?

সুষমা বললে, দোষ করলেই বা ক্ষতি কী ? ফাঁসি গেলেও ক্ষতি নেই। কে আছে তোমার ? কে কাঁদবে তোমার জন্যে ?

শিশির ক্রমশই হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। ছোটদিদিমণিকে এভাবে কথা বলতে কখনো দেখে নি, কখনও সে শোনেও নি এধরণের কথা। তাই ওর প্রশ্নটা ভালো করে বুঝবার চেষ্টা না করে শিশির তার আগেকার কথারই জের টানতে লাগলো। বললে, আমি কী দোষ করেছি, বলুন না?

সুষমার মুখে এবার একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, বললে,—না, কোনো দোষ করো নি। তোমাদের কাজের ব্যাপারেই সেজদা তোমাকে কিছু বলবে। কোন্ দূর দেশে তোমাকে নাকি যেতে হবে। কিন্তু সবার চোখের আড়ালে গিয়ে কাজ কর্ম ঠিক ঠিক করতে পারবে তো? সেই কথাই বলছিলাম।

শিশির হাঁ করে শুনছিল। 'দূর দেশ', 'চোখের আড়ালে কাজ'—এসব যেন নতুন জগতের কথা তার কানে ভেসে আসছে!

সুষমা বললে—যদি ভালো করে লেখাপড়াটা শিখে নিতে!

শিশির অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো,—কী আশ্চর্য, চাকরবাকর আবার লেখাপড়া শিখবে কী! কী-ই বা হবে শিখে? কে-ই বা শেখাবে?

সুষমার চোখের তারা দুটো যেন কেঁপে উঠলো মনে হলো। বললে, আমিই শেখাতাম! বড়দার টাকায় আজকাল দামী বাসে চড়ে কলেজে তো পড়তে যাই, না কী? শুধুই গান নিয়ে আছি নাকি?

শিশির বললে, শেখান না আমাকে?

সুষমা বললে, দূর পাগল! আর সময় কই!

শিশির স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরও বুঝি ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যায়। অবশ্য, পাত্র বিশেষে। যেখানে যখন একটু স্নেহ বা কোমলতার আভাস পায়, সেখানেই অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে ও দাবি জানায় বা অভিমান প্রকাশ করে। ঠিক ঐ কালী চাকরটার মতো। ধমক খেলে ভিজে বেড়ালটি, আর একটু কোমল কণ্ঠ শুনলে তিড়বিড় করে ওঠে। ধমকে ওকে বলো, যা শীগ্‌গির এই কাজটা করে আয়। তখ্‌খুনি ছুটবে। আর যদি বলো, ভাই কালী, এটা করে দে না ভাই? অমনি ও বলে বসবে, আমি পারবো না, আমার এখন সময় নেই।

তা' মানসিকতার দিক দিয়ে শিশিরও চাকর বাকরদের থেকে একটু বৃহত্তর সংস্করণ ছাড়া আর কী? শিশির তাই সুষমার কথার উত্তরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো, সময় নেই, সময় নেই বলছেন কেন? আমি যদি না যাই?

সুষমা চোখ বড়ো বড়ো করে বললে,—বটে !

শিশির রাগ করেই বললো, আমি বলবো আমি যাবো না। আমি লেখাপড়া শিখবো দিদিমণির কাছে।

সুষমা হেসে ফেললো। বললে,—ব্যস। আর দোতলায় বা তেতলায় নামতে হচ্ছে না, সোজা সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত—ওপর আর নিচ।

—কী আশ্চর্য, আমি তাহলে পড়াশুনা করবো কার কাছে ?

—আমারই কাছে,—সুষমা বললে, কিন্তু কাউকে না বলে ঢাক পিটিয়ে কাউকে না বললেই হলো।

—লোকে দেখবে না ?

—দেখলে কী হবে ?—সুষমা বললে, ছোট থেকেই এবাড়িতে আছো, ফাইফরমাস খাটছো, লোকে আবার কী ভাববে ? চাকর বাকরদের মতো থাকলে কারুরই কোনো দিকে মাথাব্যথা হবে না।

শিশির মাথা নিচু করলো। একটুক্ষণ থেমে মৃদুকণ্ঠে বললো,—আমি কি কখনো সেটা অস্বীকার করেছি ! চাকরই তো আমি। সেজোবাবু সার্ট-প্যান্ট পরিয়ে জাহাজে পাঠালে কী হবে ?

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজনে। তারার আলোয় তবু যেন দুজনকে দুজন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। শিশিরের গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি, ওর সুগৌর সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে সুষমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শিশির বললে, বাইরে পাঠাতে চাইলে হবে কী ? আমি সোজা বলে দেবো, আমি যাবো না।

সুষমা যেন স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে উঠলো,—তুমি একসারসাইজ করো নাকি ?

কী কথায় কী কথা ! একটু যেন থতমত খেয়ে গেল শিশির। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললে,—না।

সুষমা হয়ত আরও কিছু বলতো। হঠাৎ ঘড়িটা ঢং করে বেজে উঠলো। ওদেরই বাড়িতে একটা বড়ো ঘড়ি আছে, বেশ জোরে শব্দ করে সময়ের হিসাব জানিয়ে দেয়। সুষমা চমকে বললে, দেড়টা বাজলো, যাই শুতে যাই।

বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরদিনই জানা গেল, বড়বাবুর পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। জোড়া লাগতে বেশ কিছুদিন কাটবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বেশ কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়।

শিশির হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতে সময় পায়নি। পরদিন ভোর থেকেই তাকে জাহাজে ছুটতে হয়েছিল। কেটে গেল সেইদিনটাও।' দিনরাত ওদের মজুররা কাজ করছিল, জাহাজ আবার রওনা হবে শীগ্‌গিরই, কাজও তাই অচিরে শেষ হওয়া চাই। কোথায় রইলো বিদেশ যাওয়া, কোথায় রইলো সুষমা, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেতে লাগলো, তার হিসেব কে রাখবে? আরও একটা দিন কাটলো। সেদিনও সকালে জাহাজে গেছে শিশির। ট্রামেই সে যায়, কখনো বা বাসে, বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে।

সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ-সালাপ হয়েছিল শিশিরের। তারই ঘরে বসে কফি খাচ্ছে, এর মধ্যে ওদের একটি মজুর এসে খবর দিলো, শীগ্‌গির আসুন, সেজোবাবু আপনাকে খুঁজছেন।

—কোথায় সেজোবাবু?

—বাড়িওলার ঘরে ছিল। নেমে গেছে।

অতএব শিশিরও তাড়াতাড়ি ছুটলো। কাজ প্রায় শেষ, এইবার বিল করতে বসতে হবে সেজোবাবুর সঙ্গে। বিলের গৎগুলো অভ্যাসে অভ্যাসে বেশ কিছুটা শিখে গেছে শিশির, রেটও জানে, এমন কি টাইপরাইটারে বিল-ফর্ম লাগিয়ে একটা কি দুটো আঙুল দিয়ে খটাখট টাইপ করতেও পারে। তবে এভাবে টাইপ করতে হয় বলে একটু সময় লাগে। অফিসের টাইপবাবু হেসে বলেন, মেসিন পড়ে থাকে, বসে বসে রেওয়াজ করুন না, শিখে যাবেন।

টাইপবাবুটি পুরানো লোক, ওদের সবার নাড়ি-নক্ষত্র তিনি জানেন। তাই, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শিশির বলে, কী হবে শিখে? সেজোবাবুর খেয়াল, কোনদিন বলবে, প্যাণ্ট ছাড়। তখন আবার যে শিশির, সেই শিশির।

যাই হোক, সেজোবাবু জেটির পিছনে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওকে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। ও কাছে গেল। বললেন,—ওঠ, গাড়িতে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল শিশির। সেজোবাবু প্রায় ধমকেই বললেন, ওখানে নয়, এখানে আয়।

শিশির অবাক হলো। তারপরে পায়ে পায়ে এসে, পিছনে, ওঁরই পাশে বসে পড়লো। বসলো বেশ জড়োসড়ো হয়ে। গাড়ি ছেড়ে দিলো।

কোনো কথা নেই কিছুক্ষণ। গাড়ি খিদিরপুরের ব্রীজ ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁক নিলো সার্কুলার রোডে। বাঁদিকে রেসকোর্সটাকে রেখে গাড়ি ছুটতে লাগলো সোজা। সোজাই ছোটবার কথা, সেজোবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, বাঁদিকে ঘোরাও। চলো নিউ মার্কেট।

এ-ও শিশিরের অভ্যস্ত ব্যাপার। জাহাজের ক্যাপটেন বা চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে বোধহয় কোনো কিছু উপহার দিতে হবে, তাই নিউ মার্কেটে চলেছেন সেজোবাবু। কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে এতো হাঁকডাক করে সঙ্গে নিলেন কেন?

না, কোনো উপহার-টুপহার কেনা নয়, দরকারটা নিছক শিশিরকে নিয়েই। আবদুলের দোকান বলে যে বিখ্যাত কাপড়ের দোকান আছে, সেখান থেকে বাবুদের সাজ-পোষাক তৈরি হয়, তাকে নিয়ে একেবারে সেখানে উঠলেন গিয়ে সেজোবাবু। স্বয়ং আবদুল বুড়োই এলো ফিতে নিয়ে। মাপ নিলো শিশিরের। সেজোবাবু বললেন, চারটে স্যুট চাই এর। সঙ্গে মানানসই সার্ট আর টাই। একটা ভালো ট্রপিক্যালের, একটা সার্জের, আর দুটো অন্য যা ভালো জিনিষ আছে তার। বুঝলে আবদুল?

আবদুলের চোখে পুরু চশমা, মাথায় টুপি, কানে পেন্সিল, পরনে সাধারণ পায়জামা আর সার্ট। দেখলে কে বলবে যে, এই লোকটি নিউ মার্কেটের এতো বড়ো দোকানের মালিক। এখনো বসে বসে নিজের হাতে স্যুটের কাপড় কাটে, তা সে প্যান্টই হোক আর কোটই হোক। দোকানে কর্মচারী অঢেল, তাদের পোষাক-আশাক আদব কায়দাও নিখুঁত। তাদের মধ্যে এই বুড়ো আবদুলই বোধ হয় বেমানান। দোকানে সাইনবোর্ডে কী একটা জমকালো নামই শোভা পাচ্ছে বটে, কিন্তু সবাই বলে 'আবদুলের দোকান'।

আবদুল শিশিরের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকালো, তারপরে সেজোবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, কাপড় কি আমি পছন্দ করিয়ে দিবো, না, আপনে দেখবেন?

সেজোবাবু বললেন,—তুমিই করবে। টাইও কিনবে। আমরা আর কবে পছন্দ করেছি?

আবদুলের এদিক দিয়েও দুর্দান্ত সুনাম আছে। চেহারা আর গায়ের রঙ

দেখে এমন কাটিং আর কাপড়ের রঙ বাছাই করে দেবে যে, দেখে না পছন্দ হওয়ার উপায় নেই।

সেজোবাবু বললেন, শোনো আবদুল, কাজটা খুব জরুরি। আর সব হাতের কাজ ঠেলে ফেলে এটি নিয়ে বসতে হবে। আমার পরশুদিন বিকেলেই চাই।

আবদুল অবাক হয়ে বললে, সেটা কি করে হোবে? আপনিই বোলেন?

সেজোবাবু মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, ওসব আমি শুনতে চাই না। পারবে কিনা বলো? না হলে অন্য দোকানে যাই।

মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠলো আবদুল বুড়ো। বয়সের ভারে লোকটা নুয়ে পড়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সেজোবাবুকে বলতে লাগলো,—আবে, তেরা বাপকা উমর সে হম তুমহারা কাম করকে আতা হুঁ, আউর ঐসি বাত মৎ বোল্!

সেজোবাবু হাসতে লাগলেন। বুড়োর রাগ তখনো যায় না। বলে, বাপের কোলে করে বাচ্চা উমরমে ইখানে আসিস নি? বেটা তুই আমার জাজিমের ওপর তোর বাপের কোলে বসে পেসাব করে দিয়েছিলি ইয়াদ আছে? তুমার নিকার বোকারভি আমি করিয়েছি, স্যুটভি করিয়েছি, ইয়াদ হায়? এইসি বাৎ মৎ বোলো বেটা, হাঁ। দুখ্ হোতা হায় দিলমে।

সেজোবাবু তখনো মিটিমিটি হাসছেন, বললেন,—ঠিক আছে। তুমিই করো। পরশুদিন বিকেলে চাই, কথার নড়চড় হলে চলবে না।

আবদুলের দাঁতের পাটি বাঁধানো। সেই বাঁধানো সমান আকারের দাঁত বার করে হেসে ফেললো আবদুল। বললে,—যা বেটা, যা। তাই হোবে। তোর সাথে কে কবে পেরেছে, বোল্?

শিশিরকে নিয়ে তখখুনি বেরিয়ে পড়লেন সেজোবাবু, আর দেরি করলেন না। এবার অন্য দোকানে। রেডিমেড স্লিপিং স্যুট, একজোড়া জুতো আর মোজা, চটি, টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান, তোয়ালে, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, মায় চিঠি লেখার প্যাড আর মাঝারী দামের একটা কলম পর্যন্ত।

এসব কেনাকাটার পর গাড়িতে উঠে সেজোবাবু যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, শিশির কথা বললো তখন। এতক্ষণ যেন তার সম্মোহিতের মতো কাটছিল। এসবই যে তার জন্য, সেটা তার বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু কেন? হঠাৎ তার জন্য এত খরচ কেন? এত খরচ করে তাকে সাজানোই বা কেন?

তবে কি ছোট দিদিমণির কথাই ঠিক হতে চললো? সত্যিই কি বাবুরা তাকে কোনো দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে চান?

তীব্র অভিমানে শিশিরের সারা মন ভরে গেল। সে গুম হয়ে বসে রইলো চুপচাপ। গাড়ি যখন পার্ক-ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে লাল আলোর সংকেত দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তখন সেজোবাবু ওর পিঠটাই চাপড়ে দিলেন একেবারে। বললেন, —কী হলো, চুপ করে আছিস যে?

চোখ প্রায় ছলছল করে এসেছে শিশিরের। বললে, আমি কোথাও যাবো না।

সেজোবাবু হাসছেন তখনো। বললেন, কোথাও যে যেতে হবে, বুঝলি কী করে?

মুখ কালো করে শিশির বললে, আমি জানি।

—ছাই জানিস্!—সেজোবাবু বললেন,—কোথায় যেতে হবে বলতো?

শিশির কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে বসে রইলো।

সেজোবাবু বললেন, —আচ্ছা, এখানে তোর টানটা কোথায়? কে আছে এখানে?

শিশির মুখ তুলে ওঁর দিকে একবার তাকালো, তারপরে আবার মুখ নিচু করলো। সেজোবাবু কথাটা বলেছিসেন গলায় একটু জোর দিয়ে। কথারম্ভ করেছিলেন যে কোমল স্বরে, ঠিক সেই স্বরটা ছিল না। ফলে শিশিরের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটবার, তাই ঘটলো। যে উদ্বেল অভিমানটা তার চোখ ছলছল করে তুলেছিল, বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠিয়েছিল, সেটা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে লাগলো। বালক বয়সে একজনের কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক খাওয়ার পর বুকের ভিতরটা ব্যথায় যখন চুরমার হয়ে যেতো, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসতো আর একজনের ডাক—শিশির—শিশির? দাঁড়াবার উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তার কাছে ছুটতে হতো, স্থির মনে শুনতে হতো তার কথা, নির্বিবাদে পালন করতে হতো তার আদেশ।

আজও ঠিক সেইরকম হলো। মনে মনেই নিজের চোখ মুছে ফেললো শিশির, মনে মনেই প্রস্তুত হলো পরবর্তী নির্দেশ মেনে চলবার।

সেজোবাবু কী জানি কেন, আর কোনো কথা বলছিলেন না। গাড়ি যখন

হরিশ মুখুজ্যে রোডে ঢুকে পড়েছে, তখন কথা বললেন, এখন বাড়িতে থাক, চানটান করে রেডি হয়ে নে, তারপরে বিল নিয়ে বসতে হবে।

শিশির মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। তার যাওয়া নিয়ে আর কোনো কথা হলো না। সেজোবাবুও যেন প্রসঙ্গটার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন। এ সম্পর্কে যে আরও কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন, সেটা তাঁর মনেই হলো না। ওদিকে, তাদের গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকলো, ছোটদিদিমণির কলেজের বাসও এসে থামলো। ছোট দিদিমণির কলেজ বসে সকালে, তাই এই সময়ই সে ফেরে। আজ হয়ত বা কোনো কারণে একটু সকাল সকালই হয়ে থাকবে।

গাড়ি থেকে সেজোবাবুই নেমে গেলেন প্রথম ওদিককার দরজা খুলে, সে নামলো পরে। নেমে, এগিয়ে যাবে, পিছন থেকে শুনতে পেলো সুষমার কণ্ঠস্বর—শিশির, শোনো?

থমকে দাঁড়ালো শিশির। কাঁকর বিছানো পথের ওপর পায়ের ধ্বনি তুলে সুষমা কাছে এলো, বললে,—বড়দাকে আজ কখন আনা হবে, জানো?

শিশির একটু অবাক হলো। বললে—না তো! আজ আসবেন নাকি বাড়িতে?

সুষমার চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হলো, একটু রূঢ়তার ভাব ফুটে উঠলো কণ্ঠে,—ওমা, তা-ও জানো না! বেশ আছো যা হোক তোমরা!

বলে পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে সিঁড়ির ওপর উঠে গেল সুষমা।

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে ডানদিকে ঘুরে অফিসঘরগুলোর দিকে গেল শিশির। বড়বাবুর চেয়ারটা খালি। তার পাশের টেবিলে মেজোবাবু বসে আছেন। তিনিই প্রকৃত অফিস-মাষ্টার বলা যায়। পা-টা খোঁড়া বলে কখনো বাইরের কাজে বেরোন না। সেজোবাবু নিজের ঘরে না ঢুকে ওঁর ঘরে ওঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েছেন। ওঁদের পাশ কাটিয়ে নিজেদের ঘরে এলো শিশির। পাশেই ঝড়ের বেগে টাইপ করছিলেন টাইপবাবু, শিশির নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে সেই দিকে তাকালো। যে জাহাজে কাজ হচ্ছিল, সেই জাহাজেরই ব্যাপার নিয়ে কী সব চিঠিপত্র টাইপ করা হচ্ছে। শিশির অত ইংরেজি বোঝে না এখনো, আন্দাজে-আন্দাজে বিষয়টা কী সেটা হয়ত বুঝতে পারে।

শিশির কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পর বলে উঠলো—আমাকে বাইরে কোথায় পাঠানো হচ্ছে, জানেন টাইপবাবু?

টাইপবাবুর হাত সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। একটু অবাক হয়েই তিনি বললেন, বাইরে! আপনাকে? সে কী!

শিশির বললে,—হ্যাঁ।

টাইপবাবু হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে কিছুটা আত্মগতভাবেই বলে উঠলেন, এঁদের তো কোথাও কোনো ব্র্যাঞ্চ অফিস নেই, তবে কি হালদার কোম্পানীর মতো বম্বেতে ব্র্যাঞ্চ খুলতে যাচ্ছেন নাকি?

শিশির অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, তা বলে আমাকে কেন?

টাইপবাবু হেসে বললেন, আপনি বিশ্বাসী লোক। মুন্সিজীর ভাষায়, সাচ্চা আদমি।

মুন্সিজীর কথায় শিশিরের হঠাৎ মনে হলো, লোকটাকে এ কয়দিন সে মোটে দেখেই নি। টাইপবাবু বললেন, এই তো এতক্ষণ বসে মেজোবাবুর সঙ্গে ফুসুর-ফাসুর করছিল। আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, সত্যি বলছি মশাই।

শিশির সে কথায় কান না দিয়ে বললে,—কিন্তু আমি অত দূরে—বিদেশবিভুঁই - কী আশ্চর্য বলুন তো?

কয়েকটি অসংলগ্ন কথা। টাইপবাবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেঁচে যাবেন মশাই! কাজ করবেন, খাবেন-দাবেন, নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবেন। আর এখানে? অফিসের কাজ শেষ হলো তো, বাড়ির কাজ শুরু হলো। সবই তো দেখি পোড়া চোখ দিয়ে।

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে সজোরে নস্যি নিলেন, রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, তারপরে আবার বললেন, এখনো সেই শিশির, শিশির! ডাক্তারখানায় যাও, ঐ শিশির! অমুক বাড়িতে গিয়ে অমুকের হাতে এই টাকাটা দিয়ে এসো, ঐ শিশির! বাবুদের আত্মীয়স্বজনও তো কম ছড়ানো নেই চারদিকে! ছোটখাটো দানধ্যানও তো কম নেই! তবে হ্যাঁ, আপনার কাজের দায়িত্ব বেড়ে গেছে বটে! তার ওপরে মুন্সিজী যেরকম সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছে, তাতে আরও দায়িত্ব আসবে। আসুক ক্ষতি নেই, কিন্তু খেটে খেটে মরবেন যে! বম্বেতে অফিস হলে মেজোবাবুই সেখানে যাবেন হয়ত। হয়ত বা ম্যানেজারও

রাখবে, কিন্তু কাজ আপনার বাইরে। আপনাকে দিয়ে তো কেউ আর ঘরের কাজ করিয়ে নেবে না!

ওরা কথা বলছে, এমনসময় কালী চাকরটা এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, ভিতরে ডাকছে শিশিরবাবুকে। কে? না, ছোট দিদিমণি।

টাইপবাবু বলে উঠলেন, নিন, হলো তো? বলতে না বলতেই শমন এসে গেল। নিন, ছুটুন আবার সিনেমার টিকিট আনতে। না-না, আমারই ভুল হলো। উনি আবার ও লাইনে নেই, ওসব হচ্ছে বৌরাণীদের কাণ্ড, জাহাজ থাকলে প্রায় রোজই সিনেমা দেখবে দলবেঁধে। জাহাজ নেই তো সিনেমা নেই। তখন গোঁসাঘরের কৈকেয়ীর মতো মোজাইক করা ঠাণ্ডা মেঝের ওপর গড়াচ্ছেন, আর মন্থরার দল চুলে বিলি কাটতে কাটতে কানের মধ্যে নানান ফন্দি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বলি, দেখছি তো সবই এই পোড়া চোখ দিয়ে। এ-বাড়িতে বরং ঐ ছোট মেয়েটাই একটু অন্যরকম, গানটান আর বইপত্তর নিয়ে আছে। দেখুন গিয়ে, হয়ত নতুন বেরিয়েছে এমন কোনো বই কেনবার ফরমাস হবে।

শিশির টাইপবাবুর সব কথা হয়ত ভালো করে শোনেইনি। ছোট দিদিমণি ডাকছে শুনে হঠাৎ তার মনটা কেমন যেন বিরূপ হয়ে উঠলো। অবশ্য বিরূপ হলেই সেটা চাকর-বাকরদের পক্ষে প্রকাশ করতে নেই। সে মাথা নিচু করেই চললো আদেশ পালন করতে।

ঘরেই ছিল সুষমা, তার চেয়ারটিতে বসে বসে বিনুনি খুলছিল। শিশির গিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই মুখ ফেরালো,—ভিতরে এসো।

শিশির মুখভার করে বললে,—ওখান থেকেই বলুন না। পায়ে জুতো যে।

সুষমা ব্যঙ্গভরে বললে, না হয় জুতো পরেই আসুন।

প্যাণ্ট-সার্টের সঙ্গে মানিয়ে সু পরতে হয়েছে সেজোবাবুর নির্দেশে। শুধু সু নয়, মোজাও। ফিতে খুলে জুতো ছেড়ে অগত্যা ভিতরেই যেতে হলো শিশিরকে। গেল বটে, বসলো না। অন্য চেয়ারটার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সুষমা অবশ্য বসতে বললো না ওকে। একবার চট করে খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিচুগলায় প্রায় ফিসফিসিয়েই বললে, বড়দা আসবে তিনটের সময়। এলেই দেখা করবে। বলবে, সেজদা আমাকে বাইরে পাঠাচ্ছে, আমি যাবো না।

—কিন্তু কোথায় পাঠাচ্ছে সেটা তো এখনো জানতে পারলাম না।

—সেটা কি ছাই আমিই জানি!—সুষমা বললে,—যেখানেই হোক, তোমার যাবার দরকার নেই।

টাইপবাবুর কথাগুলো হঠাৎ শিশিরের মনের মধ্যে ঘুর্ণির মতো জেগে উঠলো। তারই প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত শিশির ফট করে বলে বসলো, আমি ভেবে দেখলাম, আমার যাওয়াই ভালো।

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো সুষমা, বললে, কেন?

—সেখানে ভালো থাকবো।

—কেন, এখানে কি খারাপ আছো নাকি?

শিশির বোধহয় একটু অপ্রতিভ হলো, বললে, না, তা নয়। তবে নতুন একটা দেশ দেখবো, এই আর কী।

কথাটায় যেন জ্বলে উঠলো সুষমা, দাত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো এক মুহূর্ত। যেন ক্রোধের জ্বালাটা একটু সামলে নিলো। তারপরে বললে, -কোন্ দেশ, সেটা জেনেছো?

শিশির বললে,—তা ঠিক জানি নি, তবে কানাঘুষোয় শুনেছি, বম্বে।

—বম্বে!

সঙ্গে সঙ্গে মুখের বর্ণ যেন বদলে গেল সুষমার। মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো প্রথমে, তার পরে ধীরে ধীরে অদ্ভুত ফ্যাকাশে হয়ে আসতে লাগলো। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠেই সে বললে, কেন! বম্বে কেন?

শিশির বললে,—শুনছি নাকি বম্বেতে অফিস খুলতে যাচ্ছেন সেজোবাবু। হালদার কোম্পানীর মতো।

—হালদার কোম্পানী!—অস্ফুটস্বরে কথাটা উচ্চারণ করতে না করতেই সুষমার মুখখানা আবার আরক্তিম হয়ে উঠলো। মুখখানা অন্যদিকে ফেরালো সে। শিশির একটু অবাক হয়েই ওর ভাব লক্ষ করছে মনে হওয়ায় অতি মৃদু আর শান্ত গলায় সুষমা বললে, কোন্ হালদার কোম্পানী?

শিশির বললে, কেন, বি-কে হালদার এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। আমাদের বাবুদের মতোই জাহাজের ঠিকাদারী ব্যবসা করে, নাম শোনেন নি আপনি?

সুষমা মুখখানা আরও নিচু করেছে। লজ্জায় নতুন বউরা যেমন করে ঠিক

তেমনি। হালদার কোম্পানীর নামে এঁর আবার এতো লজ্জা কিসের, তা বুঝে উঠতে পারলো না শিশির।

সুষমা তার আধখোলা বেণীটা সামনে এনেছিল; সেটা ধরে চুলের প্রান্তে হাত বুলোতে বুলোতে ধীরে ধীরে বললে, ওদের তুমি চেনো? দেখেছো কাউকে?

শিশির বললে, হ্যাঁ, তা দেখেছি বই কি! খোদ কর্তাকেই দেখেছি। ছাই রঙের ঝকঝকে স্যুট পরা মাথাজোড়া চকচকে টাক, অ্যামবাসাডার গাড়ি করে জাহাজে আসেন।

সুষমা হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। সেই হাসি গোপন করতে করতে বললে, উনি তো বুড়োমানুষ, ওঁর ছেলেদের কাউকে দেখেছো?

শিশির আবার কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপরে বললে,—হ্যাঁ, একবার দেখেছিলাম। ওঁর বড়ো ছেলেই হবেন বোধহয় তিনি। দিব্যি চেহারা। আর কী ফর্সা! যেন সাহেব একেবারে! একটু ঢ্যাঙা আর রোগা রোগা দেখতে।

সুষমা মুখ নিচু করে আবার হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। বললে,—আর কাউকে? দেখো নি কখনো?

শিশির আবার ভাবতে লাগলো। ভেবে বললে, হ্যাঁ, ওঁদের ছোট ছেলেকেও দেখেছি। তা প্রায় বছর খানেক আগে। একই জাহাজে কাজ ছিল। ওঁরা চিপিং পেন্টিং পেয়েছিলেন, আমরা ডুবাস।

—বছর খানেক আগে?—সুষমা নত মুখখানা একটু তুললো, বললে, তার পরে আর দেখো নি?

শিশির বললে,—না। তবে তাঁর কথা মনে আছে। আমাকে ডেকে কতো মাইনে-টাইনে পাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সুষমা মুখ ফিরিয়ে এবার ওর দিকে সোজাসুজি তাকালো। প্রশ্ন করলো, তুমি কী বললে?

শিশির উত্তর দিলো, সেজোবাবু যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই বললাম। বললাম, মাইনে আবার কী! আমি তো ওঁদেরই লোক।

—উনি শুনে কী বললেন?

—কিছু বললেন না, একটু হেসে অন্য দিকে চলে গেলেন।

সুষমা অল্প একটু হেসে বলে উঠলো, চালাক লোক। তোমাকে ভাঙিয়ে নিজের কোম্পানীতে নিতে চেয়েছিলেন আর কী!

শিশির বললে,—বাঃ! আমি তা যাবো কেন?

সুষমা সোজা হয়ে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো,—সেই তো কথা। যাবো কেন?

শিশির এসব তেমন লক্ষ করলো না। সে নিজের আবেগে বলে চলেছে,—ভাঙানো অত সহজ নয়। জানেন, উনি কিন্তু ওঁর দাদার মতো অত ফর্সা নন, বরং একটু কালোই।

সুষমার চোখদুটো কৌতুকে নেচে উঠলো,—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। অত ঢ্যাঙাও নন, তবে ওঁর দাদার মতোই রোগা।

আবার হেসে ফেললো সুষমা, বললে, থাক। কে অত ব্যাখ্যা শুনতে চাইছে তোমার কাছে? তুমি তো ফরসা আছো বাপু? পরের খেয়ে গতরটি তো দিব্যি বাগিয়ে নিয়েছো, ব্যস, তাহলেই হলো।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো শিশির। অনাবশ্যক কেমন করে সে এই রূঢ় কথাটা বলে উঠতে পারলো, সেটা ভেবে অবাকও হলো। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে, কোনো কথাই বলতে পারলো না।

সুষমাই একসময় কথা বললো, মুখ ফেরালো ওর দিকে। একটুক্ষণ যেন ওকে নিরীক্ষণ করলো, তারপরে বললে, কী, রাগ হলো নাকি?

একথায় শিশির যেন আরও বিচলিত বোধ করলো। মুখ ফিরিয়ে কোনক্রমে বলে উঠলো,—না।

আর তারপরেই পিছন ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

—যাচ্ছো কোথায়? শোনো।

আবার দাঁড়াতে হলো। ওর পিছন থেকেই সুষমা বললে, বম্বে তাহলে তুমি যাবেই?

—হ্যাঁ।

—কবে যাবে?

শিশির আন্দাজে বললে, আজকালের মধ্যেই।

—দেখা করো।

শিশির ফিরে দাঁড়ালো। কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। সবিস্ময়ে বলে উঠলো, কার সঙ্গে?

সুষমার চেয়ার ছিল দেওয়ালের দিকে মুখ করা। পাশের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেই সে এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিল, আর প্রয়োজন মতো মুখখানা বাঁদিকে, অর্থাৎ শিশিরের দিকে ফেরাচ্ছিল। এবার উঠে, চেয়ারটাই সে ঘুরিয়ে দিলো বাঁদিকে। বসে পড়ে বললে, কার কথা বলছিলে এতক্ষণ?

—কার কথা!

সুষমা বললে, হালদারদের ছোট ছেলে, না কি যেন—

—উনিও তো বি-কে-হালদার।

সুষমা বললে, তা হবে। শুনেছি, বম্বেতে আছেন।

শিশির ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে। তারপরে একসময় স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে উঠলো, তাহলে আমার বম্বে যাওয়াই স্থির?

সুষমা চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো, বললে,—ওমা, কথাটাতো তুমিই বললে। যদি যাও তো, ওঁর সঙ্গে দেখা কোরো। এইটেই বলছিলাম আর কী!

এতক্ষণের সব কথাবার্তা মিলিয়ে ও যেন ধাঁধাঁয় পড়ে গেছে। সুষমা ওকে ডাকলো কেন, আর ঠিক কী যে বলতে চায়, সে সব যথাযথ না বুঝতে পেরে ওর মাথাটা যেন আরও গুলিয়ে গেল। সে এলোমেলো অবস্থায় হঠাৎ যা বলে বসলো, আমরা বোধহয় তাকেই বলি, বেফাঁস কথা। বললে, আমি চলে যাই, এটাই কি আপনি চান?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো সুষমা। সে মুখের ভাবে অপার বিস্ময়ও আছে, আবার অবিশ্বাস্য ভীতিও আছে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আমার চাওয়া না চাওয়ায় কী এসে যায়?

শিশির অর্ধ-উন্মাদের মতো বলতে লাগলো, অনেক কিছু যায়! কী আশ্চর্য, ছোট থেকে এ বাড়িতে আছি, কারুর কি কোনো মায়াও নেই আমার ওপর! হুট করে কেউ বলবেন চলে যাও, আর আমি চলে যাবো! আপনিই বলুন? আপনি যদি বলেন. না যেয়ো না, তাহলে আমি কিছুতেই যাবো না, কেউ আমাকে নড়াতে পারবে না এখান থেকে!

উত্তেজনার বশে শিশিরের কণ্ঠস্বর বোধহয় একটু উচ্চেই উঠেছিল। দরজার বাইরে, বারান্দায়, দু-একজনের উৎসুক মুখ দেখা গেল। সুষমার বউদিদের কেউ নয়, ভাইপো-ভাইঝিরাও নয়, নেহাতই আশ্রিত পরিজনের মুখ। তারা চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে দেখে গেল মাত্র, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে, এমন

সাহস কারও নেই। সুষমা চেয়ার ছেড়ে উঠলো, এক পা এগিয়ে ওর কাছাকাছি এলো, বললে, একটু ঠাণ্ডা হও দেখি, ঠাণ্ডা মনে কথাটা বিচার করো।

শিশির মুখ ফেরালো. নত করলো মুখ. নিজেকে বোধ হয় সামলাতে লাগলো। আর আশ্চর্য, তার চওড়া আর কর্কশ হাতটার ওপর এসে পড়লো নরম তুলতুলে ছোট্ট একটি হাত, যা একটু চাপে মুড়মুড় করে ভেঙে দেওয়া যায়।

সুষমা বললে, প্রথমেই তোমাকে বলেছি। বড়দা এলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বলবে। সেজদা যেরকম গোঁ ধরেছে, তাতে তাকে কিছুতেই টলানো যাবে না। আর মেজদা? সেজদার ব্যাপারে একবাক্যে সায় দেবে। কিন্তু তুমি ঠিক শুনেছো? সত্যিই তুমি বম্বে যাচ্ছো?

মুখ তুললো শিশির। বললে,—হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম।

কথা বললো বটে, গলার স্বর কিন্তু শুকিয়ে গেছে। কথাটা স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না, যেন একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ হলো শুধু।

সুষমা তার হাতটা সরিয়ে নিলো। বললে, আর কে যাচ্ছে শুনলে?

—সেজোবাবু।

সুষমার মুখখানা এইবার বিনির্মল হাসিতে ভরে গেল। সে বললে, দূর! তোমাকে কেউ ধাপ্পা দিয়েছে। সেজদা যাচ্ছে, আর আমি তা জানতে পারলাম না এখনো! তিনদিন আগে থাকতে সাজো সাজো রব পড়ে যেতো, বাক্স-প্যাটরা গুছোবার জন্য আমারই ডাক পড়তো। বউদিরা শুয়ে বসে ঘুমুতে কিম্বা পত্রিকা পড়তে আর সিনেমা দেখতে পারে, আর কিছু পারে না। বিশেষ করে সেজো বউদি যে রকম অলস প্রকৃতির!

শিশির বললে, বলছেন কী! নতুন অফিস খুলবে, সেখানে একা গিয়ে আমি কী করবো! তাহলে মেজোবাবু যাবেন হয়ত।

—দূর বোকা! সুষমা গিন্নিবান্নির সুরে বলে উঠলো—খোঁড়া মানুষ, যে কোথাও বেরুতে চায় না, সে যাবে বম্বে! তাহলেই হয়েছে।

—তবে?

সুষমা বললে, বড়দার কথা তো আসেই না। তাহলে আগাগোড়া ব্যাপারটাই বোধ হয় বাজে। আমি আড়াল থেকে যেটুকু শুনেছিলাম, তা-ও বোধ হয় ভুল। ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে হয়ত কোথাও যাচ্ছো না তুমি।

শিশির বললে, সেজোবাবু আমাকে নিয়ে আবদুলের দোকানে গিয়েছিলেন। কয়েকটা স্যুটের অর্ডার দিয়ে এসেছেন আমার জন্য। পরশু বিকেলেই সেগুলি চাই। তাছাড়া, সেজোবাবু নিজেই আমাকে বললেন, যেতে হবে।

—বম্বের কথা হয়েছে কী?

—না, তা হয় নি।

সুষমা বললে, সোজা গিয়ে সেজদাকে জিজ্ঞেস করতে পারো না?

শিশির বললে, হঁ্যা, জিজ্ঞেস করলেই উনি বলবেন কিনা!

সুষমা শিশিরের এই ভয় ভয় করা মনটাকে বোঝে। তাই অল্প একটু হেসে বললে, ঠিক আছে। বড়দা এলেই বলবে। আর পোষাকগুলো? এখানেই পরবে। একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব!

শিশিরের ফরসা মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। বললে, যাঃ! কী যে বলেন!

বলেই আর দাঁড়ালো না, চলে গেল ওপরে তার নিজের ঘরে, ধড়াচুড়ো ছাড়তে।

তারপরে যতক্ষণ না তিনটে বাজলো, বড়বাবুকে যতক্ষণ না বাড়িতে আনা হলো, ততক্ষণ অফিসে কাজই করুক আর যাই করুক, শিশিরের মনে সুষমার কথাগুলোই ঘুরে ফিরে আনাগোনা করছিল। হালদার কোম্পানী, বম্বে, বি-কে হালদার, তুমি যেয়ো না, গেলে বম্বেতে ওঁর সঙ্গে দেখা করো, সব মিলিয়ে ওকে বলতে চান কী? হালদার কোম্পানীর ছোটছেলের নামও বি-কে হালদার, পুরোনামটাও সে জানে, বসন্তকুমার। দিদিমণি কি জানেন? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল তাঁর হাতখানির কথা। কী নরম তুলতুলে হাত! মানুষের হাত এত নরম আবার হয় নাকি? শিশিরের পকেটে ছোট একটা নোট্‌বই থাকে সর্বক্ষণ। তাতে জাহাজে কী কী কাজ হলো, না হলো, তার ফিরিস্তি থাকে। সেই ফিরিস্তি দেখে তার সঙ্গে জাহাজের ছাপানো অর্ডারগুলো মিলিয়ে নিয়ে 'বিল'-এর খসড়া করতে হয়। যে রেট দেওয়া আছে জাহাজে, সেই রেটের কপি দেখে আইটেম-বাই-আইটেম রেট্ বসিয়ে যেতে হয়, টোটাল দিতে হয়। অজস্রবার করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে শিশিরের। গৎও মুখস্থ, এইসব ইংরেজির, কমা-সেমিকোলনও তার ভুল হবে না। সাধারণ কাগজে এই সব খসড়া করতে করতে বারবার উন্মনা হয়ে যাচ্ছিল শিশির, তার

নিজের হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরছিল মাঝে মাঝে! রীতিমত চওড়া, কর্কশ হাত। জাহাজের মজুরদের মতো। কতদিন অসহিষ্ণু হবে নিজেই হাতুড়ি চালিয়েছে শিশির জাহাজের জং-ধরা লোহার গায়ে। তার কবজির জোর দেখে জোয়ান জোয়ান মজুররা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে, তারিফ করেছে। ক্যাশবাবু তার আসন থেকে দূরে বসেন। তার ঠিক পাশে আছেন টাইপবাবু। ঝড়ের বেগে টাইপ করার কাজটা একসময় মুহূর্তের জন্য ঝপ করে থামিয়ে দিয়ে টাইপবাবু বলে উঠলেন, আপনি যখন ছিলেন না, তখন মেজো আর সেজোবাবুতে তুমুল হয়ে গেছে।

শিশির চমকে উঠলো, বললে, মানে!

মেজোবাবু-সেজোবাবুতে মতান্তর সত্যিই অকল্পনীয়। কখনই দেখা যায় নি, এঁদের দুই ভাই কখনো কোনো বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

টাইপবাবু মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন—ঘটনাটা আপনাকে নিয়েই।

বলা বাহুল্য, আরও উৎসুক হলো শিশির, আরও উদগ্রীব। টাইপবাবু বললেন, মেজবাবু হঠাৎ রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠলেন। একটা ঝিয়ের ছেলেকে নিয়ে এতো আদিখ্যেতার কোনো মানে হয় না! ও পারবে কেন এ কাজ? অন্য কাউকে পাঠাও। আমরা তো মশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে ও-ঘরের দরজার আড়ালে কান পেতেছি। সেজোবাবুরও রোখ চেপে গেছে। বললেন, আমি ওকেই পাঠাবো! দেখি, কে আমাকে ঠেকায়!

শিশির হাতের কাজ থামিয়ে গুম হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরে এক সময় বললে, আচ্ছা টাইপবাবু? বলতে পারেন, সত্যিই বম্বে পাঠাচ্ছে তো আমাকে?

টাইপবাবু আবার টাইপে হাত দিয়েছিলেন। সেটা থামিয়ে বললেন, মশাই, ঠিক বুঝছি না। বম্বেতে যাবেন অফিস খুলতে, তার একটা তোড়জোড় তো এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবার কথা! ফাইল-টাইল, চিঠিপত্র, সে তো এক এলাহী কাণ্ড হওয়া উচিত। তা, কিছুই তো হচ্ছে না। ক্যাশবাবুও কিছু জানলেন না, আমিও জানলুম না। এমন কি, পার্ট-টাইমের অ্যাকাউণ্টবাবু পর্যন্ত কিছু জানেন না। কে জানে, কী ব্যাপার! এতো ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ই বা কেন? আমরা কোম্পানীর পুরোনো লোক, আমরা ওদের না জানিটা কী?

এরপরে আর কোনো কথা হলো না। বড়বাবুকে আনতে যাওয়া হলো। গেলেন ঐ সেজোবাবুই। শিশির বাড়িতে ছিল, কিন্তু তাকে উনি ডাকলেন না। নিজে একাই গেলেন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে।

এলেন বড়বাবু। গাড়ির পিছন পিছন অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল। স্ট্রেচারে করে তাঁকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো। শিশির তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলো। মেয়েদের ভিড়। অবশ্য তাতে শিশিরের মতো মানুষের ভিতরে ঢোকা আটকাতো না, তবু, তার যেন আজ কেমন একটা সংকোচ হলো। গেল না। টেলিফোনে খবর পেয়ে অন্য দুই দিদিরাও এসে গেছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েরা। জামাই-বাবুরা এখন আসেননি, সন্ধ্যাবেলা যার যার অফিস ফেরত চলে আসবেন। বলতে গেলে সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বড়বাবুর ঘরে ঢুকতে পারলো শিশির। বড়োবউদি শুধু বসেছিলেন ওঁর কাছে, আর কেউ নেই। বেশ রোগা দেখাচ্ছে, বেশ ক্লান্ত, চোট-খাওয়া পাটা হাঁটু পর্যন্ত প্লাস্টার করা। ও ঢুকতেই মুখখানা একটু ওর দিকে ফেরালেন, ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কী রে?

প্রথমটায় শিশির কোনো কথাই বলতে পারলো না। কথাগুলো গলার কাছে এসেও যেন আটকে আটকে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। উনি ওর দ্বিধা আর সংকোচের ভাবটা বুঝলেন। বললেন, কী বলবি, বল না?

শিশির কোনক্রমে বললে, আমাকে—সেজোবাবু—কোথায় যেন—পাঠাচ্ছেন।

অল্প একটু হাসির আভা ঝিলিক দিয়ে উঠলো বড়বাবুর ঠোঁটের প্রান্তে। বললেন,—কোথায় পাঠাচ্ছে তুই জানিস না?

—না।

বড়বাবু হাসলেন বড়োবউদির মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপরে সেজোবাবুর নাম ধরে বললেন, ওর কাণ্ড!

বড়োবউদি বললেন, সত্যি বাপু, সেই থেকে শুনছি শিশির চলে যাচ্ছে—শিশির চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সেটা কেউ খুলে বলে না। কে একজন যেন বললে বম্বে যাচ্ছে। সত্যি নাকি?

বড়বাবু বললেন, না না, ও বম্বে যাবে কেন? ও যাবে অন্য জায়গায়।

তারপরেই শিশিরের দিকে তাকিয়ে—বেশিদিনের জন্য নয়। ঘুরেই আয় না। নতুন নতুন দেশ দেখবি। এ-ও তো সবার ভাগ্যে হয় না। শুধু একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকবি। তোর যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ, এই

মেজাজটাই রাখবি। কেউ বকাবকি করলেও মেজাজ কখনো গরম করবি না। আর সব সময় কাজে মন রাখবি। মন রাখলে কাজ শিখতে মানুষের দেরি হয় না। তা সে যে কাজই হোক। আমরা কোম্পানী থেকে তোকে পাঠাচ্ছি, যখন ফিরবি, তখন কেউ যেন না বলতে পারে, কী লোক পাঠিয়েছিলেন? কাজের না—কিচ্ছু না। কেমন? যা এখন, বরং এই দুই দিনে নিচে বসে টাইপ-করাটা একটু অভ্যেস করে নে।

শিশির অবাক হয়েই শুনছিল। শুনতে শুনতে সে যেন মরীয়া হয়েই হঠাৎ বলে উঠলো, কিন্তু কোথায় আমাকে পাঠাচ্ছেন, তা তো বললেন না!

বড়বাবু ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—জাহাজে।

—অ্যাঁ!

যেন একটা প্রকাণ্ড হিংস্র সরীসৃপ তাকে তাড়া করেছে, এমনিভাবে সে বড়বাবুর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছে, কোনো কোনো ঘরে আলো জ্বলছে, কোনো কোনো ঘরে জ্বলে নি। কোথায় যাবে, কী করবে বুঝতে না পেরে শিশির একটা আতঙ্কিত জন্তুর মতো এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। পরনে তার তখন ধুতি আর সার্ট। যে বেশে সে দোকান থেকে পান আনতে ছুটতো, সিগারেট আনতে ছুটতো, চকোলেট আনতে ছুটতো, একেবারে সেই বেশ। সেই হাফহাতা ছিটের সার্ট, কাপড়টা সেই মালকোঁচা দিয়ে পরা।

জাহাজে সে বাবুদের কাজ দেখতে যায়। ফলকার খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সে তরতর করে লোয়ার হোল্ডে নেমে আসে, ইঞ্জিনরুমে গিয়ে বয়লার মেরামতির সময় বয়লারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পর্যন্ত কাজ দেখে। কিন্তু সেই জাহাজে করে তাকে সমুদ্রে যেতে হবে? জাহাজে থাকতে হবে সব জাহাজী লস্করদের সঙ্গে?

ছোট থেকেই তো এ বাড়িতে সে আছে, সাঁতার পর্যন্ত শেখবার সুযোগ পায় নি। সেই লোক যে সমুদ্র কখনো চাক্ষুষ দেখেনি, সে সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ কল্পনা করেই মূর্ছা যায় আর কী!

স্রোতে ভাসতে ভাসতে মানুষ যেমন তৃণটুকু আঁকড়ে ধরতে চায়, ঠিক তেমনি ভাবে সে দ্রুতপায়ে যায় একটা ঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে আলো তখনো জ্বলে নি। জানালাগুলো খোলা, নীল পর্দার ফাঁকটুকু দিয়ে গাঢ় নীল আকাশের আভাস দেখা যায়। আর শোনা যায়, মৃদু একটা তানপুরার সুর। কণ্ঠস্বর তাতে তখনো যোগ দেয় নি।

ওদিকটায় তখন কোনো লোক নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত। বিশেষ করে এটা মেয়ে মহল। তারা তখন গা-ধোয়া চুল বাঁধার কাজে ব্যস্ত। অন্যরা সব কে কোথায় কে জানে! নির্জন ভিতরের বারান্দাটা পেরিয়ে প্রায় ছুটেই সে ঘরে ঢুকে গেল। অস্ফুট আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো, দিদিমণি!

তানপুরা থেমে গেল। নীল শাড়ি পরা আবছা আবছা দেখতে পাওয়া মূর্তিটি উঠে দাঁড়ালো, কী হয়েছে!

শিশির হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়-পাওয়া শিশুর মতো বলতে লাগলো, আমাকে জাহাজে পাঠাচ্ছে। আমি সাঁতার জানি না—সমুদ্র দেখিনি—জলে আমার বড়ো ভয়—আমি বড়ো গঙ্গায় পর্যন্ত ভয়ে কখনো চানটুকু করিনি—আপনি আমাকে বাঁচান—আপনি আমাকে—

আর কথা বলতে পারলো না শিশির। হঠাৎ সে অনুভব করলো, তুলতুলে নরম কবোষ্ণ একটা ফুলের মতো শরীর তাকে জড়িয়ে ধরেছে। যেন তাকে ঢেকে, আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বাইরের সমস্ত তীর থেকে বাঁচাবার জন্য।

তার বঞ্চিত, বুভুক্ষু অন্তরে যেন সংসারের সমস্ত মায়ামমতা, স্নেহ, প্রীতি একসঙ্গে এসে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। তার বুকের ওপর যেন একটা আগুনের টুকরো কয়েক মুহূর্ত খেলা করে বেড়ালো। উন্মাদের মতো ঠোঁট দুটো ঘষতে ঘষতে সেই নরম তুলতুলে শরীরটা এক সময় মাথা উঁচু করলো। দুটো বিদ্যুৎময় হাত তার ঘাড়টাকে বেষ্টন করে ধরে তাকে নিচু হতে বাধ্য করলো। কৃষ্ণকলি ফুলের কুঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেন তার দিকে এগিয়ে এলো, তার দুটি ঠোঁটের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই বৃক্ষচূড় থেকে ছিন্নলতার মতো এলিয়ে পড়লো সেই শরীর। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, হয়েছে তো? এবার পালাও। আর কখনো আমার সামনে এসো না।

প্রায় বিদ্যুৎ গতিতেই শিশির ছুটে এলো বিস্তৃত ছাদটায়। নিজের ঘর খুললো, ভিতর থেকে খিল এঁটে লুটিয়ে পড়লো তার বিছানার ওপর। তার সারা শরীরময় যেন অগ্নিগোলকরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! এ যেন তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুহাতে ঠেলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেওয়া। ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসতে লাগলো সারা শরীর। ঘর ছিল অন্ধকার, বারান্দা ছিল অন্ধকার, তবু কেউ না কেউ যদি দেখে ফেলে থাকে? সঙ্গে সঙ্গে তারবার্তার মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে কথাটা। বড়বাবু গর্জে উঠবেন, মেজো আর সেজোবাবু

বলবেন, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে! মুহূর্তে সে পথে গিয়ে দাঁড়াবে, চলমান জনসমুদ্রে দেখতে দেখতে বিলীন হয়ে যাবে।

সে রাত্রে শিশিরের বন্ধ ঘরের দরজা খুললো না। কেউ এলোও না তাকে ডাকতে। এক সময় তার পেটের মধ্যে দুরন্ত ক্ষুধার অনুভূতি জাগলো, তবু সে বাইরে এলো না। এ বাড়িতে কেউ কাউকে খেতে ডাকে না, অথচ, কল্পনা করতে লাগলো শিশির, কেউ একজন এলো, দরজায় টোকা দিলো। তার হাতে ভাতের থালা, মাছের ঝোলের বাটি।

অন্ধকার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট্ করতে লাগলো শিশির। মানুষের খিদেও যে এত তীব্র হতে পারে, শিশির যেন জীবনে এই প্রথম অনুভব করতে লাগলো। সাদা সাদা গরম ভাত, কলাইয়ের ডালের বাটি, এক টুকরো মাছের ঝোল, হয়ত সেটা কই মাছ, হয়ত রুই, সঙ্গে দু-এক খণ্ড পটল আর আলু।

এত খিদে সত্বেও শিশির কিন্তু উঠলো না। সাহস পেলো না। একটা অবিশ্বাস্য নিদারুণ ভীতি যেন তার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি তার ওপরে শ্বাপদের মতো বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে, এখুনি টুকরো টুকরো করে ফেলবে তীক্ষ্ণ নখে। তার যে দুটি শুষ্ক ঠোঁটের কোণে জীবনের কবোষ্ণ স্বাদ এখনো লেগে আছে, সেখানে নখ বসিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। পাপ! পাপ এসে তার শরীরে বাসা বেঁধেছে, তাকে সে কুরে কুরে খাবে।

পরদিন। যেমন সূর্য ওঠে, তেমনি উঠলো। যে ভাবে এ বাড়ির ঘুম ভাঙে, সে ভাবেই ভাঙলো। খুব ভোর ভোর শিশির উঠে চোরের মতো লঘু পায়ে নিচে নেমে গেল। এক দারোয়ান ছাড়া কেউ জাগেনি তখনো। গেটটা খুলে দরজায় জলের ছিটে দিচ্ছে রঘুনন্দন। শিশির পাশ কাটিয়ে বাইরে গেল। বুড়ো রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ, এ বাড়িতে আছেও অনেককাল। মুন্সিজী তাকে শিশির থেকে শিশিরবাবুতে তুললেও রঘুনন্দন শিশির বলেই ডাকে। অবাক হয়ে বললে, আরে এ শিশির, এত সকালে যাচ্ছো কোথা?

—দোকানে চা খেতে।

বাড়িতে চা হতে যার নাম নটা। সেজন্য অপেক্ষাকৃত আগে যারা ওঠে তারা চায়ের প্রথম পর্ব বাইরেই সেরে নেয়। সেজন্য এতে অবাক হলো না রঘুনন্দন, সে বিড়বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে অন্তদিকে চলে গেল।

দোকানটা কাছেই। শিশিরের আর খরচ কী? মাইনে বাবদ বাবুরা যা দিতো, তা তার জমেই যেতো বলা যায়। এই টুকিটাকি জলখাবার খাওয়া,

চুলকাটা, এক আধ প্যাকেট সিগারেট কেনা। অতএব, দোকানে বসে বেশ কিছু পরিমাণে টোষ্ট আর ডিম খেতে পয়সায় আটকালো না শিশিরের। সময় কাটাতে হবে তো? খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলো। প্রথম প্রথম যখন তার কাগজ-পড়ার অভ্যাস হতে লাগলো, তখন সে খেলার পৃষ্ঠাটা পড়তো শুধু। তারপরে বড়জোর সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলো। আজকাল সেখান থেকে প্রথম পৃষ্ঠায় এসে গেছে। পাকিস্তান, কেনেডি, ক্রুশ্চভ, কাস্ত্রো—এইসব খবরই প্রথম পাতাটা জুড়ে।

খুব যে মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল শিশির এমন নয়। মনটা তার যেন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা ভাগ খাচ্ছে-দাচ্ছে কাগজ পড়ছে, আর আরেকটা ভাগ নিশ্চল জাহাজটার বন্ধ দরজাগুলোর সামনে গিয়ে কান পাতছে। শোনা যায় কি কিছু? ওরা তাকে নিয়েই কানাকানি করছে হয়ত।—পাজি, মিটমিটে শয়তান—দূর করে দাও! এসব ছাড়া আর কী বলাবলি করতে পারে ওরা?

কাগজটা শিশির সরিয়ে রাখলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই অন্য লোক টেনে নিলো সেটা। চায়ের দোকানের যা নিয়ম। অলসভাবে লোকটির দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালো শিশির। 'এবার পালাও। আর কখনো আমার সামনে এসো না!'—একথা শোনবার জন্যই কি আপনার কাছে গিয়েছিলাম?—নিজের মনেই উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে লাগলো শিশির। তার পরে হঠাৎই এক সময় উঠে দাঁড়ালো। খাবারের বিল চুকিয়ে দিয়ে বাইরে ফুটপাথে এলো। চোখের সামনে দিয়ে হুস হুস করে কয়েকটা মোটর চলে গেল। শিশির ভাবলো, ঠিক এখন, এই একবস্ত্রে, সোজা বাস ধরে হাওড়া কি শেয়ালদা স্টেশনে চলে গেলে কেমন হয়? তার মানি ব্যাগটা তো সঙ্গেই আছে, পকেটে। তা হবে, শ -খানেক টাকা সবশুদ্ধ হবে। কতদূর যাওয়া যায় একশ' টাকায়? কাশী? বৃন্দাবন? ওসব জায়গায় যেতে কতো দামের টিকিট কিনতে হয়, তা-ও জানা নেই। গিয়ে পড়তে পারলে আর ভাবনা নেই। ঝাড়া হাত-পা একটা মানুষ, কিছু না কিছু কাজ জুটে যাবেই। না হয়, চাকরের কাজই করবে। মনে জোর এনে দ্রুত পায়ে চলা শুরু করে একটু মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে—এ শিশির—এ শিশির।

থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরতেই হন্তদন্ত হয়ে রঘুনন্দন এগিয়ে এলো, বললে,—তোকে হাঁকডাক করছে সেজোবাবু, আর তুই এখানে! আমি তো

তল্লাসি করে করে হয়রান। এ দোকান দেখি, সে দোকান দেখি, বেটা কোথা গেল চা খেতে?

শিশিরের বুকটা হঠাৎ ঢিপঢিপ করতে শুরু করলো। বললে, খুঁজছে কেন আমাকে?

—আরে বাপ!—রঘুনন্দন বললে, তোকে নিয়ে কোথাও বেরুবে। গাড়ি বার করেছে, কালী গিয়ে ড্রাইভারকে ডেকে এনেছে তার বস্তি থেকে। শীগ্‌গির চোল্।

তবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিশির। তাকে নিয়ে অসময়ে কোথায় যাবে সেজোবাবু?

—কী হলো?

শিশির বললে, খুব রেগে গেছে, না?

—কৌন?

—সেজোবাবু কিম্বা মেজোবাবু?

রঘুনন্দন বললে, মেজোবাবু এখনো বিছানায়। না, রাগবে কেনো? রাগবার মতো তো কুছু দেখলুম না সেজোবাবুর? নে বেটা, চোল্।

যেন সম্মোহিতের মতো রঘুনন্দনের পিছনে পিছনে চলতে লাগলো শিশির।

গাড়িটা সত্যিই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের ঘুম-ঘুম চোখ, অসময়ে বেরুতে হচ্ছে বলে মুখখানায় বিরক্তির ভাব। আর ভিতরে অফিস ঘরের বারান্দায় স্যুটপরা দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং সেজোবাবু। না, সত্যিই রাগ নয়। বরং শান্ত কোমল কণ্ঠেই বললেন,—ঠিক আধঘণ্টা সময় দিলাম দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে, চান করে পোষাক পরে একেবারে তৈরি হয়ে নাও। আধ ঘণ্টার জন্য আমি বেরুচ্ছি, ফিরে এসেই নিয়ে যাবো, কেমন?

বলে, আর দাঁড়ালেন না, গটগট করে চলে গেলেন গাড়ির দিকে। আর সিঁড়ি দিয়ে লঘু পায়ে সোজা ছাদ পর্যন্ত উঠতে উঠতে শিশিরের মনে হচ্ছিল, তবে কি কেউ টের পায়নি নাকি? এ বাড়ির যা কাণ্ডকারখানা, দূষণীয় কিছু ঘটলেই কয়েক সেকেণ্ডে তারবার্তার মতো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ছড়িয়ে গেলে সেজোবাবু কি টের পেতেন না? আর টের পেলে, ওঁর চেহারা হয়ে যেতো অন্য রকম। মেজোবাবুও শুয়ে থাকতেন না, খোঁড়া পায়ে ঠিক নেমে আসতেন নিচে।

ভাবতে ভাবতে মনটা হঠাৎ একটু হালকা হয়ে গেল শিশিরের। সে একটু

খুশি হয়েই তার দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো সেরে নিতে থাকে। আর আধঘণ্টা পার হতে না হতেই জামা, প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট পরে সে নিচে নেমে আসে। ঘড়িতে তখন কম নয়, নটা বেজে গেছে। অফিসঘর খুলে নতুন বেয়ারাটা সব ঝাড়পোঁছ করছে। লেবারদের ফোরম্যান ইশাক অফিসঘরগুলোর সামনেকার বারান্দায় বেঞ্চির ওপর চুপচাপ বসে আছে। সে কাছে গেল ইশাকের। বললে,—কী হে, কাজ শেষ ?

ইশাক বললে, কাজ তো শেষ, লেকিন একটা নতুন কাম বাতাচ্ছে। আমি তো লোক লাগিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। এখন বাবুদের সেটা বলি। নইলে পরে আবার খ্যাচ খ্যাচ করবে বাবুরা।

—কী কাম বলো তো ?

—ইঞ্জিন রুমে। কফার ডাম। বয়লারের পাশ দিয়ে পিছনের চার নম্বর ফলকার মাঝ বরাবর চলে গেছে। বুঝলেন না ?

কথাটা শিশিরও জানতো না। কারণ এ যাবৎ যত জাহাজে সে কাজ করেছে, 'কফার ডাম'-এর কাজ কখনো হয়েছে কিনা মনে করতে পারে না। সেজন্য এর রেটও সে জানে না। রেট অবশ্য বড়বাবুর ঘরের ড্রয়ারটার নিচের তলায় রয়েছে চৌদ্দ নম্বর ফাইলে। ঐটেই রেট-ফাইল। কিন্তু কী করতে হবে ওখানে ?

ইশাক বললে, চিপিং করে দুকোট লাল রঙ দিতে হবে। ট্যাঙ্কির মতন। কিন্তু এতে সিমেণ্ট দিতে হবে না। রঙ দিতে হবে। রেড লেড নয়, রেড অক্সাইড মালুম হচ্ছে। রঙের ড্রাম বার করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

শিশির বললে, আজ সারাদিনের মধ্যে কাজটা হবে ?

ইশাক বললে, তা হবে না। রাত ভর কাম করলেও কাল সকালে সেকেণ্ড কোট্ রঙ পড়বে, তার আগে নয়।

—তাতে আর ক্ষতি কী ? জাহাজ তো ছাড়ছে পরশু ?

—আপনি ক্ষেপেছেন ?—ইশাক বললে, পরশুরও পরদিন ছাড়বে। শালার পার্সার তো অঘোর-বিঘোর জ্বর নিয়ে হাসপাতালে শুয়ে। শুনলুম, সেজোবাবু তাকে দেখতেই সাত সকালে ছুটেছে হাসপাতালে।

পার্সারের অসুখের কথাটা শিশিরও জানতো। ইশাকের কথা শুনে তারও মনে হলো, সত্যিই তো পার্সার একটু না সেরে উঠলে জাহাজ ছাড়বেই বা কী করে ?

শিশির নিশ্চিন্ত বোধ করে ইশাকের পাশেই বসে পড়লো। ইশাক বললে, খাবেন সিগারেট? ভালো চীজ আছে, পলমল।

শিশির বললে,—না, বাবুরা এসে পড়বে কেউ না কেউ। বেশি থাকলে প্যাকেট একটা দিতে পারো।

ইশাক ওর দিকে আস্ত একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলে। এ সবই জাহাজ থেকে পাওয়া। দামের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইশাক সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, শালার জাহাজটা নানান জাত-বেজাতের লোকে ভরা। ক্যাপ্টেন গ্রীক, স্টুয়ার্ড ইটালিয়ান, একেবারে খাটি ট্র্যাম্প জাহাজ যাকে বলে। কিন্তু স্যার—বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলো ইশাক— শালার ক্যাপিতানির যা একখানা বউ আছে না জাহাজে! ঈস্! শালার জান লড়িয়ে দেওয়া যায়!

শিশির অবাক হয়ে বললে, বউ! কই, আমি তো দেখি নি!

—দেখবেন কী করে?—ইশাক বললে, সবসময়ই তো ক্যাপিতানি তার বউকে ভিতরের ঘরে আটকে রাখে! আমি হঠাৎ এক ঝলক দেখে নিয়েছি।

শিশির বললে,—আচ্ছা ইশাক, ক্যাপ্টেন থাকতে পারে বউ নিয়ে জাহাজে?

ইশাক বললে,- এসব ট্র্যাম্প জাহাজে পারে তো দেখি। বিশেষ করে গ্রীকরা। জাহাজে তো গ্রীক নিশান উড়ছে, দেখেন নি?

—তা দেখেছি।

ইশাক বললে, বউটার চুল বড়ো বড়ো জানেন? মেমদের মতো ছোট করে ছাটা নয়। চুলের রঙও কালো, লালচে নয়। চোখের তারা দুটো পর্যন্ত কালো, লালচে নয়। গায়ের রঙে একটু হলদে হলদে ভাব। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গায় হলদে রঙের গাউন পরেছে, বুঝলেন? মাইরি! চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে! এরকম মেয়েছেলে আপনি জিন্দেগীতে কখনো দেখেন নি।

শিশির উৎসুক হয়ে শুনছিল। তাকে জাহাজে যেতে হবে। তবে কি এই জাহাজেই? বোধ হয় না। কোনো ইণ্ডিয়ান জাহাজ হবে। বাইরে স্যুট, আর ভিতরে ডিউটির সময় ইঞ্জিন রুমে ঢুকে বয়লারে কয়লা ঢালো। তার মজবুত শরীর, আর চওড়া শক্ত হাত দেখেই বাবুরা বোধহয় তাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, বড়বাবু তাকে একটু টাইপ শিখতে বললেন

কেন? টাইপের কী কাজ? সে তো আর জাহাজে গিয়ে পার্সার হচ্ছে না। পার্সার তো অফিসার। কেবিনে থাকে, ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে হয়, টাকার হিসেব-কিতেব করতে হয়, জাহাজ বন্দরে এলে এজেন্টদের ঘরে কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে হয়। কাষ্টমস্‌দের সঙ্গে লেনদেন করতে হয়। রীতিমত শিক্ষিত লোকের কাজ। তাকে দিয়ে ওসব হবে কেন?

ঠিক এই রকম সময় সেজোবাবুর গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়ালো। ইশাক তড়াক করে উঠে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে গাড়ির কাছে গিয়ে সেলাম করলো। সেজোবাবু নেমে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কাজকর্মের কথাই বললেন। তারপরে ইশাক চলে যেতেই ভিতরে এলেন তিনি। দেখতে পেলেন শিশিরকে, থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—একটু দেরি হয়ে গেল। তুই তৈরি তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আয়।

বলে তখখুনি ওকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সোজা গাড়ি চললো ডালহৌসি স্কোয়ার (এখনকার বি-বা-দী বাগ) এজেন্টদের অফিস। জাহাজ বন্দরে থাকলে সাহেবরা খুব সকাল-সকালই অফিসে আসে। সেখানে খোদ বড়সাহেবের কাছে তাকে নিয়ে গেলেন সেজোবাবু। কথাবার্তা যা বলবার সাহেব সেজোবাবুর সঙ্গেই বললেন। শুধু তাঁর চোখ দেখে মনে হলো, শিশিরকে তাঁর মোটামুটি অপছন্দ হয় নি।

বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এবার আরেকজন অফিসারের ঘরে। এই অফিসারটি বাঙালী, কাজকর্মের ব্যাপারে এঁরই কাছে আসতে হতো শিশিরকে, সেজন্য শিশিরকে তিনি আগে থাকতেই চিনতেন। বাবুদের সঙ্গে এ ভদ্রলোকের খুবই হৃদ্যতা ছিল। সেজোবাবুকে খুব খাতির করেই কাছে বসালেন। বললেন, শেষ পর্যন্ত একেই পাঠাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, কী হে, পারবে তো?

শিশিরের উত্তর দেবার আগেই সেজোবাবু বলে উঠলেন, খুব পারবে। তাছাড়া একটা তো মোটে ট্রিপ, তারপরেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

ভদ্রলোক একজনকে ডেকে কীসব কাগজপত্র, ফর্মটর্ম আনালেন। ওঁর

টেবিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে নানান ফর্ম ফিল-আপ করতে হলো, নানান জায়গায় সই করতে হলো। জাহাজের কাজ দেখতে পোর্টের মধ্যে যেতে টেতে হয় বলে শিশিরের নামে একটি পারমিট বা পাস ছিল। সেই 'পাস'এ শিশিরের ছোট একটা ফটোও সংলগ্ন করা ছিল। যখন ঐ ফটো তোলা হয়, তখন তার কয়েকটা কপি রাখা ছিল অফিসে। সবারই রাখা হয়। বড়বাবু, সেজোবাবু প্রভৃতি সবারই আছে। সেজোবাবু মনে করে তারও তিনটে কপি সঙ্গে এনেছিলেন। ফটোব সেই কপি তিনটি ফর্মের যথানির্দিষ্ট স্থানে লাগিয়ে দেওয়া হলো। তাব ওপর সই-সাবুদ ইত্যাদি। ফর্মটর্ম সঙ্গে করে আবার তাকে নিয়ে সেজোবাবু চললেন পোর্ট-কমিশনার্স অফিসে, পোর্ট-পুলিশেব কাছে। যে সব কাজ দশদিনেও হয় না, সে সব কাজ দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্যায়ে যেতে হলো পোর্ট হেল্‌থ অফিসারের কাছে। এখানেও কাগজপত্রে সই-সাবুদ, ফর্ম ইত্যাদি নানান ঝামেলার ব্যাপার। তারপরে আছে শারীরিক উৎপীড়ন। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। একহাতে বসন্তের টিকে, অন্যহাতে টি-এ-বি-সি নিয়ে আড়ষ্ট হাতে আর গা ম্যাজম্যাজ করা শরীর নিয়ে শিশিব যখন বাড়ি ফিবলো, তখন বেলা দুটো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সেজোবাবুরও হয়রানি গেছে কম নয়। শিশির মাথা ধুয়ে কোনোরকমে দুটি খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যা হবো-হবোর মুখে আবদুলের লোক এলো নিচে। কালী চাকরটাব ডাকাডাকি। জরজর দেহ নিয়ে সে নিচে নেমে এলো। পোষাকের ট্রায়াল। তারপরে এককাপ চা মুখে দিয়ে আবার ওপরে উঠে যথারীতি শুয়ে পড়লো। রাত্রে হাতের যন্ত্রণা আর ধুম জ্বর। অনেক রাত্রে কে যে এসে তাকে এক গেলাস দুধ খাইয়ে গেল, তা সে মনেও করতে পারলো না। মেয়েছেলে, এটুকু মনে আছে। বাড়ির আশ্রিতদের কেউ, না, বউদিদের একজন? না কি সুষমা স্বয়ং?

ঘাম দিয়ে জ্বর সারলো সকালবেলা। নিচে নেমে এলো। রঘুনন্দন গেট খুলেছে। চায়ের দোকান। খবরের কাগজ। ক্রুশ্চভ-কেনেডি-কাস্ত্রো।

চা-টোস্টের পর ফিরে এলো। বেঞ্চিতে ইশাক। আপনাকে এতো পেরেশানি দেখাচ্ছে কেন? হাতব্যথা, জ্বর। কাজ শেষ হলো? জী, হাঁ। বাবুদের খবর দিতে এসেছি। পরশু ভোরে জাহাজ ছাড়ছে। কাপিতানি খুঁজছে বাবুদের। আজই আবার সে বউকে নিয়ে ঘুরতে বেরুবে। মার্কেটে আসবে। কেনাকাটা। টাকার দরকার। বুঝছেন না? এইসব টুকরো-

টাকরা কথাবার্তা। চেতনার পর্দায় যেন ভালো করে কিছুই দাগ কাটছে না। তাকে যে যেতে হবে, এটাও যেন আজ তার মনে কোনো ক্রিয়া করছে না।

—কীরকম ফুলেছে দেখেছো হাতটা ?

—ও কিছু না, আজই সেরে যাবে।

—আচ্ছা ইশাক, জাহাজের নামটা যেন কী ?

—কোন জাহাজ ?

–যে জাহাজে কাজ করলে।

—তাজ্জব ! জাহাজে এতবার গেলেন এলেন, নামটা মনে পড়ছে না ?

মুহূর্তকাল চিন্তা করলো শিশির। কী আশ্চর্য, নামটা মনে করতে পারছে না কেন ? নামটা একটু অন্য রকম। তা-ও সামনে, দুই পাশে গ্রীক ভাষায় লেখা, পিছনেই শুধু ইংরেজিতে দেওয়া আছে নাম। কী যেন ? ইশাক বললে, Antelope.

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। Antelope মানে কী হে ?

—কেয়া মালুম। অতই যদি জানবো তো আপনার মতো পড়িলিখি আদমি হতুম। সাচমুচ জানেন না মানে ?

শিশির বললে, কোথা থেকে জানবো ? আমি কি পড়িলিখি আদমি ? তুমি তো পুরোনো লোক, চোখের সামনেই তো আমাকে বড়ো হতে দেখেছো। আমি বাবুদের জাতও নই, এ বাড়িতে আমার মা ঝিয়ের কাজ করতো। তোমার মনে নেই ?

ইশাক একটু অবাক হয়েই শিশিরের দিকে তাকালো। এর দেখছি সাচমুচ তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে, নইলে এসব কথা কেউ মুখ ফুটে বলে জাহির করে ?

—ইয়া আল্লা !—বলে থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে ইশাক কী একটি ছুতো করে বাইরে চলে গেল। শিশির বেঞ্চিতে একা। কে যেন কোথায় মাইকে গান চালাচ্ছে। সামনের বাড়িতে, বারান্দায়, টকটকে লাল একটা শাড়ি শুকুতে দিয়ে গেল। রাস্তার কোনো অংশে, কাছেই, কাকেরা দলবেঁধে 'কা-কা' করছে। কোনো একটা কাক পড়ে গেছে, ডানা ভেঙে গেছে, উড়তে পারছে না, ছেলের দল তাড়না করছে, তাই বোধহয় ওদের এই সমবেত 'কা-কা' কলরব।

শিশির উঠলো, তার টেবিলে গিয়ে একটু বসলো। হঠাৎ বড়ো মায়া হতে

লাগলো টেবিলটার ওপর। একবার হাত বুলালো। কিন্তু না, মায়া করলে চলবে না। তাকে যেতে হবে, তার পক্ষে যাওয়াই ভালো। আর তাছাড়া, সেজোবাবুরা তাকে যতই মূল্যবান পোষাকে সাজাক, আসলে সে নিচু জাতের, মূর্খ, ঝিয়ের ছেলে। তার পক্ষে জাহাজের ইঞ্জিনরুমে নেমে বয়লারে কয়লা ঢালার কাজই সাজে। তাই সে করবে। 'তুমি কি এক্সারসাইজ করো? খেয়ে-দেয়ে গতরটা তো খুব বাগিয়েছো!'—আবার কানের কাছে একজনের কণ্ঠস্বর ভ্রমরের মতো গুঞ্জন তুলে ফিরছে। শিশির নিজের মনেই বলে উঠলো, বেশ তো! আমি এই গতর দিয়েই আমার পেট চালাবো। আমার তো এতে লজ্জা নেই! ঠিক এই সময় আবার রব উঠলো, শিশির—শিশির?

সেজোবাবুর ডাক। উঠে কাছে গেল। সেজোবাবু স্লিপিং গাউন পরে নিচে নেমেছেন, হাতে চায়ের কাপ। এতো সকালে ওঁকে চা করে দিলো কে?

ওকে দেখে নিজেই এগিয়ে এলেন। বললেন, কেমন আছিস?

—ভালো।

—কিছু খেয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—ইশাক এসে খবর দিয়েছে। তুই জামাটামা পরে রেডি হ। গাড়ি নিয়ে জাহাজে চলে যা। ক্যাপ্টেন আসবে।

—কোথায়?

সেজোবাবু বললেন,—কোথায় আবার? এই বাড়িতে। এখান থেকে মার্কেটিং-এ যাবে।

শিশির আর কিছু বললে না। সেজোবাবু বললেন, আধঘণ্টার বেশি সময় নিয়ো না যেন।

এটা সেজোবাবুর বলার কায়দা। সবসময় তিনি 'আধ ঘণ্টা' মাত্র সময় দেন। শিশির ওঁর কথার উত্তরে মাথা হেলিয়ে ওপরে চলে গেল। যেতে যেতেই দেখলো, উনুনে আঁচ পড়ে গেছে, সারা বাড়িটা অসময়ে ঘুম থেকে জেগেছে, মেজোবাবুর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। চাকর-বাকররা ঘোরাঘুরি করছে। মেয়েরা সাবান, তোয়ালে, শাড়িটাড়ি নিয়ে বাথরুমগুলোতে ঢোকবার উদ্যোগ করছে। কালী চাকর এক গোছা চাবি নিয়ে তার পাশ দিয়েই ঝনাৎ ঝনাৎ করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হচ্ছিল। শিশির তাকে থামিয়ে দিলো,—কোথায় যাচ্ছিস রে?

কালী বললে, নিচে যাচ্ছি ঠাণ্ডাঘর খুলতে।

এ বাড়িতে, অফিস ঘরগুলোর প্রান্তে বেশ বড়ো একখানা সাজানো-গোছানো ঘর আছে, যেটা এয়ারকণ্ডিশনড করা। বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগত এলে ঐ ঘরেই তাদের অভ্যর্থনা করা হয়। দামী সোফাকাউচ সাজানো, কাশ্মীরী কার্পেট বিছানো, দেয়াল-আলমারি আছে তুটি স্বদৃশ্য ঘষাকাঁচের পাল্লা দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরে কী আছে, পাল্লা খুললেই সারি সারি বোতল, কাঁচের পাত্র, কাঁটা চামচ, কাপ-ডিস ইত্যাদি। বাড়ির সবাই সংক্ষেপে একেই বলে, ঠাণ্ডাঘর।

শিশির ওপরে গেল। ওপরে ছাদের কোণে রাখা পাশাপাশি তুটো অতিকায় ট্যাঙ্ক আছে, তার একটাতে কল লাগানো, খুললেই জল পড়ে। সেই জলে যাতে চান-টান করা যায়, তার জন্য কলের নিচে জমানো পাথর বসানো চৌকো চৌকো টালি আছে। আবার কাছেই মাথায় অ্যাসবেস্টাস বসানো বাথরুম। অর্থাৎ দরকার পড়লে ছাদেই চানটান সেরে নেওয়া যায় আর কী। শিশির দাড়ি কামিয়ে, মাথা বেশ করে ধুয়ে পোষাক পরে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হলো। জ্বর নেই, তবু শীত শীত করছিল বলে চানটা করলো না। চুল আঁচড়ে নিলো। শরীরটাও একটু তুর্বল তুর্বল লাগছে। এখন গাড়ি নিয়ে জাহাজে না ছুটলেই ভালো ছিল। মুখটা মুছে একটু পাউডার বুলিয়ে নিয়ে ঘর বন্ধ করলো শিশির। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে লাগলো। দোতলায় পৌছানো মাত্রই—

—কোথায় ছিলে? ডেকে ডেকে সাড়া পাই না?

রাগত তুটি চক্ষু। কালো জরি পাড় শাড়ি। হাতে চুড়ির ওপরে সোনার বালা, কানে হীরে বসানো তুল, গলায় হীরে বসানো নেকলেস। খোঁপা-বাঁধা চুল। খোঁপায় বেঁধানো তুটো কাঁটার ওপরে তুটো মিনে করা ক্ষুদে ময়ূর ঝুঁটি-বাঁধা মাথা তুলে আছে প্রলম্বিত পুচ্ছ ঝুলিয়ে। নির্বাক, বিস্মিত শিশিরের দিক থেকে চোখ ফেরাতেই ময়ূর তুটো দৃশ্যমান হলো। কানের তুল আরও তুলিয়ে সে বললে, এখখুনি নিশিকান্তের দোকানে যাও গাড়ি নিয়ে। আমার আংটির পাথরটা ছুটে গেছে, এটা এখখুনি ঠিক করে নিয়ে এসো।

বলে একটা কাগজের মোড়ক কোনোরকমে তার হাতে গুঁজে দিয়ে শুভ্র বিন্দুর বুটি তোলা কালো শাড়িটা দ্রুত পায়ে তার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে অপসৃত হয়ে গেল।

শিশিরের বুকের ভিতরটা অকারণে ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল। মোড়কটা খুলে বহুমূল্য হীরেটার দিকে একবার চোখ রাখলো শিশির। সেটা জলজল করছে অকলঙ্ক শুভ্রতায়। তাড়াতাড়ি আংটিসমেত মোড়কটা বন্ধ করে শিশির পা চালিয়ে দিলো। ভালো গাড়িটা বার করে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে সাদা পোশাকটা পরেছে ড্রাইভার গাড়ির সাদা রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। শিশিরের সার্ট-প্যান্টও সাদা। সব কিছুই যেন সাদা হীরের সঙ্গে মিলে যেতে চাইছে। সাদায় সাদায় একাকার হয়ে গাড়ি, ড্রাইভার আর শিশির এগিয়ে চলতে লাগলো। ড্রাইভার বললে, জাহাজে যাবেন তো?

—না। বউবাজার। নিশিকান্তের দোকান।

গয়নার বহুমূল্য দোকান। জমকালো নামও একটা আছে, তবু এদের কাছে সেই নিশিকান্তের দোকান। হীরেটা নাড়াচাড়া করে দেখলো একজন, বললে, খাঁটি জিনিস। অনেক দাম।

—জানি।

দোকানের কর্মচারিটি মুখ তুললো,—জিনিসটা কার শিশিরবাবু? আপনার?

—ধ্যাৎ!—শিশিরের মুখখানা অকারণে আরক্ত হয়ে উঠলো বললে, আপনি কি নতুন দেখছেন আমাকে? ও-বাড়ির আমি কী, জানেন না? ওটা সুষমার – ছোট দিদিমণির।

—ও—বলে কর্মচারিটি ভিতরে চলে গেল। মিনিট দশেক দেরি হলো। তারপরে আংটিটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলো শিশির।

—এবার কোথায়? জাহাজ?

—না। বাড়ি।

বাড়িতে তখন একটা সোরগোল পড়ে গেছে রীতিমত। অফিসঘরের বারান্দায় খোঁড়া পায়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন মেজোবাবু। চুনট-করা ধুতি, সাদা সিল্কের মোজা, গরদের পাঞ্জাবি, এক হাতে সেন্ট মাখানো রুমাল, অন্য হাতে ছড়ি। ওকে দেখামাত্রই তেড়ে এলেন, কোথায় গিয়েছিলি গাড়ি নিয়ে? জাহাজে যেতে হবে না?

ঠিক প্রথমটায় কথা সরলো না শিশিরের, গলা শুকিয়ে উঠলো। মেজোবাবু আরও রেগে গেলেন, চিৎকার করে বললেন, ভেবেছো কী তোমরা! মাথা কিনে নিয়েছো? যা ইচ্ছে তাই করবে?

শিশিরকে বাঁচালো ড্রাইভার। সে এসে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছিল ওর পিছনে। বললে, শিশিরবাবু বউবাজার গিয়েছিল। নিশিকান্তের দোকানে।

এই কথাতেই কাজ হলো। নিশিকান্তের দোকান মানে গয়নার দোকান। হুট করে গয়নার দোকানে যখন গিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই কাজে গিয়েছিল। হয়ত বড়দাই পাঠিয়ে থাকবে, আর নয়ত মেয়েরা। গলার স্বর নামিয়ে গজগজ করতে করতে মেজোবাবু বললেন, এদেরও যেমন কাণ্ড, আর লোক পেলো না। অন্য গাড়িটা পড়ে রয়েছে কী করতে? অন্য কেউ যেতে পারতো না? তা না সব কাজেই শিশির—শিশির! শিশির তো চলে যাচ্ছে, এবার কী করবে সব? তারপরে ওর দিকে তাকিয়ে, -যা- ভেতরে যা। কার জিনিস?

—ছোট দিদিমণির।

সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ছুটলো মেজোবাবুর। বলতে লাগলেন,—গয়নার মেরামতি নিশ্চয়? আগে থাকতে খেয়াল করতে নেই? কলেজে পা দিয়েই ছুঁড়ির দেমাক গেছে বেড়ে।

শিশির দ্রুতপায়েই ওপরে চলে এলো। সুষমা বোধহয় ওপরের কোনো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ও আসামাত্রই ছুটে এলো। মুখখানা আরক্ত, ছুটে আসার দরুণ ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। রাগত কণ্ঠেই বললে, এতো দেরি করলে কেন? মেজদার বকবকানি শুরু হয়েছে শুনছো না? কী দরকার বাপু বেছে বেছে আমাকেই সং সাজাবার! আমি যেন চিনেমাটির পুতুল, যা ইচ্ছে সাজিয়ে লোকের সামনে হাজির করা! কী না, বোন আমার কলেজে পড়ছে! কে পড়তে চেয়েছিল কলেজে? তোমরাই তো পাঠালে।

বকবক করতে করতে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো মোড়কটা। পর মুহূর্তেই আংটিটা বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

—আমি যাই?

ওর দিকে মুখ তুললো, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, যাও? কে বললে দাঁড়াতে? আর শোনো, নিচে মেজদাকে বলবে, এর ওপরে যেন আমাকে আবার গান শোনাতে ফরমাশ না করে।

শিশির দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বলে উঠলো, আসছে তো জাহাজের ক্যাপটেন। আপনি তার সামনে যাবেন কেন বুঝলাম না।

সুষমা তেমনি উষ্মাবিজড়িত কণ্ঠেই বললে, তুমি বোকারাম বুঝবে না কিছুই। ক্যাপ্টেনের সামনে আমি যাবো কেন? ক্যাপ্টেনের বউ আসছে

না? আমার ঘরেই তো এসে বসবে। দেখছো না আমার ঘরখানা কেমন সাজানো হয়েছে! চোখ নেই নাকি?

সুষমার ঘরখানা, ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানটা থেকে খানিকটা দূরে। ভিতরটা দেখা যায় না, আর বাইরের সব ঘরের দরজাতেই তো আজ বহুমূল্য ঝালর ঝোলানো হয়েছে। নিচে থেকে আবার এই সময় রব উঠলো, শিশির—শিশির!

—যাই,—বলে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল শিশির। এবারে সেজোবাবুর পালা। ছাই রঙের সুট আর লাল রঙের টাই, কোটের কলারে গোলাপের কুঁড়ি। সেজোবাবু ঠাণ্ডাঘর থেকে বেরিয়ে ওপরের দিকেই আসছিলেন, বললেন, আর দেরি করিস না। শীগ্‌গির বেরিয়ে যা।

শিশির ত্বরিত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠাণ্ডাঘরের সামনে থেকে কে যেন তাকে নিচু গলায় ডাকলো,—এ শিশিরবাবু?

চমকে ফিরে তাকাতেই দেখলো, দন্তহীন মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে মুন্সিজী। ধবধবে সাদা কোট, সাদা পায়জামা, সাদা কেডসের জুতো, মাথায় ফেজ। বললে, এক মিনিট। দেখে যান কেমন সাজানো হয়েছে ঠাণ্ডাঘর!

দরজা খুলে, পর্দা সরাতেই ঠাণ্ডা বরফ-হাওয়া এসে গায়ে লাগলো। টেবিলে কেক-বিস্কুট-প্যাস্ট্রির রাশি সাজানো, ফুলের তোড়া, দামী সিগারেটের টিন, অদূরে চায়ের সরঞ্জাম। শিশির একটু হেসে বললে, আসল জিনিস?

চোখের কোণ ছোট করে মুন্সিজী বললে, আলমারির পেছনে। আরে শিশিরবাবু এজন্যই তো মুন্সিজীর দরকার। সারি সারি মাল দেখিয়ে মেজোবাবু বললে, চলবে? আমি বললুম, ধ্যুৎ! এসব ছোঁবে না। রুপিয়া ছোড়ুন, আমি 'Vat 61' নিয়ে আসি।

—পেলে?

—জরুর। এই মুন্সি দরকার হলে বাঘের দুধভি নিয়ে আসতে পারে।

শিশির বললে, তুমিই বুঝি সার্ভ করবে?

মুন্সিজী বললে, না-না, সেজন্য হোটেলের লোকই এসেছে। শালা বাইরে কোথায় বিড়ি ফুঁকতে গেছে আর কী! আমি আছি, ক্যাপিতান যদি ককটেল খেতে চায়?

—ককটেল!

মুন্সিজী আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে,—ককটেল বুঝলেন না? সব

মালের মিশেল আর কী! সোজা নয়। কোন্‌টার সাথে কোন্‌টা মিশবে, কতোটা মিশবে, তার দস্তুর মতো হিসেব আছে। জানবে ঐ শালা মেজোবাবু? কোন্ শালা জানবে? ঢুঁড়ে বেড়ান না তামাম কলকাতা। এই মুন্সির মতো উস্তাদ ককটেলওয়ালা দোসরা মিলবে তো পাঁচশো হাত নাকে খৎ দেবো!

বাইরে থেকে আবার শোনা গেল সেজোবাবুর গলার স্বর,—শিশির—শিশির?

শিশির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলো ঠাণ্ডাঘর থেকে। বারান্দায় মেজোবাবু-সেজোবাবু দুজনেই ঘুরছেন। সেজোবাবু বললেন, এখনো দেরি করছিস?

সময় বুঝে গেটের কাছ থেকে ড্রাইভারও গাড়ির হর্ণ বাজাচ্ছে। চলতি কথায় তারা 'হর্ণ' বলে, আসলে হর্ণের মতো আওয়াজ নয়, দিব্যি সুরেলা বাজনার মতো শোনায়। গাড়িটা কাকে দিয়ে ওঁরা যেন কিনে আনিয়েছিলেন, অনেক টাকা দাম, পিছনে 'G-B'-বোর্ড লাগানো। তার মানে Great Britain থেকে কেনা। নিঃশব্দ হংসের মতো গাড়িটা যেন সাঁতার কেটে চললো। সার্কুলার রোড। বাঁয়ে বেঁকে খিদিরপুর ব্রীজ, তারপরে ডক অঞ্চল, গার্ডেনরীচ জেটি। গাড়ি থেকে নেমে শিশির জাহাজে উঠলো। হ্যালো, গুডমর্ণিং-এর ভিড় ঠেলে সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরে।

—সিট্ ডাউন।

ক্যাপ্টেন ঘন নীল লং-প্যাণ্টের ওপর সাদা হাওয়াই সার্ট পরেছে। চওড়া বলিষ্ঠ হাতের ওপর ঘড়ির স্টিলব্যাণ্ড। টেবিলে বসে কী যেন লিখছে।

শিশির বসে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলো। এই জাহাজের মতো কোনো জাহাজেই তো তাকে আসতে হবে, থাকতে হবে। তখন সে হবে খালাসি, ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকতে পারবে না, হয়ত বা উঁচুতেই আসতে দেওয়া হবে না তাকে।

সাহেবের হাতেও একটা আংটি, সাদা পাথর বসানো, হীরে নয় নিশ্চয়, হীরে হলে আরও ঝলমল করতো। কী আশ্চর্য, আংটির কথায় মনটা আবার মুহূর্তের জন্য চলে গেল স্থির, নিশ্চল জাহাজটায়। কালোর ওপরে সাদা বুটি দেওয়া শাড়ি আর ব্লাউজ, গয়না-গাঁটি। অত সাজগোজ যেন ওকে মানায় না! সাদা অথবা হালকা রঙ, মৃদুমৃদু কথা, কিম্বা কথা না বলে চুপ হয়ে থাকা, আর নয়ত তন্ময় হয়ে তানপুরার সঙ্গে গলা মেলানো। এ মানুষটির সঙ্গে যেন কালো শাড়ির মানুষটা মেলে না! যেন কিছুই হয় নি, এমনভাবে কালো

শাড়িটা তার কাছে এলো, ঝংকার তুলে কথা বললো। সাদা শাড়ির বিনির্মল মৃদুভাষিণী তার চোখের দিকে চোখ তুলে এক মুহূর্তের জন্য হয়ত তাকাতো, তারপরে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠতো, ছুটে পালাতো।

কিন্তু শিশিরের চিন্তার যন্ত্রটি ঝংকার তুলতে না তুলতেই মিলিয়ে গেল। হঠাৎ খুট্ করে একটি শব্দ হলো ভিতরের কেবিনে, অর্থাৎ ক্যাপ্টেনের শোবার ঘরের দরজায়, বেরিয়ে এলো ক্যাপ্টেনের সেই অলোকসামান্যা রূপসী স্ত্রী। সত্যিই দেখবার মতো চেহারা। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, মাথায় কালো চুলের খোঁপা, চোখের তারা কালো, মুখখানা সুগোল নয়, কিন্তু অপরূপ লাবণ্যে ভরা। হাতে একটা ঝকঝকে সোনার রিষ্টওয়াচ, গলায় মুক্তোর নেকলেস, কানে মুক্তোর ফুল, হাতেও মুক্তোর আংটি, আর পরনে, আশ্চর্য, হালকা নীল রঙের গাউন। নীলের ওপরে ছোট ছোট শুভ্র বিন্দুর ফুল তোলা।

শিশির অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে তরুণী মেয়েটির মুখে একটু আরক্তিম আভা ফুটে উঠলো, মৃদু কণ্ঠে সে বললে, হ্যালো ?

কিন্তু শিশির কিছু বলতে পারলো না, উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা করে সম্ভাষণও জানালো না। মেয়েটি একটু এগিয়ে এলো ধীর পায়ে। তখনো তার মুখখানা থেকে শিশিরের দৃষ্টি সরে আসে নি।

হঠাৎ সে অনুভব করলো, একটি কর্কশ হাত তার চিবুকের কাছে এসে লাগলো, জোর করে তার মুখটা ফিরিয়ে দিলো, বললে,—হে—মি ওয়াইফ—নো ইয়োর্স।

তাড়াতাড়ি লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো শিশির। পা দুটো নিজের অজ্ঞাতেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। মেয়েটি অল্প একটু হাসলো। ছোট ছোট দাঁত। হাসলে ওপরের মাড়ি একটু দেখা যায়। টকটকে লাল। এতে হাসির একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

মেয়েটি হেসে হেসে ওদের ভাষায় ক্যাপ্টেনকে কী যেন বললো। ক্যাপ্টেন সহাস্য মুখে তার উত্তর দিতে দিতে শিশিরের দিকে তাকালো, বললে,—শী গো মার্কেত্। ভেক্ হার।

শিশির কী বলবে বুঝে পেলো না, সে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটি এবার তার দিকে ভালো ভাবেই তাকালো, সেই তার গভীর কালো দুটি চোখের তারা তুলে। সে-দৃষ্টির সামনে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামালো শিশির। ক্যাপ্টেন বললে, গট্ কার ?

—ইয়া।

—গট্ মানি? লট্ অফ মানি?

শিশির ঠিক বুঝতে পারছিল না ক্যাপ্টেন কী বলতে চায়, সে বলে উঠলো, নো—ইয়া—অ্যাট হোম।

ক্যাপ্টেন বললে,—ভেরি গুড। তেক হার হোম, মেক হার ওয়াইফ, মি— বলে ভাষায় আর কুলোতে না পেরে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বললে, ছেড়ে দিচ্ছি—ত্যাগ করছি।

শিশিরের চোখ একেবারে কপালে ওঠবার জোগাড়। মেয়েটি হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে মুখখানা লাল হলো তার। ক্যাপ্টেন অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখে মুখের একটা ভঙ্গি করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎই শিশিরের এবার মনে হলো, সাহেব পরিহাস করছে, সব জিনিষটাই তার ঠাট্টা। বুঝতে পেরে দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো শিশিরের। সে-ও একটু হাসলো এবার, বললে, নো স্যার। মি গট্ ওয়াইফ। হোম।

—ও-ইয়া?—চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো ক্যাপ্টেন, বললে—লাইক শী? বিউটিফুল?

—ইয়া।

ক্যাপ্টেন বললে, দেন, লেট্স্ এক্স্‌ট্চেঞ্জ।

Exchange কথাটা শিশির জানে। তার যে এইরকম উচ্চারণ হতে পারে এটা জানতো না। শিশির এ পরিহাসটা বুঝলেও কথা বাড়াতে চাইলো না। বাড়ালেই তার বিদ্যার দৌড় বেরিয়ে পড়তে পারে। সে বলে উঠলো, নো এক্স্‌চেঞ্জ। কাম হোম—শো ওয়াইফ।

—অল রাইত্—অল রাইত্!—বলতে বলতে উঠে পড়লো ক্যাপ্টেন, বউকে ওদের ভাষায় কী যেন বললো, বউটি বিস্মিত হলো, ওর দিকে সকৌতুকে তাকালো।

নেহাতই কথার পৃষ্ঠে ঠাট্টা করে বলা, কিন্তু সেটাই যে ক্যাপ্টেন আবার বাড়ি এসে তাকে সবার সামনে বলে বসবে, এটা সে ভাবতে পারেনি। বাড়ির গেটে আসামাত্রই অভ্যর্থনার ঘটা পড়ে গেল। মেয়েরা সব ওপর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে। মেজোবাবু-সেজোবাবু ক্যাপ্টেনদের নিয়ে ঠাণ্ডাঘরে ঢুকে গেলেন। এসময় শিশিরের আর খোঁজ নেই। দরজার বাইরে সে রইলো দাঁড়িয়ে। মুন্সিজীও বাইরে ছিল। ভিতর থেকে আহ্বানের অপেক্ষা করছিল।

বললে, শিশিরবাবু, কী দেখছেন ? একেবারে আস্ত হুরী। ডানা লাগালেই হলো।

হঠাৎ খুলে গেল দরজা। মুন্সিজী তার ডাক পড়েছে ভেবে ভিতরে যাবার উদ্যোগ করতেই সেজোবাবু তাকে আটকে দিলেন, শিশিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেতরে আয়।

গেল। তার পিছনে পিছনে দরজাও বন্ধ হলো।

ক্যাপ্টেন আর তার স্ত্রী বসে আছে একটা সোফায়। মেজোবাবু কাউচে, সেজোবাবু দাঁড়িয়ে। হোটেলের উর্দিপরা বয়টা এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে যেন মিশে আছে।

ক্যাপ্টেন শিশিরকে দেখেই বলে উঠলো, হে, হোয়ারস্ ওয়াইফ ? শো ?

সর্বনাশ ! দুটো কান গরম হয়ে উঠলো শিশিরের। লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করলো। তার ওপরে মেজোবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তাকে বাঁচালেন সেজোবাবু। বললেন, He is not married yet.

—'হি' হোয়াট ?

সেজোবাবুর ভাষাভঙ্গি ক্যাপ্টেন ঠিক বুঝতে পারেনি হয়ত। সেজোবাবু আবার বললেন, নট্ ম্যারেড।

—আ—হা !– ক্যাপ্টেন শিশিরকে বললে, ইউ টোল্ড লাই ! দেন, নো এক্স্‌ট্রেঞ্জ !

এটা বাবুদের বোঝার কথা নয়, শিশির বুঝতে পারলো। বুঝে, মুখ নিচু করলেও হাসি সামলাতে পারলো না।

মেজোবাবু ওদের কিছু খেতে বললেন, প্যাস্ট্রি—বিস্কুট–কেক। কিন্তু ওরা ছুঁলো না, 'নো থ্যাংক্স্' !—বলে উঠে পড়তে চাইলো। এমন কি চা-ও খেলো না। সেজোবাবু তখন মুন্সিজীকে ডেকে আনলেন। কাঁচের আলমারি খুলে গেল। নানান আকারের বোতল শোভা পাচ্ছে সারি সারি।

—কী ড্রিংক্ খাবে বলো ?

ক্যাপ্টেন এতেও রাজী হলো না। 'ভ্যাট্'-এর বোতল দেখে একটু লুব্ধ হলো অবশ্য, কিন্তু স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নো পারমিশন।

সেজোবাবু বললেন, ম্যাডাম যদি একটু ভেতরে যান মেয়েরা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন নিজের ভাষায় স্ত্রীকে কী যেন বললে। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো।

সেজোবাবু শিশিরকে ইঙ্গিত করলেন। শিশির ম্যাডামকে নিয়ে বেরুতে না বেরুতেই ক্যাপ্টেন বলে উঠলো, হে. দোন্ত্‌ ইলোপ।

'ইলোপ' শব্দটা শিশির বুঝলো না, কিন্তু বাবুরা হো হো করে হেসে উঠলেন।

ভিতরে যেতেই বৌদিরা আর সুষমা মেয়েটিকে ঘিরে ধরলো। বউদিরাও রীতিমত সাজসজ্জা করেছে। আশেপাশে আশ্রিতদের কাউকে থাকতে দেওয়া হয়নি। তবু আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে তারা ছাড়েনি। সুষমা মেয়েটির হাত ধরলো, 'গুড মর্ণিং' বললো, ওপরের সিঁড়ির দিকে নিয়ে যেতে চাইলো 'কাম' বলে। মেয়েটি সিঁড়ির কাছ বরাবর গিয়েও উঠতে চাইলো না। সে বারবার হাতঘড়ি দেখায় আর বোঝাতে চায়, সময় নেই। এক জায়গায় যেতে হবে। সুষমা অনেক কষ্টে ভালো ভালো ইংরেজি বলতে লাগলো। তাদের অফিসের চিঠিপত্রে যেরকম ইংরেজি লেখা থাকে, অনেকটা সেইরকম আর কী। 'মোষ্ট রেসপেক্টফুলি', 'আই বেগ টু ইনফর্ম ইউ'— এইসব। কিন্তু মেমসাহেব একবর্ণও বুঝলো বলে মনে হলো না, সে বিব্রত হয়ে শিশিরের দিকে তাকালো। সুষমা বললো, মেম যে ওপরে যেতে চাইছে না! কী হবে! কোথায় বসাবো?

নিচেই একটা ঘর ছিল, ছেলেপিলেরা পড়াশুনা করতো। টেবিলের ওপরে কালির দাগ, বইপত্তর ছড়ানো, কিন্তু ছিঃ! সেখানে কি একে বসানো যায়? বউদিরা এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইটই গোছাতে লাগলো, শিশিরও হাত লাগালো। কতগুলো কৃষ্ণনগরের পুতুল, তাও কোনোটার হাত ভাঙা, কোনোটার পা ভাঙা, একদিকে কে যেন জড়ো করে রেখেছে। বাচ্চাদেরই কাণ্ড, খেলতে এনে আর উঠিয়ে রাখেনি। সেগুলো শিশির সরাচ্ছিল, হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। তাকে ভিতরে ঢুকতে দেখে মেমও চলে এসেছে, সুষমা বারণ করেও আটকে রাখতে পারেনি। ঘরে যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে পড়লো। মুখগুলো সবার কালো হয়ে উঠেছে। শুধু আশ্চর্য, সুষমার ঠোঁটের কোনে বাঁকা একটু হাসির রেখা ফুটে রয়েছে।

ছোট্ট মেয়ের মতো খুশিতে উচ্ছল হয়ে মেমসাহেব পুতুলগুলোর দিকে ছুটে এলো। হাতে নিয়ে নিয়ে দেখতে লাগলো ভাঙা পুতুলগুলো। একটা পুরোনো বাউলের মূর্তি ছিল, সেটাই চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো বারবার। বউদিরা অবাক। সুষমা এগিয়ে এলো, বললে,—ডু ইউ কাইণ্ডলি লাইক টু টেক্‌ দিস ডল?

মেমসাহেব ওর দিকে তাকালো, কিছু বললো না। শিশির বললে, ও ইংরেজি বোঝে না।

সুষমা বললে, তাহলে যে ভাষা ও বোঝে, সেই ভাষায় ওকে বোঝাও! ভালো ঝামেলায় পড়েছি! পুতুলের যা হয় হবে, এখন ও একটু বসুক। ওদের গয়নাগাটি দেখুক।

কিন্তু মেমসাহেব বসলো না, পুতুলটা শিশিরের হাতে দিয়ে মেয়েদের প্রত্যেকের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে শিশিরের সঙ্গে চলে এলো ঠাণ্ডা ঘরে। 'ভ্যাট'-এর বোতল খোলা হয়নি, কাঁচের পানপাত্র বোতলের পাশে রাখা হয়েছে মাত্র। ঘরে বাবুরা ছাড়া আর কেউ নেই। সাহেব বিলপত্রাদি সই করছে। পাশেই সেজোবাবু। ভাবে মনে হয়, সাহেবের পকেটে বেশ কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। নির্বিবাদে বিলগুলো সই করছে দেখেই কথাটা বোঝা যায়।

সেজোবাবু শিশিরের মুখের দিকে তাকালেন, ক্যাপ্টেন মেমসাহেবের দিকে। দুজনের চোখের ভাষাতেই এক প্রশ্ন, এর মধ্যে হয়ে গেল?

মেমসাহেব সাহেবের পাশে গিয়ে বসলো। শেষ বিলের শেষ কপিটি সই করে সাহেব মুখ তুললো। মেমসাহেবকে কী যেন বললো। মেমসাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে কী বলে উঠলো, হাতঘড়ি দেখাতে লাগলো। সাহেব 'অলরাইত' বলে উঠে দাঁড়ালো। সেজোবাবু 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন, 'ভ্যাট'-এর কী হবে?

—নো বদার!—বলে সাহেব চলে যাবার উদ্যোগ করলো। শিশির পুরোনো পুতুলটার কথা বললো সেজোবাবুকে। সেজোবাবু পুতুলটা নিয়ে সাহেবের সামনে ধরলেন,— ম্যাডাম লাইক্‌স্ ইট। বাট্, দিস ইজ অ্যান ওল্ড ওয়ান। উই উইল বাই ওয়ান নিউ ফর হার। রাইট?

আবার স্বামী স্ত্রীতে ওদের ভাষায় কী সব কথাবার্তা। ম্যাডাম পুতুলটার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে ওটা নিলো। সে যে খুব খুশি হয়েছে সেটা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

গাড়িতে ওঠবার মুখে সেজোবাবু ড্রাইভারকে সব নির্দেশ দিয়ে দিলেন। যেখানে যেতে চায়, যাবে। যতক্ষণ থাকতে চায়, থাকবে। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বললে,—শিশিরবাবু সঙ্গে যাবে না?

—না। ও আর যাবে কী করতে?

বলতে বলতে শিশিরের দিকে তাকালেন সেজোবাবু, তারপরে ওর হাত ধরে

টেনে ক্যাপ্টেনের সামনে আনলেন, বললেন,—ক্যাপ্টেন, দিস ইজ দি ম্যান ফর ইয়োর শিপ।

—হি ?—বলে ক্যাপ্টেন ওর দিকে তাকালো। খুব যে অবাক হলো তা মনে হলো না। সেজোবাবু বললেন, ইয়েস। হি ইজ ইয়োর পার্সার।

ক্যাপ্টেন একটু হাসলো, বললে, আই নো—আই নো।

হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। কিন্তু শিশিরের সর্বাঙ্গে তখন কাঁপুনি ধরেছে। সে ভিতরে এসে সেজোবাবুর পায়ের কাছে একেবারে বসে পড়লো, বললে—আমি মরে যাবো।

—দূর! ভয় পাচ্ছিস কেন ?

শিশির উঠে বললে, না জানি ইংরেজি, না জানি কিছু! ওরা যখন টের পাবে আমার বিদ্যা, তখন আমাকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

মেজোবাবু কথাটায় সায় দিলেন। সেজোবাবুকে বললেন, কী যে ছেলে-মানুষী করছো বুঝি না! এ ভয়ানক রিস্ক্ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের কোম্পানীর বদনাম হয়ে যাবে।

সেজোবাবুর মুখখানা গম্ভীর হলো। বললেন, আর আমি বলছি ঠিক তার উল্টো হবে। ফলে দেখবে এ লাইনের পুরো কনট্র্যাক্ট পেয়ে যাবো আমরা।

শিশির বললে, জাহাজে পাঠাবেন, না হয় গেলাম। কিন্তু আমি ওসব কাজ পারবো কী করে ? টাইপ করতেও ভালো জানি না। শেষে মারধোর খাবো?

সেজোবাবুর জিদ উত্তরোত্তর যেন বাড়তে লাগলো। বললেন, আমি বলছি কোনো ভয় নেই। সে রকম হলে আমায় চিঠি লিখবি। ওদের পার্সার অসুস্থ, বদলি চাই, আমি ক্যাপ্টেনকে ধরে আর এজেন্টকে খোসামোদ করে তোকে পাঠাচ্ছি। একটাই তো মাত্র ট্রিপ। তারপরেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবি। তুই না গেলে কতো বাইরের উমেদার ঘুরছে তা জানিস? একগাদা টাকা পাবি মাইনে। ক্যাপ্টেনকে সব বলা আছে, সে—ই তোকে আগলে নিয়ে বেড়াবে।

তবু ভয় যায় না শিশিরের। সেজোবাবু অন্য গাড়িটা করে বেরুলেন তাকে নিয়ে। স্টিলের ট্রাঙ্ক কিনে দিলেন। আবদুলের তৈরি করা পোষাক। জুতো, মোজা, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস, কিছুই বাদ গেল না। আর সেইদিনই বিকেল পাঁচটার মধ্যে তিনি নিজে ওকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন জাহাজে। ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গেলেন, স্টুয়ার্ড এসে ঘর খুলে দিলো। একেবারে

চীফ অফিসারের পাশের ঘর। যদিও কেবিনটা খুব ছোট। সেজোবাবু পার্সার বললেও এরা ডাকতে লাগলো রাইটার বলে।

অফিসারদের সঙ্গে থাকা, জাহাজে অফিসারদের মধ্যেই গণ্য সে। চীফ অফিসার বা মেট্-ও গ্রীক, ভালো ইংরেজি জানে না। তবু সে আর চীফ স্টুয়ার্ডই ভাগাভাগি করে কাজ চালাচ্ছিল। ওকে দিয়ে কী সব কাগজপত্র সই করিয়ে নিলো। বললো, নো ওয়ার্ক দিস টাইম। তেক্ রেস্ত্।

পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটায় খাওয়ার ঘণ্টা পড়লো। ওদের সঙ্গে টেবিলে বসে খাওয়ার অভ্যাসটা শিশিরের আগেই ছিল, অসুবিধা বোধ করলো না। আর বিশেষ করে ক্যাপ্টেনের অতিথিরূপে সেজোবাবুও আজ টেবিলে বসলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর আরও ঘণ্টাখানেক সেজোবাবু রইলেন জাহাজে ক্যাপ্টেনের ঘরে। আর শিশির নিজের ঘরে এসে টাইপরাইটারটার দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইলো।

খেতে বসার আগে সেজোবাবুর নির্দেশে নতুন তৈরি একটা স্যুট পরে নিয়েছিল সে, গলায় টাই বেঁধেছিল। বাড়িতে সেজোবাবুই টাই বাঁধার তালিম দিয়েছিলেন। টাইটা এখন যেন ফাঁসের মতো গলার কাছে আটকে রয়েছে, বুঝি এখুনি দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। ক্যাপ্টেনের ঘর হয়ে এবার তার ঘরে এলেন সেজোবাবু। বললেন, কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শিশির ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন চোখের কোণদুটো ভিজে। ভীত ও অসহায়ের মতো ভাবভঙ্গি। সেজোবাবু ওর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃঢ়-সংবদ্ধ চিবুকের কাছটা যেন একটু নড়ে উঠলো। ছেলেটাকে কোনোদিন যে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখেছেন এমন মনে হলো না। ঝিয়ের ছেলে, পাঁচজন চাকর বাকরদের সঙ্গে মানুষ হয়েছে। কিন্তু ফরসা চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত কোমলতা আছে, লাবণ্য আছে। বুদ্ধিদীপ্তি কিছু নেই, কিন্তু একটা সরলতার ছাপ রয়েছে। একটা বোকা বোকা ফ্যাল-ফ্যাল করা চাউনি আছে ওর, যা দেখে কেমন যেন মায়া জাগে। নেহাত খেয়ালের বশেই তিনি ওকে প্যান্ট-সার্ট পরিয়ে জাহাজে জাহাজে গিয়ে কাজ দেখার কাজে তালিম দিয়েছিলেন। কাজ ঠিক ও করে গেছে, বরং ওর ঐ ছেলেমানুষী ভাবটা পার্টির কাছে সহজেই সহানুভূতি আদায় করেছে। কন্ট্রাক্টর হিসাবে সেটা ওদের কোম্পানীর পক্ষে কম লাভ নয়। আর এই

লাভের দিকটা মেজদা-টেজদা কিছুতেই বুঝবে না, খালি বাধার সৃষ্টি করবে।

আর, এবার? এবারে ওকে একেবারে জাহাজে পার্সার করে পাঠানো। এটা ওর জিদ—প্রচণ্ড জিদ। দেখাই যাক না তাঁর এক্‌সপেরিমেণ্ট সাফল্যলাভ করে কিনা। ছোট থেকেই ব্যবসায়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন বলে সেজোবাবুর মধ্যে একটা সহজাত বিশেষ অনুভূতি গড়ে উঠেছে। সেই অনুভূতি বা বোধের বলেই তিনি আজকাল তাঁর চিন্তাধারাকে অন্যপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করছেন। বড়দা বা মেজদা তাঁর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে না বলেই যত সংঘাত।

সেজোবাবু বুঝেছেন, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বিদেশীপনার যত ঢেউই এযাবৎ বয়ে যাক না কেন, একটি জায়গায় বাঙালীচরিত্র অনড়। সেটি হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে Passivity, এখানে তার চরিত্র সনাতন Passiveness ঠিকই বহন করে চলেছে। একেই ভারতীয় চরিত্রভঙ্গি বা সমগ্রভাবে প্রতীচ্য চরিত্রভঙ্গি বলা যেতে পারে। নানান আবর্তে এটা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু বুঝতে পারলে পরম এক সত্যের সম্মুখীন হওয়া যায়। এই সত্যকে আবৃত করেই একদল লোক প্রাণপণে বিদেশী চরিত্র অনুসরণ করে চলেছে। তাদের সে চলাটা এদেশের পক্ষে সহজাত নয়। বলা যায়, অস্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু এইসব লোকদেরই পছন্দ করতে ইচ্ছা করে। এরা ঝকঝকে ছেলে, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রাইট্।

সেজোবাবু ভাবেন, আমরাও কি ছোট থেকে ব্রাইট্ হবার কম চেষ্টা করেছি? ইংরেজ চরিত্রের ধরণই আলাদা, তবুও ওদের চালচলনকে অনুকরণ করে আমরা স্মার্ট হচ্ছি, স্মার্ট ছেলেকে পছন্দ করছি। ইংরেজও তার যন্ত্রশালায় এই স্মার্ট ছেলেদের তৈরি করতো, তাদেরই পছন্দ করতো, তাদেরই ওপরে ঠেলে তোলার চেষ্টা করতো। ইংরেজ চলে যাবার পর বিশেষ করে আমরা সাধারণ বাঙালীরা হঠাৎ ই উচ্চপদ পেয়ে এক একজন ক্ষুদে 'ইংরেজ' বনে যাবার প্রয়াস করছি। তার ফলে, সর্বক্ষেত্রে শীর্ষভূমিতে এই স্মার্ট বা ঝকঝকে মানুষদেরই আনাগোনা। এরা সত্যিকার কাজ করে না, কাজের কায়দাকে রপ্ত করে। আমরা সেই কায়দা দেখে সব ভুলে যাই।

সেজোবাবু ভাবেন, মন্ত্রীদের মধ্যেও কি যথার্থ গভীর চিত্তের লোক নেই? কিন্তু তাঁরাও এই বুদ্ধিমানদের ঝকঝকে ভাব আর কাজের কায়দায় এমনই মুগ্ধ,

যে কিছু করতে পারছেন না। মাঝখান থেকে ভিতরে-বাইরে গাল খেয়ে মরছেন!

সেজোবাবু চিন্তান্বিত মুখখানা তুলে শিশিরের দিকে তাকালেন। এ ছেলেটা তথাকথিত 'স্মার্ট' বা 'ব্রাইট' বা ঝকঝকে নয়, গাধার মতো খেটে চলেছে। যা মাইনে পেয়েছে, তাই নিয়ে খুশি থেকেছে, কখনও মুখ বেজার করেনি। 'বুদ্ধিমান' যারা আগে ওর কাজ করতো, তারা কাজের থেকে অকাজ করতো বেশি, কোথাও জরুরী কাজে পাঠালে সেখানে না গিয়েই দশরকম মিথ্যা কথা বলতো, আর আমাদের সামনে দেখাতো, কাজ করে করে যেন হয়রান হয়ে যাচ্ছে! আমরাও তাদের ছলনায় ভুলেছি, তাদের মাইনে বাড়িয়েছি, বোনাস দিয়েছি। আর, আজ? এই Passive প্রকৃতির বোকা আর মুর্খ ছেলেটিকে দিয়েই আমার পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ শুরু হোক, দেখা যাক, মাত্র নিষ্ঠা আব সততা দিয়ে একটা মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে উঠে দাঁড়াতে পারে কিনা!

সেজোবাবুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাক মূর্তির সামনে শিশিরও চোখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তাব কাঁধে হাত রাখলেন সেজোবাবু, বললেন,—চলি রে।

শিশির ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো,—আমি যাবো না?

—পাগল!

শিশির বললে, কারও সঙ্গে যে দেখা করি নি আসবার সময়।

—মানে? বড়দার সঙ্গে দেখা করিস নি?

—হ্যাঁ। তিনি তো বিছানায় শুয়ে। তাঁকে প্রণাম করে এসেছিলাম।

—তবে আর কী।

—বউদিদের সঙ্গে—

—কিছু দরকার নেই। নামতে হবে না, জাহাজেই থাক।

প্রায় ধমকেই কথাটা বললেন সেজোবাবু। তারপরেই আর দাঁড়ালেন না, মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ঝড়ের গতিতে।

শিশির জাহাজের পোর্ট সাইডে মিডশিপ ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, গ্যাং-ওয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছেন সেজোবাবু। অদূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারকে দেখা যায় না এতদূর থেকে। সেজোবাবু গাড়ির কাছাকাছি হতেই গাড়ি থেকে একটা লোক নেমে দাঁড়ালো। হাতে

তার কী একটা জিনিস যেন। সেটা দেখিয়ে সেজোবাবুকে কী সব বললো। যেন কিসের অনুমতি চাইলো। সেজোবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হাত দিয়ে দেখালেন জাহাজের দোতলাটা। লোকটা হন-হন করে আসতে লাগলো জাহাজের দিকে। শিশির চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকালো। মাথায় ফেজের বদলে সাদা টুপি থাকায় চিনতে পারেনি শিশির। মুন্সিজী। ওকে দেখে এত ভালো লাগলো শিশিরের যে, সব ভুলে সে চিৎকার করে উঠলো, মুন্সিজী! সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো মুখ কেবিনের পোর্ট হোল্ থেকে উকি দিলো। কে যেন মোটাগলায় গ্রীক ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করলো। আর ঠিক মাথার ওপরে যাকে জাহাজী ভাষায় বলে 'ব্রীজ',—সেই ব্রীজ নামধেয় ক্যাপ্টেনের ঘর আর হুইল হাউস সংলগ্ন ডেকটার ওপরে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। সম্ভবত তারই উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে। সে তার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে,—ম্যাডাম, সরি।

মেমসাহেব অল্প একটু হেসে মাথা হেলিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বললে। তাতে সে রাগ করেছে বা বিরক্ত হয়েছে, তা বোঝা গেল না। কিছু একটা বলা উচিত মনে করে শিশির বললে, আই অন দি শিপ—রাইটার।

—রাইতার! আঁ—হা!

মেমসাহেব যেন আগ্রহের সঙ্গেই কথাটা বললো মনে হলো। কিন্তু পরক্ষণেই শোনা গেল ক্যাপিতানির বাজখাঁই গলা,—হে, দোন্‌ত্‌ তক্ তু মাই ওয়াইফ—নো—নো!

বলতে বলতে সাদা হাফপ্যান্ট আর সাদা গেঞ্জিপরা মানুষটি এসে মেমসাহেবের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। এটা আদেশ, না পরিহাস ঠিক ধরতে না পেরে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে শিশির একেবারে ছুটে ভিতরে চলে গেল। যেতে যেতে শুনতে পেলো খিলখিল করে হেসে উঠেছে মেমসাহেব। গলার আওয়াজটা মিষ্টি, কিন্তু একটু ক্ষীণ ধরণের, একটু চাপা।

শিশির ছুটে একেবারে নিজের দরজার কাছে গেল। যতক্ষণ না তার কাছে উঠে এলো মুন্সিজী, ততক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। মুন্সিজী উঠতে উঠতে যাকেই সামনে দেখছে তাকেই 'গুড ইভনিং' জানাতে জানাতে চলে এলো। শিশিরকে দেখে দন্তহীন মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি টেনে আনলো, বললে, ঐটেই নাকি কেবিন? দেখি, দেখি।

বলতে বলতে তার পাশ দিয়েই ঘরে ঢুকলো। ঢুকে এটা দেখে, ওটা দেখে, নেড়ে-চেড়ে অবাক হয়।

—কী ব্যাপার, মুন্সিজী ?

মুন্সিজী ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে বললো,—বলছি। একটু জল খাওয়ান।

শিশির নিজের ঘরটা ভালো করে দেখেই নি। খুঁজে পেতে জলের গেলাস বা জলের কুঁজো কিছুই পেলো না। বললে, দাঁড়াও আনছি।

মুন্সিজী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, আরে দূর মোশায়, মামুলি জল কে খেতে চাইছে ?

—তবে ? চা খাবে ?

—আরে ছোঃ! চা তো হরদম খাচ্ছি,—মুন্সিজী বললে,—আসল চীজ কিছু আছে ? আলমারিটা দেখুন না ?

একটি ছোট্ট আলমারির মতন বস্তু কেবিনের এক কোনে পড়েছিল। কাঁচের পাল্লা নয়, সবটা ঢাকা। সাদা মতন, মনে হয় যেন রেফ্রিজারেটর। শিশির হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল। না, ভিতরটা খালি, কিছু নেই। টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখবার জায়গা ওটা।

মুন্সিজী বললে,—ঠিক আছে। চেপে যান।

তারপরেই একটু হেসে,—জাহাজে ঢুকলেন, ঢুকু-ঢুকু তো একটু-আধটু চালাতেই হবে ? ফিন যখন এ-পোর্টে আসবেন, বেশক তখন কিন্তু খাওয়াতে ভুলবেন না।

তারপরে শিশির সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ করে,—আরে! আপনে বস্থন ?

শিশির সাদা ধবধবে চাদর টানটান করে পাতা বিছানাতে বসতে গিয়ে যেন ডুবে গেল। মুন্সিজী বলে উঠলো,—হায় হায় কেয়াবাৎ! নসিব করেছিলেন বটে একখানা!

শিশির বললে, বাজে বকো না। আমার মতো খারাপ নসিব কার ? আমাকে জাহাজের রাইটার করে দিয়েছে, আমি কী করে কী করবো বলোতো ? শেষে রেগেমেগে আমাকে একদিন জলেই ছুঁড়ে দেবে। আমি ঠিক মরে যাবো, তুমি দেখো! আর আমাকে তোমরা দেখতে পাবে না।

বলতে বলতে শিশিরের গলা ধরে এলো। এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে

থাকবার পর মুন্সিজী উঠে দাঁড়ালো, বললে,—যাই শিশিরবাবু, মেজোবাবু বলে দিয়েছে তড়িৎ-ঘড়িৎ ফিরে যেতে। একমিনিটও দেরি করা চলবে না। কী কাজ আছে যেন তার।

এতক্ষণে ভালো ভাবে নজর করে দেখলো শিশির, মুন্সিজীর হাতে তুখানি বই, খবরের কাগজের মলাট দেওয়া। পাতলা বই নয়, মোটাই বলা চলে।

মুন্সিজী বললে, বড়োবাবুই বই তুটো দিলে। বললে দিয়ে আয় শিশিরকে। ওর কাজে লাগবে। এই নিন।

বই তুটো হাতে নিলো শিশির। তুটোই ডিক্সনারি। একখানা ইংরেজি থেকে বাংলা, আরেকখানা বাংলা থেকে ইংরেজি। বই তুটো আনকোরা নতুন নয়। খুলে দেখতে দেখতে একখানা থেকে ঠকাস করে একখানা সাদা খাম বেরিয়ে এলো। নিচু হয়ে খামটা কুড়িয়ে দেখলো, কোনো নাম ঠিকানা লেখা নেই, অথচ ভিতরে একটা কাগজ যে ভাঁজকরা আছে বেশ বোঝা যায়। মুন্সিজী তীর্যক চোখে সব-কিছু নিরীক্ষণ করছিল। বললে, পড়ুন না একটু? ছোটদিদিমণি কী লিখেছে একটু শুনি।

যেন শরীরটা কেঁপে উঠলো মুহূর্তে। কম্পিত কণ্ঠে বললে,—কী করে তুমি জানলে যে, সে লিখেছে?

চোখ গোল গোল করলো মুন্সিজী, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে বললে, —আমার সামনেই তো লিখলে! বড়বাবু ডেকে বললে, মুন্সিকে বই তুটো দেতো, শিশিরকে দিয়ে আসবে। গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এলো দিদিমণি। বললে, কী মুশকিল, আমার দরকারে লাগবে না? বড়বাবু বললে. তোকে কিনে দেবো পরে। ছোটদিদিমণি বই তুটো আমার হাতে দিয়েও বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখলো আমাকে। তা শালা আমার নজর, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, চিঠি লিখছে দিদিমণি।

শিশির খামটা ছিঁড়ে ফেললো। ছোট্ট চিঠি। 'শিশির, ভেবেছিলাম যাবার সময় দেখা করে যাবে। তা যাক, না দেখা করেছো ভালোই করেছো। একটি কথা তোমায় বলে রাখি, সেদিনকার কথাটা একেবারে ভুলে যেয়ো। ওর কোনে মানে নেই, ওটা অর্থহীন।'

মুখ তুললো শিশির। মুন্সিজী বাংলা পড়তে পারে না সে জানে। মনে হয়, এটা কারও হাতে পড়েওনি। পড়লে কী হতো বলা যায় না।

মুন্সিজী বললে, কী লিখেছে?

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শিশির বললে, লিখেছে সাবধানে থাকতে। বই দুটো কাজে লাগবে, তাই পাঠানো। আশীর্বাদ জেনো। এইসব আর কী!

মুন্সিজীর ভ্রূদুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, বললে,—এই-ই লিখেছে? তাহলে লিখতে লিখতে কাঁদছিল কেন? আমি জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, এক হাত দিয়ে লিখছে, আরেক হাত দিয়ে চোখের জল মুছছে। চিঠিটা ভালো করে দেখবেন, চোখের জলের দাগ পাবেন।

শিশিরের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো, বোধহয় ভয়ে। মুন্সিজী মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো,—না—না—এ ভালো নয়। জানতে পারলে বাবুরা ভীষণ চটে যাবে। আচ্ছা শিশিরবাবু, এইজন্যই কি আপনাকে বাবুরা সাত তাড়াতাড়ি জাহাজে পাঠিয়ে দিলে?

এ কথায় মনে মনে চমকে উঠলো শিশির। কিন্তু কী হয়েছে? কী ওরা জানতে পেরেছে? জানতে পারার তো কথা নয়! আর সত্যিই তো, জানবার মতো আছেই বা কী!

মুন্সিজী বললে, ভালো ঠেকছে না ব্যাপারটা। আমি পুরোনো আদমি, ছোট থেকেই ওদের সব জানি। দিদিমণির পেয়ারের লোক যে একজন আছে! বম্বে চলে গেছেন। এনারা ঠিকাদার, তেনারাও ঠিকাদার। সেইজন্য পালপার্বনে এনারা যেতেন, তেনারা আসতেন। কখন যে রঙ ধরলো কেউ জানে না। সেজোবাবুই ধরে ফেললেন একখানা চিঠি। তিনি লিখেছিলেন এঁকে। ব্যস, আর যায় কোথা! মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এদানি শুনছি, ঘুরে ফিরে সেই সম্বন্ধই আসছে। তিনি যে চার-চারটে পাস দিয়েছেন। একে বড়োলোক, তায় অত পড়িলিখি আদমি, তেনাকে কি এনারা ফেলতে পারেন? শাদীর বাৎচিৎ হচ্ছে, ইনি পাস করলেই শাদীটা হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম, আবার আপনার সাথে চিঠি-চাপাটি কেন?

এতক্ষণে একটা আতঙ্ক এসে তাকে অধিকার করলো। বিশ্বাস নেই মুন্সিজীকে, এখুনি গিয়ে সেজোবাবুর কাছে কী সাতপাঁচ লাগাবে কে জানে? ফলে সে ফিরে এলে তার স্থান হবে না ওবাড়িতে, আর ও মিছিমিছি অপবাদ সইবে, নির্যাতন সইবে! কিন্তু কিছু বলতে পারলো না মুন্সিজীকে। স্থাণুর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো চিঠি হাতে নিয়ে।

মুন্সিজী বললে, কী, কিছু বলতে টলতে হবে কাউকে?

শিশির নিরুত্তর।

মুন্সিজী আবার বললে, চিঠি-চাপাটি ?

চমকে উঠলো শিশির। একবার মনে হল, চিৎকার করে বলে ওঠে, বেরিয়ে যাও এখখুনি, শয়তান কাঁহাকা! কিন্তু পারলো না, স্বর ফুটলো না কণ্ঠে। মুখখানা নিচু করে কোনক্রমে মাথা নেড়ে নীরবে জানালো,—না। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। মুন্সিজী চলে গেছে। আর তার পায়ের কাছটা ভিজে গেছে টপ-টপ করে গড়িয়ে পড়া তারই চোখের জলে।

সারারাত যেন বৃশ্চিকে দংশন করেছে শিশিরকে। বিছানায় যখন শুতে গেছে, তখন মনে হলো সে যেন ডুবে গেছে সমুদ্রের ফেনপুঞ্জে। এত নরম এত ঝকঝকে বিছানায় শোবার অভ্যাস তার ছিল না কোনোদিন। আরামে যে ঘুম আসে না, সে অভিজ্ঞতা শিশিরের হলো এই প্রথম।

সে রাত্রে কেউ তাকে ডাকলো না, সে রাত্রে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতেও এলো না। তার কি ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়া উচিত ছিল? কে জানে। কেউ তাকে কোনো উপদেশ দেবার নেই। মেজোবাবু সেজোবাবুরা তার সত্যিকার কোনো আপন লোক নয়, কিন্তু সে রাত্রে তাদেরই স্মরণ করে বারবার তার চোখে জল আসতে লাগলো।

সকাল হলো। শুরু হলো জাহাজের কর্মব্যস্ততা। জাহাজ ছাড়বে, পাইলট আসবে, সামনের মাস্তুল থেকে মিড-শিপ পর্যন্ত যে তার বা দড়ি ঝোলে, তাতে পাইলট-ফ্লাগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খালাসিরা সামনে-পিছনে ভাগে ভাগে কাজের জন্য গিয়ে জড়ো হচ্ছে। ইঞ্জিনরুমে যাদের ডিউটি, তারা রাতের লোকদের বদলে কাজে গিয়ে হাত দিচ্ছে। ক্লান্ত পায়ে, জড়ানো চোখে রাতের লোকেরা কেবিনে ফিরছে। চানটান করে, কিম্বা হাত পা মুখ ধুয়ে এক কাপ চা বা কফি খেয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়বে। তারা জানবেও না কখন পাইলট এলো, কখন জাহাজ জেটি ছাড়লো, কখন ধীর গতিতে টাগ-বোট তাদের টেনে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে গেল।

চীফ স্টুয়ার্ড লোকটি দেখতে গোলগাল, একটু বেঁটে। প্যান্টের ওপরে হাতাওয়ালা গেঞ্জি আর মাথায় ক্যাপ, হাতে চাবির রিংশুদ্ধ চেনটা ঘোরাতে ঘোরাতে এসে শিশিরের দরজায় ঘা দিলো।

কোনো উত্তর নেই। তখন ঘরের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো চীফ স্টুয়ার্ড। কিন্তু তার পরেই সে যা দেখলো, তাতে তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম। নিজেদের মধ্যে কাল সন্ধ্যাতেই এই নতুন ছেলেটিকে নিয়ে খুবই জল্পনাকল্পনা হয়ে গেছে। সারা জাহাজে এই ছেলেটিই একমাত্র ভারতীয়। সেইজন্য ওরা নিজেদের মধ্যে কালই ওর নামকরণ করে নিয়েছে, ইন্দিয়ানা বা ইন্দি। স্টুয়ার্ড দেখলো, বিছানার ধবধবে ফরসা চাদরটা মাটিতে পেতে বালিশ টেনে নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ইন্দি। স্টুয়ার্ড ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলো। স্টুয়ার্ডের ইংরেজি জ্ঞান ক্যাপ্টেনের থেকেও কম। শিশির চোখ খুলতেই বললে,—তিপ্‌সি ?

শিশির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে ইঙ্গিতে হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলো, বোতল-টোতল টেনেছো নাকি ?

শিশির উঠে বসলো তাড়াতাড়ি। চাদর আর বালিশ টেনে নিয়ে বিছানায় রাখতে যেতেই স্টুয়ার্ড থমকে উঠলো, কেড়ে নিলো ওর কাছ থেকে চাদর-বালিশ। ধমকের ভাষাটা দুর্বোধ্য, কিন্তু ভাবটা না বোঝাব কিছু নেই। 'ময়লা জিনিসটা বিছানায় রাখছো কেন ? ক্যাপিতানি—'

বলে, একটি হাতের আঙুল উর্ধে তুলে, অপর হাত গলার কাছে এনে গলাটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার ইঙ্গিত করলো। মুখে একটা ঝোলটানার শব্দ করলো সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ ক্যাপিতানি টের পেলে গলা কেটে দেবে একেবারে। তারপরে চাদর বালিশ ওর চোখের সামনে তুলে ধরে বলতে লাগলো, দাব্রতি। হোয়াই ? নো-নো—ভেরি ব্যাদ !

বলতে বলতে দরজা ঠেলে চলে যাবার উপক্রম করলো। দরজার বাইরে গিয়ে আবার একটু দাঁড়ালো, বললে,—কাম। ক্যাপিতানি—

বলে আবার আঙুল ওপরে তুললো। শিশির বুঝলো, ক্যাপ্টেন তাকে ডাকছে। শিশির তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে ওপরে গেল। ব্রীজেই ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে, হুইল-হাউসের দরজায় থার্ড অফিসার। এ জাহাজে হুইল-হাউস আর ক্যাপ্টেনের ঘর দুটো পাশাপাশি, পিছন দিকে ছোট ডেক, খানিকটা ফাঁকা, সেখানে লাইফ বোট শোভা পাচ্ছে। আর ডানদিকে ছোট একটা ঘর, সেটা রেডিও-অপারেটিং রুম। রেডিও-অফিসারটি বসে বসে কাজ করে এখানে। নিচে তার ঘর আছে আলাদা, আবার এ ঘরটিতেও ছোট একটা ক্যাম্পখাট পাতা, দরকার হলে এখানেও শুতে পারে। আধুনিক ধাঁচের যে সব লিবার্টি

শিপ তৈরি হচ্ছে গত যুদ্ধের আমল থেকে, তার আকার-প্রকারের সঙ্গে এই Antelope জাহাজের মিল নেই, এ যেন আরও সাবেক কালের জাহাজ। দেখতে ছোট, চলেও লিবার্টি টাইপের জাহাজের সঙ্গে সমান তালে নয়। শিশির কাছে গিয়ে দুজনকেই সেলাম করলো। থার্ড অফিসারটির মুখখানা খুব ছেলেমানুষীতে ভরা, বয়সও কম, বোধহয় তার বয়সীই হবে। তাকে দেখে মুচকি একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

ক্যাপ্টেন তাকে আপাদমস্তক দেখে বললে, নো পাইলত্। হোয়াই?

শিশির কী যে বলবে বুঝে পেলো না। পাইলট এখনো আসে নি কেন, তার কৈফিয়ৎ সে কী করে দেবে?

ক্যাপ্টেনের এক হাতে একটি মেগাফোন বা চোঙা ছিল। সেটা মুখে লাগিয়ে সামনের ডেকের খালাসিদের দলপতি বসুন্‌কে কী যেন বললো। সেখান থেকে উত্তরও ভেসে এলো বসুন্‌-এর। গালের কাছে হাত নিয়ে সে কথা বললো, আর ওদের অভ্যাস মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো। ক্যাপ্টেন মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে ব্রীজের এক প্রান্তে নিয়ে এলো, তারপরে ওপরে ওঠানো ফ্ল্যাগটাকে দেখালো। চারপাশে কালো চৌকো দাগ, মাঝখানে সাদা। ক্যাপ্টেন বললে, 'জি' ফ্ল্যাগ। বাত্ নো পাইলত্।

বলতে বলতে হাতঘাড়টা তার চোখের সামনে মেলে ধরলো ক্যাপ্টেন, বললে,—সি। সিক্স থার্টি।

মনে পড়লো, শিশির কালই দেখেছিল, নিচে বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা ছিল, জাহাজ ছাড়বে ছটায়। সেই হিসাবে আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে বটে। ক্যাপ্টেন বললে, রাইত্ এ লেতার। আই কমপ্লেন। গো। কুইক।

এধরণের ইংরেজিতে শিশির এত দিনে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তার হৃদকম্প শুরু হলো চিঠি লেখার কথা শুনে। দৌড়ে ঘরে এসে কাগজ কলম নিয়ে বসলো। ঠিক কাকে উদ্দেশ করে লিখতে হবে, তা-ও সে জানে না, কী লিখতে হবে সে তো তার বুদ্ধিরও অগম্য। তবু বাবুদের কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে যেটুকু তার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই সম্বল করে লিখলো,—আই বেগ মোষ্ট্ হাম্ব্‌লি অ্যাণ্ড রেসপেক্টফুলি টু স্টেট ছাট—

এইটুকু লিখতে গলদঘর্ম হয়ে সে থেমে গেল। কী লিখবে এরপর? তারপরে 'রেসপেক্টফুলি' বানানটা ঠিক হয়েছে কী? তাড়াতাড়ি উঠে মুন্সিজীর দেওয়া সেই ডিক্সনারি দুটো নিয়ে এলো। বানান দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখের সামনে

সব ঝাপসা হয়ে গেল। বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার ওপরেই লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে, কুমারী সুষমা মজুমদার, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী—

বাকিটা আর পড়া হলো না, শুধু নামটাই যেন তার চোখের ওপরে জলজল করে উঠতে লাগলো। অক্ষরগুলোর যেন প্রাণ আছে, এখুনি কালির বাধা উত্তীর্ণ হয়ে ওরা বেরিয়ে আসবে, ইচ্ছামতো চলা শুরু করবে।

তার বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। তার হৃদয় যেন আর্ত হাহাকারে আকুতি জানাতে লাগলো, আমি কী করবো বলে দিন। লিখেছেন, সেদিনেব সব কথা ভুলে যেয়ো। ভোলা কি সহজ? আজ এই বিপদের মুহূর্তে আপনাকেই যে সবার আগে মনে পড়ছে। না-না, আমি পারবো না, আমি পালাবো। এখনো সময় আছে, পাইলট আসে নি, আমি গ্যাং-ওয়ে বেয়ে নিচে যাই। ছুট ছুট ছুট—যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো। আপনারা টেরও পাবেন না আমি কোথায় গেলাম!

চিন্তা করতে কবতে উত্তেজিত ভঙ্গিমায় শিশির ঘর থেকে বাইরে এলো। জাহাজটা যেন একটু দুলছে মনে হলো, কাবা যেন কী সব বলাবলি কবছে। ওপরে ক্যাপ্টেন চোঙা মুখে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাকে যেন কী নির্দেশ দিচ্ছে। তার দেবি দেখে তাকেই খুঁজছে কি ক্যাপ্টেন? শিশির আর দেবি করলো না, চীফ মেটের ঘরের পাশ দিয়ে বাইরে এলো। সন্তর্পণে একবার এদিক ওদিক তাকালো, না, কেউ নেই এখানে। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের ডেকের দিকে চলে এলো শিশির। আগাগোড়া ঢাকা তিন নম্বর ছোট্ট ফলকা, তার পরেই ইঞ্জিন ডিপার্টমেণ্টের কেবিনগুলো, তার নিচে ইঞ্জিনরুম, ইত্যাদি। শিশির এই তিন নম্বর ফলকের পাশ দিয়ে পোর্ট সাইডে এলো। ওপরেই ব্রীজে ক্যাপ্টেনের দাঁড়িয়ে থাকবার কথা, কিন্তু সে নেই। শিশির ছুটে গ্যাং-ওয়ের দিকে গেল।

কিন্তু, কোথায় গ্যাং-ওয়ে বা সিঁড়ি? সিঁড়িটা গোটানো অবস্থায় যেমন জাহাজের পাশে সংলগ্ন করা থাকে, তেমনি রয়েছে, জাহাজ চলে এসেছে জেটি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, মাঝ গঙ্গায়। সর্বনাশ! পাইলট্ ছাড়াই জাহাজ চালিয়ে দিলো নাকি ক্যাপ্টেন? যতদূর জানে, সেটা নিয়ম নয়। তবু বলা যায় না। মাথার ওপর তাকালো। 'জি' ফ্ল্যাগটা নেই। 'জি' ফ্ল্যাগের অর্থ 'পাইলট্ চাই।' আর এখন ঝুলছে ত্রিভুজ আকারের লাল নিশান, মাঝখানে সাদা দাগ। যার মানে—

হঠাৎ ঠিক তার চোখের সামনে, মুখোমুখি, ওপরের ব্রীজে ক্যাপ্টেন এলো

উদয় হলো, হাতে চোঙা। ওকে দেখে ক্যাপ্টেন ইশারা করে ডাকলো। উপায় নেই, কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে গেল শিশির। ক্যাপ্টেন গলার স্বর নামিয়ে বললে, দোন্‌ত্‌ রাইত্‌ লেতার। পাইলত্‌ কাম। গো। কুইক।

যেন দেহে প্রাণ ফিরে এলো শিশিরের। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসলো। কেমন যেন ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। আস্তে আস্তে উঠলো, আবার গেল জাহাজের কিনারের দিকে, পোর্ট সাইডে। জেটির লোকগুলোকে চেনা যায় না, অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে তারা। আর গঙ্গার ঘূর্ণির মতো পাক-খাওয়া জলের ওপর দিয়ে জাহাজটা চলেছে। জাহাজটা আকারে ছোট, এর কেবিন-বিন্যাসও অদ্ভুত। ব্রীজের সংলগ্ন ক্যাপ্টেনের ছুখানা ঘর, লাইফবোট আর রেডিও অফিস, নিচে, সেলুন আর কিছু ঘর, তার নিচে রান্নাঘর এবং আরও কেবিন। সাধারণ খালাসিরা থাকে জাহাজের পিছন দিকে, সেখানেও কিছু ঘর আছে। আর ইঞ্জিন ডিপার্টমেণ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে কেবিনে থাকে অফিসাররা, আর সাধারণভাবে, এক ঘরে ছুজন কি চারজন হিসাবে ওখানকার খালাসিরা।

তাদের কেবিনগুলো দোতলায়। নিচেও কয়েকজন অফিসার থাকে। স্বয়ং চীফ স্টুয়ার্ডই থাকে। কিন্তু সে যে বেছে বেছে কী করে দোতলায় এলো, এটাই আশ্চর্য। যদিও তুলনায় তার ঘরখানা সব থেকে ছোট। যার বদলি হিসাবে সে জাহাজে এসেছে, সেই মানুষটি এঘরে থাকতো বলেই বোধহয় এটা সম্ভবপর হয়েছে।

জলের দিকে তাকাতে তাকাতে শিশিরের হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। সে ভিতরে এলো। সেলুনে বসে যে অবসর পাচ্ছে, সে-ই প্রাতরাশ খেয়ে নিচ্ছে, চা, টোষ্ট, ডিম ইত্যাদি। শিশির যন্ত্রচালিতের মতোই ভিতরে ঢুকলো। একজন বয় সবাইকে খাবার দাবার দিচ্ছিল। সে ওকে দেখে টেবিলের একটা কোণ দেখিয়ে দিলো। ও বসতেই ঠকাস করে একটা প্লেট ওর সামনে নামিয়ে রাখলো।

ঘরে তখন বিশেষ কেউ নেই। শুধু একটু দূরে রেডিও-অফিসারটি বসে বসে খাচ্ছিল। খাচ্ছিল না বলে গিলছিল বলা চলে, তাড়াতাড়ি কোনরকমে কিছু মুখে দেওয়া যেন। হঠাৎ একসময় লোকটি ওর দিকে মুখ তুলে পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণে বললে, What's your name ?

—কর। শিশির কর।

—ধর ইজ ইট ?—তার পরেই যে বলতে লাগলো,—হাম ইন্দুস্তানি জানতা হায়। তোভা তোভা। আই অ্যাম নো গ্রীক। হোয়েন ইউ ফিনিশ, কাম টু মাই রুম।

লোকটা চলে গেল। শিশির খাওয়ার পর এদিক ওদিক ঘুরলো। কেউ তাকে ডাকছে না। ক্যাপ্টেন পাইলটকে নিয়ে ব্যস্ত। কোনো কাজ নেই বুঝে শিশির উঠে গেল লোকটির ঘরে।

নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে বসে আছে সে। তার থেকে বয়স যথেষ্ট বেশি, তবে প্রৌঢ় নয়। লালচে চুল, চোখে ভ্রূ নেই বললেই হয়, চোখের মণি একটু বেশি কটা। দোহারা চেহারার মানুষটি। নিচের ঠোঁটটা একটু স্থূল, নাকটাও এ জাহাজের গ্রীকদের মতো তীক্ষ্ণ নয়, একটু মোটা। ওর টেবিলের পাশে আর একটা চেয়ার ছিল, সেটা দেখিয়ে শিশিরকে বসতে বলে সিগারেট ধরালো। বললো, তোমার সিগারেট কই ? খাও না ?

—খাই। কিন্তু—

ওর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আমার নাম মিয়ানী। আমি সাইপ্রিয়ট—সাইপ্রাস দ্বীপের লোক। আমি এথেন্সে একটা ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি শিখেছিলাম। বম্বেতে ছিলাম অনেকদিন। শিপিং এজেন্টদের অফিসে কাজ করতাম। তখন ইন্দুস্তানি শিখি। কী ভালো বলছি না ? বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ?

লোকটা হিন্দী-ইংরেজী মিশিয়েই কথা বলছিল। শিশির মোটামুটি ওর কথা যে না বুঝেছিল এমন নয়। বললে,—না। ভালোই তো বলছো।

—নাউ লুক,—মিয়ানী বললে, তুমি তো বম্বে পর্যন্ত যাচ্ছো, তাই না ?

একটু চমকেই উঠলো শিশির। বললে,—বম্বে পর্যন্ত ? আমি তো জানি না।

শিশির ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতেই কথা বলছিল। মিয়ানীও তাই। সে বললে, আসল পার্সার যে, সে বম্বেতে জাহাজে উঠছে। তখন তোমার ছুটি, বুঝলে ? কিছু টাকা পকেটে পুরবে, আর মনের আনন্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে।

শিশিরের বুকখানা উত্তেজনায় ঘন ঘন ওঠানামা করতে লাগলো। এতো সহজে ? এতো সহজে তার ছুটি মিলবে ? তাহলে, ফেরার পথে সে দেখা করবে সেই বসন্তবাবুর সঙ্গে। তাঁকে বলবে সুষমা দিদিমণির কথা। বলবে, তিনি নিজে আমাকে বলেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে।

—ভাবছো কী ?—মিয়ানী বললে, জাহাজ সোজা থামছে গিয়ে কলম্বো, সেখানে তোমার কিছু ছুটোছুটি আছে, কাজ কর্মের তাড়া আছে।

—কা কাজ ?

মিয়ানী বললে, জানো না কী কাজ ? এজেন্টের কাছে যাতায়াত করা, জাহাজ বন্দর ছাড়লে তার ক্লিয়ারেন্স নেওয়া, এসব তো তোমাকেই করতে হবে। স্টুয়ার্ড শুধু ক্যাশ হ্যাণ্ড্‌ল করবে কথা আছে।

শিশির ওর মুখের দিকে তাকালো। কাজের তালিকা শুনেই তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

মিয়ানী ওর মনোভাব কতটা বুঝলো কে জানে, সে বললে, পার্সারের কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছে আর কী! স্টুয়ার্ড টাকা-পয়সা নিয়ে থাকবে, আর তুমি করবে কেরানীর কাজ। সেজন্যই তো তোমাকে সবাই বলছে, রাইতার।

শিশির বললে, তুমি সত্যি বলছো, আমি বম্বেতে ছুটি পাবো ?

—তাই তো কথা আছে, মিয়ানী বললে, যদি না আসল পার্সারটি মরে যায়।

—না না—ও কী কথা বলছো!

মিয়ানী বললে, রোগটা তো সহজ নয়। শুনেছি, সারা লিভারটা নাকি পচে গেছে। বেঁচে ওঠা শক্ত।

—কী হবে তাহলে ?

মিয়ানী বললে, কিসের কী হবে ? ভালোই তো হবে তোমার। একেবারে সারা ইউরোপ চক্র দেবে।

শিশির ভয়-ভয় করা গলায় বলে উঠলো,—না—না, আমি তা চাই না। আমি বম্বেতে নেমে যেতে চাই।

মিয়ানী সত্যিই এবার একটু অবাক হলো। বললে,—চাকরিটা কি তোমার ভালো লাগছে না ?

শিশির বলে উঠলো,—কী করে লাগবে ? আমি কি ইচ্ছে করে এসেছি ?

মিয়ানী হঠাৎ কী একটা যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে কানে হেডফোন লাগালো। কী সব লিখতে লাগলো। তারপরে এক সময় ওটা পরা অবস্থাতেই ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলো, বললো,—কী যেন বললে তখন ? ইচ্ছে করে আসো নি ?

সমস্ত চাপা ক্ষোভ আর ব্যথা যেন সামান্য একটু সমবেদনার স্পর্শেই ঝরে পড়তে চায়। শিশির বললে, আমি তো কণ্ট্রাকটরের লোক ছিলাম। আমি—

বাধা দিয়ে মিয়ানী বললে, আই নো। তোমাকে ঢোকানো হয়েছে তদ্বিরের জোরে। নইলে, এভাবে লোক নেওয়া অত সহজ নয়, আজকাল।

—কিন্তু কেন?—শিশির বললে,—আমাকে জোর করে ঢোকানোই বা কেন? বিশ্বাস করো, আমি আসতে চাইনি। সব মিলিয়ে আমার ভীষণ ভয় করছে!

—ভয়ের আবার কী আছে? –মিয়ানী বললে,—কাজ করবে, খাবে দাবে, ঘুরবে।

শিশির ওর মুখের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে। সে যে কাজ জানে না, সে কথা অপরকে বলবেই বা কেমন করে?

মিয়ানী এইবার হেডফোনটা নামিয়ে রেখে ওর দিকে ঝুঁকে বসলো, বললে, শোনো, ক্যাপিতানির সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে, আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না। জাহাজ ফিরে গেলে আমিও ভাবছি ছুটি নেবো, আর ছুটির পর জাহাজে ফিরবো না।

শিশির নিজের আশঙ্কাতেই ভরপুর হয়ে আছে, বললে, - ক্যাপিতানি কেমন লোক? খুব রাগী না?

মিয়ানী বললে, ভীষণ খামখেয়ালী। কখন যে ওর মন ভালো আছে, আর কখন যে রেগে আছে, বোঝা বড়ো মুশকিল।

শিশিরের মনটা আরও দমে গেল।

মিয়ানী বললে, ক্যাপিতানির বউকে দেখেছো? এই ট্রিপেই জাহাজে উঠেছে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে। আলেকজান্দ্রিয়া জানো তো? ইজিপ্টের একটা পোর্ট। আমাদের জাহাজ ওখানে আসছে বলে ক্যাপিতানি নাকি বউকে ও-পোর্টে আসতে তার করে দিয়েছিল। আচ্ছা ভাবো তো, তার করলো, আর আমি জানতে পারলাম না! আমি তো রেডিও-মেসেজ দেবার জন্য বসে আছি! ক্যাপিতানি বলে, বউ নাকি এথেন্স থেকে প্লেনে উড়ে এসেছে। আসতে পারে হয়ত। কিন্তু আমার সব মিলিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হয়। এই সন্দেহের কথা দু-একজনকে বলেছিলাম সত্যি। তাদের কেউ ক্যাপিতানির কানে লাগিয়েছে নিশ্চয়। ব্যস, সেই থেকে চটে গেছে। আগে বউটা আসতো রেডিও-ঘরে, কানে হেডফোন লাগিয়ে খবর শুনতো। আজকাল আর

আসে না। ওকে আসতে দেয় না। কিন্তু আমার সেই সন্দেহের কথাটা শুনতে চাইলে না? আমার সন্দেহ হয়, মেয়েটা আলেকজান্দ্রিয়ারই মেয়ে। হয়ত গ্রীক, ঠিক জানি না। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াতেই থাকতো। ক্যাপিতানির হয়ত রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ওকে ভালো লেগে গেছে, স্রেফ নিয়ে এসে তুললো জাহাজে। রটিয়ে দিলে, 'আমার বিয়ে করা বউ!'

—তুমি জিজ্ঞেস করো নি মেয়েটিকে?

মিয়ানী বললে, করি নি! মেয়েটা কিছুই বলে না, শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে। ও যেন গ্রীক ছাড়া আর কারোর কোনো ভাষা বুঝছে না এমনি ভান করে। আমার ধারণা, আসলে ও পৃথিবীর সব ভাষা শুনলেই বুঝতে পারে।

—বাংলা? বাংলা বোঝে? বেঙ্গলি—

মিয়ানী অবাক হয়ে বললে,—বেঙ্গলি! হোয়াত্ বেঙ্গলি! ইউ মিন্, ইন্দুস্তানি?

—না—না, আমি আমার নিজের ভাষার কথা বলছি। কলকাতার ভাষা।

মিয়ানী বললে, কলকাতার ভাষা কি ইন্দুস্তানি থেকে কিছু অন্যরকম? কই, টের পেলাম না তো? সবাই তো আমার কথা বুঝলো, আমার সঙ্গে ইন্দুস্তানিতেই কথা বললো!

শিশির বললে, কলকাতায় এইবার তুমি প্রথম এলে বুঝি?

—ইয়া।

—কেমন লাগলো কলকাতা?

—ভালো। কলকাতার গার্লস্‌রা আরও ভালো।

—গার্লস!

মিয়ানী বললে,—আওরৎ। আমি হুদিন হুটোকে নিয়ে ঘুরেছিলাম। তার মধ্যে একজন বললে, স্টুডেন্ট। মেয়েটার গায়ের রং তোমার মতোই হবে। তোমার মতোই ফরসা। তবে হ্যাঁ, খুশি করতে জানে। যা বলেছি, তাই শুনেছে।

শিশির মিয়ানীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। লোকটিকে এতক্ষণ তার ভালো লাগছিল, কিন্তু এবার যেন বিজাতীয় একটা ক্রোধ অনুভব করতে লাগলো ওর ওপর। হয়ত কিছু বলে বসতো, এমন সময় যন্ত্রে একটা শব্দ হতেই ও কানে হেডফোন লাগিয়ে কাজে মগ্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে

ক্লাস থেকে শিশির এক সময় উঠেই যাচ্ছিল, মিয়ানী ওর হাত ধরে ওকে টেনে বসিয়ে দিলো। বললে, সিট্ ডাউন। কেউ তোমাকে ডাকছে না।

তারপরে, পেনসিল দিয়ে কাগজে কী লিখে নিলো। বললে,—ওয়েদার রিপোর্ট। সবসময় ওয়েদার রিপোর্ট আসে। এ ছাড়া আর কী!

মিয়ানী ধীরে ধীরে হেডফোনটা নামিয়ে রাখলো। বললে, ইয়ং ম্যান, বিয়ে করেছো?

—না।

মিয়ানী বললে, বিয়ে তো আমিও করি নি। কিন্তু মেয়েমানুষেব না জানি কী? তোমারও অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই?

মুখ লাল করে শিশির বললে,—না।

সত্যিই অবাক হলো মিয়ানী, বললে,-তোমার ক্যালকুভাব গার্লস্‌দের এতো নাম চারদিকে, আর তোমার নিজেরই এসব ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা হয় নি?

শিশির বললে, গার্লস্ বলতে যাদের বোঝাচ্ছো, তারা সব দেশেই আছে। তারা বেশ্যা।

মিয়ানীর চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো, বললে একটা কথা জেনে রাখো। আমার বই পড়ার অভ্যাস আছে। সাহিত্যই বেশি পড়ি। আর ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে আমি ছাত্রই ছিলাম ইতিহাসের। তোমাদের সামাজিক ইতিহাস যে আমার কিছু জানা নেই এমন মনে কোরো না! এই জাহাজের সাধারণ খালাসিদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক, তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ নাও, তাহলে তুমি তোমার আজকের দেশের সঠিক চেহারাটা দেখতে পাবে। দেখো মিষ্টার ক্যর, এটা হবেই। অর্থনৈতিক কারণে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যখন ভাঙতে আরম্ভ করে, তখন এ ঘটনা ঘটবেই। তোমাদের অফিস-পাড়ায় যখন বিকেলবেলা ছুটি হয়, তখন তার কাছাকাছি পার্ক বা রেস্টুরেন্ট মতন কোনো জায়গায় আমাদের জাহাজীরা ভালো জামাটামা পরে গিয়ে জটলা করতে শুরু করে। অফিসের কাজ শেষ করে তোমাদের মেয়েরা এসে দালাল মারফৎ এদের সঙ্গে দেখা করে। বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে—

শিশিরের সারা শরীর যেন জ্বালা করে উঠলো, বললে, থাক শুনতে চাইনা। অফিসের কাজ করে যে মেয়েরা, তাদের মধ্যে ভালোও আছে, খারাপও কিছু থাকতে পারে, খারাপ মেয়েরা—

মিয়ানী বললে, তাদেরও আমি খারাপ বলছি না। খারাপ তারা নয়। অবস্থা গতিকে এ পথ তারা মাঝে মাঝে বেছে নিতে বাধ্য হয় বলে আমার ধারণা। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে বললাম। মেয়েটা স্টুডেণ্ট বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিল, হাতে বইটই পর্যন্ত ছিল, জানি না সে সব লোকদেখানো কিনা। কিন্তু বেশ্যা যে সে নয়, সেটা আমি জোর করে বলতে পারি। অথচ টাকার জন্য কী না সে করলো। ট্যাক্সিতে ঘোরবার পর একটা গলির মধ্যে ছোট্ট একটা হোটেলে আমরা গেলাম। আমার বিকৃত রুচিকে পরিতৃপ্ত করতে টাকার জন্য সে সব কিছুই করলো। হ্যাঁ, আমি জানি, টাকারই জন্য। তোমাদের সমাজে আগে যে কড়াকড়ি ছিল, এখন তা নেই। তার ওপরে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা থাকায় সতীত্বের আর প্রশ্ন আসে কী?

শিশিরের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, সারা কপালটা জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। ঠিক এই সময় ওকে এসে বাঁচালো একজন প্যান্ট্রিবয়। তার ভাষা শিশির বুঝবে না। তাই সে ইঙ্গিতে বোঝালো, স্টুয়ার্ড ডাকছে।

মিয়ানী বললে, যাও। আর তোমার বসা হলো না। সময় পেলেই আসবে। আমার ভাষাচর্চার দ্বিতীয় কোনো লোক নেই। ইংরেজিই বলো আর ইন্দুস্তানিই বলো, তুমি ছাড়া বলবো কার সঙ্গে?

শিশির যেতে যেতেও দরজার কাছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ায় সে তখন বিপর্যস্ত। বলে উঠলো, অথচ, ও-দুটো ভাষাই আমি তেমন জানি না।

—হোয়াট! ইংরেজি তো জানো?

—তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছো! তার ওপরে লিখতে বললেই চমৎকার! লিখতেও তেমন জানি না, টাইপ করতেও তেমন জানি না।

প্যান্ট্রিবয়টা চলে গিয়েছিল। মিয়ানী সবিস্ময়ে ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললে, তুমি জাহাজে এলে রাইটার হয়ে। চিঠিপত্র লেখা আর টাইপ করতেই তো তোমার সব থেকে বেশি দক্ষতা থাকা দরকার!

—নেই। জাহাজ ঠকেছে।

—মানে!

—যা আমি নই, তাই বলে আমাকে জাহাজে ঢোকানো হয়েছে,—শিশির বললে,—একে কি ঠকানো বলে না?

মিয়ানী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্টুয়ার্ডের ঘরে বসে বসে সারাদিনটা হিসেবের কাজ করেই কেটে গেল শিশিরের। নানান খাতা বার করে দিয়েছে তাকে। যাকে বলে 'ষ্টক টেকিং'। স্টুয়ার্ড বিভিন্ন লোককে ডেকে হিসাব নিয়েছে, তারপরে সেই কাগজগুলো দেখিয়ে ওকে অঙ্কগুলো বলে গেছে ইংরেজিতে। একাজে অসুবিধা হয় নি শিশিরের। সময়ে খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে আবার বসেছে স্টুয়ার্ডের ঘরে নিচের তলায়।

আর, কাজ করতে করতে শিশিরের দেখা হয়নি জাহাজের দুপাশে গঙ্গা-তীরের শোভা। সত্যি কথা বলতে কী, আগ্রহও হয়নি শিশিরের। জল দেখতে, কী জানি কেন, শিশিরের ভয় চিরকাল।

সন্ধ্যার কিছু আগে জাহাজ নোঙর করলো সাগরের মোহনায়। ঘণ্টা পড়লো খাবারের। যে যার চানটান করে নিয়ে সুশ্রী হয়ে সেলুনে এলো। ক্যাপ্টেন তার বউ আর পাইলটকে নিয়ে ভিন্ন এক টেবিলে বসলো। বউটি খাওয়াদাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল। গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা একরকম স্কার্ট পরে মেম-সাহেবরা। ক্যাপ্টেনের বউও তাই পরেছে। মিয়ানী বসেছিল শিশিরের ঠিক সামনে। বললে, আজকে স্পেশাল মেনু আছে, অক্স-টং—ষাঁড়ের জিভ। খাবে নাকি ?

যেন সঙ্গে সঙ্গে বমি ঠেলে আসতে চায় শিশিরের গলায়। তাকে জিনিসটা দেওয়া না হলেও সে পরে আর কিছু খেতেই পারলো না বলা চলে। কুকদের মিয়ানী তাদের ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, ইন্দিকে মাছমাংসের ব্যাপারে কিছু না জিজ্ঞাসা করে কখনো পাতে দিয়ো না।

যাই হোক, খাওয়ার পালা শেষ হতে না হতেই ক্যাপটেন উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত মাথার ওপরে তুলে গ্রীক ভাষায় কী যেন বললে। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা সেলুন জুড়ে যেন একটা খুশির ঢেউ বয়ে গেল। হাততালি দিয়ে উঠলো ওরা। আর তারপরেই যে যার ঘরের দিকে ছুটলো। কুকরা টেবিল থেকে প্লেট-টেটগুলো সরাতে লাগলো তাড়াতাড়ি। ক্যাপটেন গিয়ে বসলো পাইলটের কাছে একটা চেয়ারে। পাইলটটি সম্ভবত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। অদ্ভুত গায়ের

রং-টং দেখে তাই মনে হয়। একে শিশির আগে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়লো না। শিশির ধীরে সুস্থে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন তাকে কাছে ডাকলো—হে ইউ ?

শিশির কাছে গিয়ে সেলাম করলো তাড়াতাড়ি।

ক্যাপ্টেন মাথার ওপরে আঙুল তুলে দেখালো, বললে,—গো। মাদাম ওয়ান্‌ত্‌স্‌।

বেরিয়ে যাচ্ছিল শিশির, পিছন থেকে ক্যাপ্টেন আবার তাকে ডেকে বললে, হে ইন্দি ? দোন্‌ত্‌ কিস্‌ হার। সি মাই ওয়াইফ।

শিশির বুঝে গেছে, এটা ক্যাপ্টেনের নিছক রসিকতা। তবু তার মুখটা লাল হয়ে উঠলো আবার। সে মুখ নিচু করে বেরিয়ে গেল, পিছন থেকে শোনা গেল ওদের দুজনের সম্মিলিত হাসি।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে এলো শিশির। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকে ওর যেন পা আর চলতে চায় না। ঘরে কেউ ছিল না, পাশের ঘরের পর্দা ফেলা। সে কী করে হুট্‌ করে ঢুকে পড়ে ? পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে সে একটু কাশলো, আস্তে ডাকলো, ম্যাডাম ?

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডামের হাতখানা পর্দা সরিয়ে দিলো। ওকে দেখলো সে, মুখখানা খুশি-খুশি দেখালো। তারপরে ইঙ্গিতে ওকে ভিতরে আসতে বললো। মেমসাহেব একটা দামী সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর পরবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল 'না। তার ঊর্ধ্বাঙ্গে শাড়ির আঁচলটা বিছানো আছে, কোমরে শাড়ির প্রান্তও জড়ানো। কিন্তু তারপর ?

শিশিরের মনটা মুহূর্তে উন্মনা হয়ে গেল। হরিশ মুখুজ্যে রোডের বাড়িতে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সে কাপড় পরিয়ে দিতো মাঝে মাঝে। পুজো-আর্চার দিনে, কি কোনো অনুষ্ঠানের সময়, ছেলেমেয়েরা আর কারও কাছে আমল না পেয়ে তারই কাছে আসতো সব ভিড় করে।

ম্যাডাম কী যেন একটা বললো। তারপরে নিজেকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগলো, অর্থাৎ পরিয়ে দাও কাপড়।

শিশিরের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। একবার মনে হলো তার হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু ম্যাডাম তাকে বারবার ইঙ্গিত করতে লাগলো অসহিষ্ণু হয়ে।

অগত্যা সে গায়ে হাত দিলো ম্যাডামের। হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে সে শাড়ির

প্রান্তটা ম্যাডামের কোমরে ভালো করে বাঁধতে গেল। শাড়ির নিচে সায়া থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু এ-মহিলা ছোট একটা ইজের পরে রয়েছে মাত্র। তাড়াতাড়ি শাড়িটা কোমরে এঁটে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো শিশির। তারপরে যেমন করে ঘুরিয়ে পরাবার নিয়ম, সেইভাবে আঁচলটা ধরে টান দিতেই ম্যাডাম তাড়াতাড়ি আঁচলটা বুকের ওপর জোর করে টেনে রাখলো। ম্যাডামের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি, চোখদুটো যেন জ্বল জ্বল করছে।

আর তারপরেই ঘটলো অদ্ভুত কাণ্ড। ম্যাডাম হঠাৎ তার পরিচিত ভাষায় কথা বলে উঠলো। বললে, আভি তুম যাও। যব বুলায়েগা, তব আয়েগা।

যদিও বলার ভঙ্গিতে যথেষ্ট জড়তা আছে, তবু এমনভাবে হিন্দী বলায় শিশির অবাক না হয়ে পারলো না।

তাকে আবার অমন করে তাকাতে দেখে মেয়েটি বললে, হাম হিন্দুস্তানি জানতা হায়, কিসিকো মৎ বোলো, হাঁ?

শিশির অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, আপ—আপ গ্রীক নেহি?

মেয়েটি তেমনি জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ একটু হাসলো। হঠাৎ-ই দেখা গেল মুহূর্তের জন্য সেই ডালিমদানার মতো ছোট ছোট দাঁতের সারি। মেয়েটি বললে, ম্যয় গ্রীকভি হুঁ, ইজিপ্‌সিয়ানভি হুঁ। হমারা ড্যাড গ্রীক থা, সম্‌ঝে? যাও, আভি ক্যাপিতানি আয়েগা।

শিশির তবু দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মতো, মিয়ানীর কথাগুলো ভিড় করে তার কানের কাছে বাজতে লাগলো। মেয়েটি কি সত্যিই তাহলে—

ম্যাডাম বললে, ম্যয় বহুৎ খুপসুরত্‌—ঠিক না?

ঠোঁটের কোণে আবার সেই বিচিত্র হাসি। চোখে আবার সেই অস্বাভাবিক দীপ্তি। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো পিছন ফিরে। সমস্ত পিঠটা খালি। ক্রমাগত বক্ষ-বন্ধনী ব্যবহার করার ফলে পিঠে একটা শুভ্ররেখার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এখন কোনো বন্ধনী নেই। ম্যাডাম সামান্য একটু তার দিকে বেঁকে দাঁড়ালো। এমনভাবে দাঁড়ালো, যাতে বাহুর ফাঁক দিয়ে নিটোল স্তনাগ্রচূড়ার কিছু আভাষ মেলে। কানদুটো সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠলো শিশিরের। ম্যাডাম তখনো বলছে ফিসফিস-করা গলায়, আভি যাও।

শিশির পর্দা ঠেলে তাড়াতাড়ি বাইরে এলো। এঘর তখনো খালি। বাইরে এলো শিশির। তারায় ভরা কালো আকাশটার দিকে তাকালো। আকাশ,

আর জলরাশি যেন একাকার হয়ে গেছে। কোথাও কোনো ঢেউ নেই, নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যে সমস্ত পরিবেশটা থমথম করছে।

হঠাৎ কে যেন এগিয়ে এসে ধরলো হাত। ও চমকে উঠেই দেখলো, মিয়ানী। মিয়ানী চুপিচুপি বললে, আমার ঘরে এসো। ক্যাপিতানি ওপরে আসছে, পায়ের শব্দ পাচ্ছো না?

তাড়াতাড়ি মিয়ানীর সঙ্গে রেডিও-ঘরে চলে এলো শিশির। মিয়ানী ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। তারপরে হিন্দী-ইংরেজি মিশিয়ে যেমন করে সে বোঝায়, তেমনি করে বলতে লাগলো, আজ 'ফ্যান্সি-ড্রেস বল' হবে, সবাই মহা উৎসাহে সাজতে গেছে। সারারাত হৈ হৈ হবে। কাল ভোরে পাইলট বিদায় নেবে, আর আমাদেরও প্রকৃত যাত্রা শুরু হবে। তাই, পানীয়ের বন্যা বইবে আজ। তুমি বুঝি ম্যাডামকে সাজাতে গিয়েছিলে?

শিশির বললে, শাড়ি পরাতে।

—শাড়ি? —ভ্রূ কুঁচকে উঠলো মিয়ানীর।

তারপরে হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, —তোমার কোনো 'লেডি-লাভ' আছে?

চমকে উঠলো শিশির, বলতে গেল, 'মানে?' কিন্তু মুখে কোনো কথা ফুটলো না। মিয়ানী ওর হাতের চাপ আরও একটু শক্ত করলো, বলতে লাগলো, তার দোহাই দিয়ে বলছি, পারো তো তার কথা দিনরাত চিন্তা করো। নইলে পারবে না—পারবে না ঐ মেয়েমানুষটার হাত থেকে বাঁচতে! ও সর্বনাশী!

বলতে বলতে দুহাতে মাথার দুটি পাশ টিপে ধরে ধপ করে বসে পড়লো মিয়ানী। শিশিরের বুদ্ধি বৃত্তি অত প্রখর তখনো হয়নি। নইলে মিয়ানীর ভাবভঙ্গি আর উক্তির মধ্য দিয়ে আরও একটা সত্যের আভাস সে পেতে পারতো! সে সত্য আর কিছুই নয়। মিয়ানীকে নিয়ে 'সর্বনাশী'র কোনো ক্ষণিকের লীলাবৃত্তি! হয়ত সেইজন্যই ক্যাপিতানি ওর ওপরে চটা, কে বলতে পারে?

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। শিশির ভাবছিল, সে আর কোনোদিকে তাকাবে না, কোথাও যাবে না, সোজা নিজের ঘরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়বে। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই বাধা পড়লো। মিয়ানী টানলো ওর হাত ধরে। বললে, —শোনো, তুমি রাইটার হয়ে এসেছো, কাজ জানো না এটা ধরা

পড়লে বিপদ আছে। ক্যাপিতানি রেগে গেলে জানোয়ার হয়ে দাঁড়ায়। এটা ঢেকে দিতে পারে ঐ ম্যাডাম। সেজন্য ম্যাডাম যদি তোমার ওপর খুশি থাকে, তাহলে তোমার সব অপরাধের মাপ হয়ে যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ম্যাডামকে খুশি করা কি অতই সহজ? তুমি দেখতে ছেলেমানুষ, তার ওপরে অবিবাহিত, অর্থাৎ মেয়েদের দেহ সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, এসব আবার মেয়েরাই বুঝতে পারে চট্ করে। নইলে তোমার ওপর এতো খুশি-খুশি ভাব এলো কী করে? কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, তুমি ওর যত কাছে যাবে তত মরবে। তত সর্বনাশ হবে। আমি ছিট্কে সরে এসেছি বলে আমার ওপর রাগ কি কম?

—তুমি কি ওর সঙ্গে—

—হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতো—মিয়ানী বললে, —আমি তোমাকে বলেছি, সাহিত্য আর ইতিহাসের আমি একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম। জাহাজে বই পড়েই আমার দিন কাটতো। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি তোমাদের ইন্ডিয়ানদের মতোই কখনো মদ ছুঁতাম না। আমি সাইপ্রিয়ট, ধর্মে ক্যাথলিক, ওসব ছাই-পাঁশ খাওয়া আমাদের রীতিও নয়। সেই আমাকে ঐ সর্বনাশী ধীরে ধীরে কাছে টানতে লাগলো, আমার অজ্ঞাতেই আমাকে অদৃশ্য সাপের মতো পাকে পাকে জড়াতে লাগলো। সেসব এক একটি দিনের কথা যদি বলি, তো তুমি শুনলে পাগল হয়ে যাবে! রাত্রে, আমাকে ডেকে ডিউটিতে বসিয়ে দিয়ে ক্যাপিতানি নিজে মদে চুর হয়ে ঘরে গিয়ে নির্জীবের মতো শুয়ে পড়েছে। আর, সর্বনাশী একা ঘুরছে ডেকে—এই তারায় ভরা কালো আকাশটার তলায় —প্রায় নিরাবরণ হয়ে। সত্যিই ছবি আঁকার মতো চেহারা, এরকম দৈহিক সুগঠন খুব কম দেখা যায়। কিন্তু আমি কি আর্টিষ্ট্? আমি এগিয়ে গিয়ে ধমক দিতাম। তা, নির্লজ্জার মতো কী উত্তর দিতো জানো? বলতো, ক্যাপিতানি আমাকে মদ খাইয়েছে, সারা শরীর আমার জ্বলছে। কী করবো বলো? তাই বাইরে এসেছি হাওয়ায়।

মিয়ানী চুপ করলো। বললো, —না, এসব কথা তোমাকে বেশি বলবো না। শুধু বলবো যত পারবে ওকে এড়িয়ে চলবে। তখন, তোমার কাজ নিয়ে ক্যাপিতানি তোমাকে শাসন করবে, এই তো? বেশ, আমি তোমাকে কথা দিলাম, যতদিন তুমি জাহাজে আছো, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার সব চিঠিপত্র লিখে দেবো। শুধু টাইপটা করে নিয়ো নিজে। কেমন?

—কিন্তু আমি যে টাইপও জানি না।

মিয়ানী বললে, একেবারেই না ?

শিশির বললে, দু আঙুলে কোনরকমে—তাতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

মিয়ানী বললে, ব্যস, এই তো কাজ পেলে! যখনই সময় পাবে ঘর বন্ধ করে টাইপ করে যাবে। আমি রেওয়াজ করার নিয়মটা শিখিয়ে দেবো। সেইমতো অভ্যাস করলে দেখতে দেখতে স্পিড উঠে যাবে।

শিশিরের বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল। যাক, একদিক দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হলো। খাটতে তার আপত্তি নেই, অনিচ্ছাও নেই, কিন্তু কাজ শেখার বা করার ধারাটা জানা চাই তো ?

শিশির মিয়ানীর হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলো। সারা অন্তর তার সত্যিই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে এই মানুষটির কাছে।

মিয়ানী বললে, শুধু একটি সর্তে। সর্বনাশীর পাল্লায় পড়বে না।

—ডাকলেও যাবো না ?

—ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে যাবে না ?—মিয়ানী বললে, যাবে, কিন্তু খপ্পরে পড়বে না। সবই মনের ব্যাপার। কাঁচা বয়স তোমার, সাধ্য কি, ঐ আগুনের মতো রূপের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে ? একটি মাত্র উপায়, যখনই ফাঁকা থাকবে মন, তখনই তোমার 'লেডি-লাভ'-এর কথা চিন্তা করবে। তুমি ইন্দিয়ান, তোমাদের প্রেম তো হয় গভীর, স্বর্গীয়। এ রকম কোনো কিছু কি নেই তোমার জীবনে ?

শিশিরের চোখের কোণ দুটি ছলছল করে উঠলো। সমব্যথীর কাছে সে হয়ত বলেই ফেলতো অনেক কিছু, কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিলো। বললে, মনে মনে একজনকে আমি—

মিয়ানীর চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, ব্যস—ব্যস, আর কিছু চাই না। ওকেই মনে মনে চিন্তা করবে। সর্বনাশীর ছায়া ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। কী ? সেটা ডিভাইন লভ্ তো ?

শিশির মুখ নিচু করে নীরবেই মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

আর, তারপরেই চলে এলো নিচে, নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে। সেলুনে নাচের রেকর্ড বাজছে। 'ফ্যান্সি ড্রেস বল' বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। কিম্ভুত সাজে সব তালে তালে গিয়ে নাচছে হয়ত। শাড়ি পরে ক্যাপ্টেনের বউও গেছে নিশ্চয়। একবার মনে হলো, গিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে শাসন করলো। মিয়ানীর কথামতো টাইপ-রাইটার টেনে নিয়ে কাগজ পরিয়ে ইচ্ছামতো টাইপ করতে লাগলো। কখনো এম। অর্থাৎ অনেকগুলো 'এম' একসঙ্গে। কখনো সি। কখনো এস্। এস্টা পরপর বসিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে গেল। এস্-এ শিশিরও হয়, সুষমাও হয়। আশ্চর্য, এই অভিনব মিলের কথাটা তার তো এতদিন জানা ছিল না!

সব ঠেলে ফেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে শিশির একেবারে শুয়ে পড়লো। নাচের বাজনা এখনো শোনা যাচ্ছে। শিশিরের কাছের দেওয়ালে যে পোর্টহোলটা আছে, তার মধ্য দিয়ে সে দেখতে পেলো অগাধ জলরাশি স্থির হয়ে আছে পরম প্রশান্তিতে। তেমন একটু ঢেউ পর্যন্ত নেই। নদী যেখানে সমুদ্রে এসে মেশে, সেখানে কি কোনো বিক্ষোভ, কোনো তরঙ্গই থাকে না?

এ যাবৎ শিশির পারতপক্ষে জলের দিকে তাকাতো না, চলতে ফিরতে ওদিকে চোখ গেলে জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিতো। কিন্তু এখন তাকাতে গিয়ে শিশিরের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। বোধহয় চাঁদ উঠছে, একটা অস্পষ্ট বিভা মেঘের ফাঁক দিয়ে দিগন্তবিলীন প্রশান্ত জলরাশির ওপরে বিচ্ছুরিত হয়ে এসে পড়েছে। দিগন্তরেখায় পুঞ্জীভূত অন্ধকার, আর তার সম্মুখভাগে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার সঙ্গোপন লীলা, এ দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আবার বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকের ভিতরটা ভয়ে দুরু দুরু করে ওঠে। মনে হয় আমিও বুঝি ঐ অভাবনীয় অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার কোনো শরিক।

শিশির জোর করে ওদিক থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পাশ ফিরে শুলো। ভীষণ পুরু আর নরম গদির ওপর বিছানাটা। শরীর এলিয়ে দিলে মনে হয়, যেন ডুবে গেলাম।

তখনো রেকর্ড শোনা যায়। এবার বোধহয় গান বাজাচ্ছে। সরু মেয়েলী গলায় কে যেন প্রাণপণে চিৎকার করছে মনে হয়। শুনতে শুনতে চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে মাত্র, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। চীফ কুক স্বয়ং। দরজা খুলতেই বললে, ক্যাপিতানি—

চীফ কুকের পা টলছে রীতিমত। সে গলিপথ দিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির কাছে চলে গেল। শিশির আর দেরি না করে তখুনি গেল। সেলুনে অটোমেটিক রেডিওগ্রামে একটার পর একটা রেকর্ড বেজে চলেছে আপনা-আপনি, সেলুনে উৎসব-ক্লান্তির বিশৃঙ্খল চিত্র। পাইলট

টেবিলে পা তুলে দিয়ে মাথা কাত করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সেলুনের মেঝেতে চীফ্ স্টুয়ার্ড। আর ক্যাপ্টেন তার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। লাইটারটা সিগারেটের কাছে আনতে গিয়ে বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন মাথায় একটা কাগজের টুপি পরেছে মাত্র। পাইলটও তাই। কিন্তু চীফ্ স্টুয়ার্ডের গা খালি। রোমান কায়দায় চাদর বেঁধে ছিল, সেটার কোণ খুলে গিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। ক্যাপ্টেনের সামনে বোতল গ্লাস অপেক্ষমান, এখনো তার সে পালা ফুরোয় নি বোঝা যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার খেয়াল হলো, বললে,—হে ইন্দি, নো দান্স, হোয়াই? মাদাম অ্যাংগ্রি। গো।

শিশির দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্যাপ্টেন সিগারেট ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর রেগে গিয়ে সিগারেটটাই ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বোতলটা কাত করে গেলাসে ঢালতে পর্যন্ত পারছে না। শিশির ঢেলে দিলো। বিশ্রী মদের গন্ধ তার নাকে এলো। মুন্সিজী কি ইশাকের মুখে মাঝে মাঝে এরকম গন্ধ পেতো সে। ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে বললে, ইউ ড্রিংক্ এ লিত্ল।

শিশির বললে, আই-নো-ড্রিংক্।

—হোয়াট্?—ক্যাপ্টেন বললে, ড্রিংক্ অ্যাণ্ড গো আপ।

শিশির তবু খেলো না। ক্যাপ্টেন এক চুমুকে সবটা শেষ করে বললে, অল রাইত্,—অল রাইত্। গো আপ অ্যাণ্ড হেল্প্ হার তু ড্রেস্।

শিশির আস্তে আস্তে ওপরে গেল। প্রথমেই গেল রেডিও ঘরের দিকে। ঘরে আলো জলছে না, ঘর বন্ধও বটে।

—কিধর থা?

লাইফবোটের কাছ থেকে অন্ধকারের একটি রেখা যেন হঠাৎ কথা করে উঠলো।

চমকে উঠলো শিশির। মুক্ত আকাশের নিচে—অস্ফুট জ্যোৎস্নার স্পর্শে কণ্টকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসংকোচে প্রায় লজ্জাহীনা এক নারী। মিয়ানী ঠিকই বলেছিল, আমি আর্টিষ্ট নই, কিন্তু আর্টিষ্টের চোখে দেখবার মতো দেহরেখা বটে।

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো নারী। তাকে তখুনি গ্রাস করলো না, শিকারকে নিয়ে হিংস্র পশু যেমন করে খেলা করে, একটু থাবা দেয়,

একটু নখাঘাত, একটু রুধির,—ঠিক তেমনি করে এসে তার সামনে দাঁড়ালো। ভাবটা এই, আমাকে দেখুক আর ক্ষতবিক্ষত হোক।

অস্ফুট, ভীতস্বরে শিশির বললে, ক্যাপিতানি—

—হি নোজ,—সর্বনাশী বললে,—সে আমাকে মদ খাওয়ায়, তাব আমি যেন পাগল হয়ে যাই! আমাকে পাগল করাতেই চায়।

—আপনি তো ওব বউ?

বললে, না। আমি ওব সঙ্গে এসেছি, জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া পৌছলেই নেমে যাবো। আলেকজান্দ্রিয়া টু আলেকজান্দ্রিয়া, এই আমার সঙ্গে কনট্র্যাক্ট।

শিশিব স্তম্ভিত। বললে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

'সর্বনাশী' কিছু না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

শিশিব বললে, আমি লেখাপড়া জানি না—আমাদেব বাড়ি আপনি গিয়েছিলেন—আমি ও বাড়িব চাকব ছাড়া আব কিছু নয়।

বলতে বলতে শিশির যেন জলে-ডোবা মানুষের মতো বলে উঠলো, আমাকে ছেড়ে দিন। ক্যাপিতানি দেখলে কী বলবে?

মেয়েটি বললে,—তোমাকে কী আমি ধরে রেখেছি? যাওনা।—কোথায় যাবে।

শিশিব তাড়া-খাওয়া জন্তুব মতো ওব কাছ থেকে পালিয়ে এলো। দুর্দাড করে নিজেব ঘরেই আবাব। একেবাবে বিছানায়। ছোটবেলা থেকেই পরের বাড়িতে সে মানুষ। সত্যিকার স্নেহ-ভালবাসার জন্য মনটা তার কাঙাল হয়ে থাকে অনুক্ষণ। সেখানে কামনাব সঙ্গী ছাড়া মেয়েটি তাব মধ্যে আব কিছু খুঁজে পেলো না?

সারাবাত জাহাজটা মোহনায় স্থিব হয়ে রইলো, আব সাবাবাত আধো-ঘুমে আধো-জাগবণে বিছানায় ছট্‌ফট্ কবতে লাগলো শিশিব। পাপ তাকে ডাকছে। শরীরটা পতঙ্গের মতো সেই প্রজ্বলিত শিখার দিকে ছুটে যেতে চায়, তবু তাকে বেঁধে রাখতে হবে। এতে তার বিপদ হবে, মেয়েটা ক্যাপ্টেনকে তার বিরুদ্ধে বাগিয়ে দেবে, তবু তাব আর উপায় নেই। কাজে তাকে সাহায্য করবে মিয়ানী, সে শুধু বসে বসে একমনে টাইপ করবে।

তবু ঘুরে ফিরে সেই আশ্চর্য দেহটার কথাই মনে পড়ছে।

হঠাৎ মনে হলো, মিয়ানী তো তাকে এর থেকে মুক্তিব পথ বলে দিয়েছে।

ভাবো বসে বসে তোমার প্রিয়াকে। শিশিরের মন যেন এক নিষিদ্ধ কূল থেকে আর এক নিষিদ্ধ কূলের দিকে প্রবাহিত হতে লাগলো। বারবার ভাবতে লাগলো সে সুষমার মুখখানি। সে ও-বাড়ির কে, আর সুষমা ও-বাড়ির কে? এসব সে মুহূর্তে ভুলে গিয়ে এক অসাধ্য সাধনায় ডুবে যেতে লাগলো। তাকে পালাতে হবে 'সর্বনাশী'র হাত থেকে, তাই সে ব্যাধভীত পাখিটির মতো উপায়ান্তরবিহীন হয়ে সুষমার স্নেহ-ক্রোড়ের ওপর গিয়ে যেন মুখ থুবড়ে পড়লো।

ভোর হলো। প্রাতঃরাশের পালাও শেষ হলো। পাইলট আরও একটু তাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পাইলট-লঞ্চের নিশানাটুকু।

অন্যদিকে মুখ ফেরালো শিশির। এরই নাম—সমুদ্র। জাহাজ এইবার অল্প অল্প দুলছে। অগাধ জলরাশির বুকে ছোট ছোট ঢেউ খেলা করছে। রেলিং-এ গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই শিশিরের, সে পোর্টহোল দিয়ে চুপিচুপি দেখতে থাকে।

মিয়ানী আসে, ওকে টাইপ শেখার নিয়ম বলে দেয়। জাহাজের কতগুলি জিনিস টুকে রাখবার জন্য এক লগবুক দিয়েছিল ক্যাপ্টেন। এ কাজটা করতে তার অসুবিধা হলো না। কারণ, এ ধরণের কাজ সে ও-বাড়িতে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাকি সময়ে নিজের মনটাকে আটকে রাখবার জন্য যখন সে পারে তখনই টাইপ করে। ক্যাপিতানি আর কাজের জন্য ডাকেনি। ডাকতো চীফ স্টুয়ার্ড। তার হিসেবগুলো অঙ্কে লিখে টাইপ করে দিতে হবে। একাজেও শিশিরের অসুবিধা হলো না। আর স্টুয়ার্ডের হিসেব টাইপ করতে দুঘণ্টার জায়গায় চারঘণ্টা লাগলেও সে কিছু বলবে না।

চলতে লাগলো জাহাজ। এরা বললে, বে অফ বেঙ্গল এত শান্ত কখনো দেখা যায় না। কখনো কখনো দূর থেকে সী-গাল পাখিগুলো চোখে পড়ে। সাদা ডানা মেলে চক্রাকারে জলের কাছ ঘেঁষে উড়ছে। এর থেকে বোঝা যায় ডাঙা দূরে নয়। দেখা যায় তীর, তবু সী-গাল পাখিগুলোকে দেখে ডাঙা যে কাছেই আছে, এটা বুঝেই সবার মন খুশিতে ভরপুর হয়ে যায়।

কয়েকটা দিন কাটলো। পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরুতো না বলে মেমকে সে দেখতেই পেতো না। আর তাকে ডাকেওনি সে। এমন কি ক্যাপ্টেনও না। তার ওপর রেগেটেগে যায়নি তো? শিশির হাসলো, আর কটা দিন?

কলম্বোতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকা হলো। শিপিং অফিসের ব্যাপার-ট্যাপার মিয়ানীই তার সঙ্গে গিয়ে মিটিয়ে দিলো। করণীয় যা কিছু, সব সে শিখিয়ে দিলো ওকে। হারবার মাষ্টারকে যে চিঠিপত্র দিতে হয়, তার বয়ান লিখে দিয়েছিল মিয়ানী, সেগুলো টাইপ করে ক্যাপ্টেনকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলো না তার অপারগতা। কলম্বো থেকে একটানা ছোটার পালা, একেবারে বম্বে। এখানকার কাজ কলম্বোর মতোই। সে একাই গিয়ে করে আসবে। চিঠির বয়ানও একরকম। কোনো অসুবিধা হবে না। এইবার হবে তার মুক্তি। এইখান থেকেই তার কাছে চিঠি লেখে যদি শিশির? কিন্তু কী লিখবে? নিজের মুখেই সে বলেছে, আর কখনো আমার সামনে এসো না।

সুষমার জীবনের বিশেষ অধ্যায়ের যেটুকু আভাস সে পেয়েছিল, তার বাকিটুকু তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল মুন্সিজী। বলেছিল বসন্তবাবুর কথা। শিশির নিশ্চয় দেখা করবে বসন্তবাবুর সঙ্গে, এই বম্বেতে। কোম্পানীর নাম জানা আছে, টেলিফোন-ডাইরেক্টরি এজেন্টের অফিস থেকে নিয়ে তার মধ্য থেকে ঠিকানা বার করতে কতক্ষণ? তারপরে সে ট্রেনে ফিরবে কলকাতা। টাকা যথেষ্টই পাবে। বাচ্চাদের জন্য অনেক কিছু নেবে, আর নেবে সুষমার জন্য একটি দামী শাড়ি। এতে যে যা মনে করবার, করুক। তার জীবনের মাস্তুল সে যেন দেখতে পেয়েছে। ভোগের পথে নয়, ত্যাগের পথেই এ মাস্তুলের স্বর্ণচূড়াটা জলজল করে চোখে পড়ে।

আমার একটা 'মন' আছে, স্নেহ-বুভুক্ষু কাঙাল মন। সে তোমার আর বসন্তের যুগ্ম-জীবনের সুখ থেকেই পরম সুখ পাবে। তোমার খুশিভরা উজ্জ্বল মুখখানাই হোক আমার ধ্রুবতারা। আমি বারবার আমার কল্পনার আকাশে তাকে প্রত্যক্ষ করবো, সেটাই আমার পরম শান্তি।

অবশেষে জাহাজ সত্যিই পৌঁছলো গিয়ে বম্বেতে। শিশির প্রথমেই সেরে নিলো তার কাজ। এজেন্টের অফিসে গেল, জাহাজের করণীয় কাজগুলো করলো, এমন কি টেলিফোন-ডাইরেক্টরি খুঁজে বি-কে হালদার কোম্পানীর ঠিকানা বের করে টুকে নিতে ভুল করলো না। তারপরে জাহাজে ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। হাতে একরাশ টাকাও পেলো সে, যা সে আশা করেছিল তার থেকে অনেক—অনেক বেশি। এবার জাহাজ থেকে

নেমে গেলেই হয়। নাকি না হয় সে বাইরে থাবে। গেল সে ক্যাপ্টেনের ঘরে। ক্যাপ্টেন বললে, তোমার পেমেন্ট পেয়েছো?

—হ্যাঁ।

তার আবির্ভাব অনুভব করেই সম্ভবত ম্যাডাম ঘরে এলো পর্দা সরিয়ে। সে যেন ওর কোন কথা বোঝে না এমন ভান করলো। ক্যাপিতানি তাকে বললে শিশিরের চলে যাওয়ার কথা। ম্যাডাম তখন তাকালো শিশিরের দিকে। ক্যাপিতানি বললো, আসল পার্সার পৌঁছলেই ও চলে যাবে।

—কিন্তু কোথায় পার্সার?

—আজকালের মধ্যেই এসে পড়বে,—ক্যাপ্টেন ওকে বললে,—যাও শহরে গিয়ে একটু ঘুরে-টুরে এসো।

শিশির বললে,—না। একেবারে আসল পার্সার এলেই যাবো।

কিন্তু কোথায় আসল পার্সার? পরের দিনই কলকাতার এজেন্ট অফিস থেকে তার এলো। পার্সার মারা গেছে। অতএব—

—লেত্ হিম কন্‌তিনিউ।

কথাটা শুনে বাঁকা হাসি ফুটলো 'সর্বনাশী'র ঠোঁটের কোণে।

বম্বেতে দিন কয়েক রইলো জাহাজ। তার সঙ্গে মিলিয়ে বম্বেতে শিশিরের কাজও বাড়লো। কাজে কোনো অসুবিধা হলো না। যেটুকু প্রভৃতি চিঠিপত্রের কাজ ছিল, তা বুঝে নিলো মিয়ানীর কাছ থেকে। টাইপে ততদিনে অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল শিশির। এ ছাড়া স্টুয়ার্ডের কাজ ছিল গাদাখানেক। তারই ফাঁকে কলকাতায় একসময় চিঠি দিলো শিশির। কাকে আর? যাকে দিতে মন চায়, তাকে কি দেওয়া চলবে? চিঠি ঐ বড়োবাবু-মেজোবাবু-সেজোবাবুর জন্য। আমার এ কী করলেন? আমি বাড়ি যাবো কবে? এখানে আমার মন টিকছে না, যদিও কাজকর্মের ব্যাপার আপনাদের আশীর্বাদে কিছু আটকায় নি।

কিন্তু কোনো উত্তর আসার আগেই জাহাজ তাকে তার তীরভূমি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এগিয়ে চললো আরব সাগর পাড়ি দিয়ে। এখান থেকে রেলিং-এ এসে দাঁড়ানো অভ্যাস করলো শিশির। ঘরে বসে টাইপ ছাড়াও জিজ্ঞাসাদি পড়তো সে। আর জাহাজের চিঠিপত্রের ফাইলে চোখ বুলাতো। কাজে এখন তার আর ভয় করে না। অনেকটাই শিখে গেছে।

তবে আজকাল আর আসে না প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ ওপর থেকে। তবু সেই

পাপের অন্ধকার-চুম্বক থেকে নিজের মনটাকে প্রানপণে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করে শিশির, দিগন্তের দিকে অসীম আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। দেখা কি যায় সেই জাহাজের মাস্তুল, যা তার মানসলোকে তিল তিল করে দিনে দিনে গড়ে উঠছে?

অসীম তৃষ্ণা নিয়ে দিগন্তে দৃকপাত করে শিশির। মনে পড়ে সেই তটরেখা, সেই গঙ্গার স্রোতাবর্ত, সেই স্টিমার আর লঞ্চের ছোট ছোট ঢেউ। আর সেই এসপ্লানেড মুরিং-এ নিঃসঙ্গ ক্যাপ্‌সটানটার ওপর চুপচাপ বসে থাকা, আর মনে পড়ে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকা, কখন না জানি ভাগ্যের আকাশে দেখা দেবে মাস্তুল।

জাহাজের যে পাশটা জেটির দিকে থাকে, তার একটা নাম আছে। আর যে পাশটা জলের দিকে থাকে, তারও আছে একটা নাম। এই শেষোক্ত নামটি হলো 'স্টারবোর্ড সাইড।' স্টারবোর্ড নামটি কিন্তু বড়ো সুন্দর লাগে শিশিরের কাছে। যে 'বোর্ড' বা পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে 'স্টার' বা 'তারা' দেখা যায়, তারই নাম 'স্টারবোর্ড'।

সে সাঁতার জানে না, জলে ওর ভয়ানক ভয় চিরকাল, সেই মানুষ জলের ওপর দিয়ে চলেছে আঠারো দিন। আজকাল আর রেলিং ধরে দাঁড়াতে ওর ভয় করে না, সময় পেলেই তারার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় সে। বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশের কোণে, আর তার অনুগত তারাটি ঠিক ফুটে রয়েছে কাছাকাছি। আর যখন চাঁদ উঠে না, তখন আকাশের রূপ আরও অদ্ভুত লাগে তার কাছে। তারায় তারায় আকাশটা ভরে যায়। কোনো কোনো উজ্জ্বল তারা থেকে আলো এসে ঠিকরে পড়ে জলের ওপর। সেই আলো এসে ছুঁয়ে থাকে জাহাজের কিনারা পর্যন্ত। একটা আলোর রেখা টেনে দিয়েছে কে যেন সুদূর অনন্ত থেকে। অভিযাত্রী পথিক যেন সেই পথ ধরে অনায়াসে চলে আসতে পারে, তাদের কাছে।

জিজ্ঞাসা করতে পারে কেমন আছো?

চুপচাপ একা কতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল কে জানে, হঠাৎ ওপরে কী একটা শব্দ হতেই মুখ তুললো শিশির। পাতলা একটা ড্রেসিং গাউন পরা ক্যাপ্টেনের বউ। তাকে দেখে নিচে নেমে এলো। ফিসফিস করে হিন্দীতে বললো,—এতো রাত হয়ে গেল, শোওনি যে?

শিশির বললে, হিন্দী জানেন, অথচ কাউকে সেটা জানতে দেন না কেন?

মেয়েটি বললে, তাতে ক্ষতি আছে। আমি যে ইজিপ্সিয়ান। একথা কেউ কি জানে? সবাই জানে গ্রীক ক্যাপ্টেনের ঘরনী, আমি গ্রীক।

শিশিরের বলতে ইচ্ছা করছিল, তুমি যে ক্যাপ্টেনের আসল বিয়ে করা বউ নও, সেটা জাহাজের কে না জানে? অথচ সেটা তারা অপরকে চট্ করে জানতে দেয় না। না-জানার ভান করে পড়ে আছে।

কিন্তু কথাটা সে বলতে পারলো না। সে জাহাজের সামান্য রাইটার, তা-ও নতুন। এ অবস্থায় ক্যাপ্টেনের কাছে তার নামে কেউ যদি সাতখানা করে লাগিয়ে দেয় তো বাস, আর দেখতে হবে না, ঘরের ছেলে সোজা ঘরে।

পরক্ষণেই শিশিরের মনে হলো, ক্ষতিই বা কি তাতে? সে সাময়িকভাবে ঢুকেছিল, ঘটনাচক্রে সে রয়ে গেল। এখন কতো নতুন নতুন বন্দরে তাকে যেতে হবে, দেখতে হবে নতুন দেশ, নতুন মানুষ।

অথচ এসব তো সে চায় নি। বাবুদের শ্রমিকরা ধর্মঘট করলো, ধর্মঘটের পাণ্ডা বাবুদের অফিসের কেরানী দুজনকে বাবুরা বরখাস্ত করলো। বাবুরা তাকে সার্ট-প্যান্ট-ঘড়ি-জুতো-মোজা পরালো, বাবুরাই তাকে তুলে দিলো জাহাজে একেবারে অফিসারদের কেবিনের পাশাপাশি।

মেয়েটি ওর কাছে এসে কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তারও মন বুঝি হঠাৎ ঐ তারাপথ ধরে উধাও হয়ে গেছে। শিশির আস্তে, কোনোরকম পায়ের শব্দ না করে রেলিং ছেড়ে চলে আসবার উপক্রম করতেই—মেয়েটি ওর হাতটা খপ করে ধরে টান দিলো। বললো, যাচ্ছো কোথায়?

হাতটা অবশ্য সে তখখুনি ছেড়ে দিয়েছিল। বললে, অত ভয় পাও কেন?

শিশির ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, ক্যাপিতানি যদি দেখে?

মেয়েটি হাসলো, বললে, দেখলেও কিছু বলবে না। যতক্ষণ আমি খুশি আছি, ততক্ষণ তোমার ভয় নেই। আমাকে চটিয়ো না, তাহলে তোমার সর্বনাশ!

—দেখুন, আমি জাহাজের লোক হতে চাইনি। আমাকে যদি সামনের পোর্টেই ছেড়ে দেয় তো—

মেয়েটি বাধা দিয়ে বললে,—ঈস! ছাড়লেই অমনি হলো! আমি দেবো কেন ছাড়তে?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে শিশির বললে, কী আশ্চর্য, আপনি আমাকে ধরে রাখতে চান কেন ?

মেয়েটি মুচকি হেসে বললো, তোমাকে আমাব ভালো লেগেছে, এটা বুঝতে পারছো না ?

শিশির ওর দিকে তাকালো। কালো চোখেব তারা, কালো মাথার চুল। চুল আবার মেমদের মতো খাটো নয়। মাঝে মাঝে খোঁপা করে রাখে, কখনো বা বেণী বাঁধে। ইঁটকাঠ ঘেরা যে স্থবির জাহাজ সে ছেড়ে এসেছে কলকাতায়, সেই জাহাজের সুষমার মতো কী একটা যেন ভঙ্গি আছে এর মধ্যে, শিশিব ঠিক সেটা বুঝতে পারে না। সুষমার থেকে বড়ো বড়ো এর চোখ, সুষমার থেকে তীক্ষ্ণ এর নাসাগ্রভাগ। সুষমার থেকে যথেষ্ট পরিষ্কার গায়ের রঙ, আর সব থেকে বিস্ময়কর হচ্ছে এর সুগঠিত দেহবল্লরী। সুষমার থেকে দীর্ঘাঙ্গিনী, সুষমার থেকে ক্ষীণ এর কটিমধ্যমাংশ। বিশেষ করে সেই তারায় ভরা কালো আকাশের চন্দ্রাতপতলে। গভীর রাত্রে যখন চারদিক সবকিছু নিশুতি, তখন মেয়েটি তাব সামনে যে বেশে আবির্ভূত হয়েছিল, তাতে সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব এক রূপেব উদঘাটনে বিপুল বিস্ময়ে সে যে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

—কী ভাবছো ?

—কিছু না।

মেয়েটি নীরবেই একটু হাসলো। তারপরে মাথায় হাত দিয়ে খোঁপাটা টান দিয়ে খুলে ফেললো। কাঁধ ছাপিয়ে অনেকটা নিচে নেমেছে চুলের গোছ। তারই একপ্রান্ত ধরে বুকেব সামনে নিয়ে এলো। চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে আবার তার দিকে তাকালো মেয়েটি, ঠোঁটের কোণেও বাঁকা হাসি। ফিসফিসিয়ে বললে, এ জাহাজে কোনো 'কলাকার' নেই, থাকলে আমাকে নিয়ে ছবি আঁকতে চাইতো। সত্যি বলছি, আমি তার চোখের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সিটিং দিতাম।

—ক্যাপিতানি রাগ করতো না ?

'মেয়েটি বুকের ওপর থেকে চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দিয়ে বললে, রাগ করলেও তাকে সামলাবার ক্ষমতা আমার আছে। কী ? আঁকতে টাকতে পারো নাকি ? তাহলে বলো, সে রাত্রের মতো আবার তোমার সামনে বিকিনি পরে এসে দাঁড়াই।

শিশিরের কান দুটো আবার গরম হয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে সে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। সে যে রক্ত-মাংসের মানুষ, তারও দেহে যে যৌবন এসেছে, এটা তার বোধের মধ্যেই ছিল না। 'এটা কর, ওটা কর',—এইসব ফাইফরমাশের মধ্য দিয়েই তো তার জীবন কাটবার কথা। হঠাৎ সেদিন কী হলো, সেই কলকাতার নির্জন নিভৃত ঘরের কোণে হঠাৎ ছোট দিদিমণি তার ঘাড়ের কাছটা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, মাথাটা জোর করে হেঁট করালেন, আর তার পরেই তার ঠোঁট দুটোর ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুতের শিখা বুলিয়ে দিলেন। চাপা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যাও, আর কখনো আমার সামনে এসো না।

বিস্ময়ে আতঙ্কে সেদিন সে যেন একটা জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সেকথা স্মরণ করে শিশিরের মনে হলো, সেই থেকে তার জড়ভাব এখনো কাটেনি। সে যেন কারুর হাতের ক্রীড়নক হয়ে স্রোতের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে, তার কিছু করবার নেই, শুধু সাধারণ একটা জীবের মতো তটভূমি খুঁজে ফেরা ছাড়া।

মেয়েটি তার ড্রেসিং গাউনের ওপরকার বোতামে হাত দিলো, বোতামটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার সেই গভীর অথচ জ্বলজ্বল করা চোখে তাকালো তার দিকে, চাপা গলায় ডাকলো, শোনো?

সে ওর কাছে গেল। মেয়েটি বললে, আমাকে তোমাদের ভাষা শেখাবে? কালকুত্তার ভাষা?

—কেন? হিন্দী তো আপনি ভালোই জানেন। তাতেই চলবে।

—চলবে না বলেই তো তোমাকে কথাটা বলছি। আচ্ছা আমার নামটা কী বলো তো?

—কী করে জানবো?

—জাহাজে কে কী বলে ডাকে?

—জাহাজে তো সবাই ডাকে 'মাদাম' বলে।

—সে তো ক্যাপিতানির খাতিরে। আড়ালে আবডালে কী বলে?

—শুনিনি কিছু।

মেয়েটি বললে, এই জাহাজের নাম কী?

—Antelope.

—মানে জানো?

—না।

মেয়েটি বললে, —এক ধরণের হরিণ। ক্যাপিতানি আমাকে 'অ্যান্টিলোপী' বলে ডাকে। অর্থাৎ, হরিণী।

শিশির ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মেয়েটি তখনো বলে চলেছে,—খাতায় পত্রে আমার নাম আছে, 'ম্যারিয়া'। ঐ আমার আসল নাম —

একটু থামতেই ওপর থেকে মোটা গলা ভেসে এলো, হে, ইউ?

দুজনেই চমকে ওপরের দিকে তাকালো। স্লিপিং স্যুট পরা ক্যাপিতানি দাঁড়িয়ে ঠিক ওদের মাথার ওপরে। সে বললে, —হে ইন্দি?

শিশিরের গলাটা শুকিয়ে গেল। কোনো রকমে বললে, —ইয়েস স্যর?

—কাম আপ কুইক।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, কোনো রকমে পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরে গেল শিশির। ক্যাপিতানি চাপা গলায় বললে,—ইউ কিস মাই ওয়াইফ?

শিশির ততক্ষণে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। বললে,—নো স্যর।

মেয়েটি ততক্ষণে হেসে উঠেছে। সিঁড়ির রেলিং ধরে তরতর করে ওপরে উঠে এলো সে। গ্রীক ভাষায় ক্যাপিতানিকে কী যেন বললো। ক্যাপিতানি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় তার উত্তর দিলো। বেশ কিছুক্ষণ কথা চললো। তারপরে তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললে,—অল রাইত্—অল রাইত্—নো জোক।

মেয়েটি ক্যাপিতানির বাহু ধরে জোর করে তার শক্ত সমর্থ দেহটাকে কেবিনের দরজার দিকে ফিরিয়ে দিলো। দিয়ে মারলো এক ঠেলা। রেলওয়ে-সাইডিং-এর ধাক্কা খাওয়া ওয়াগনের মতো ক্যাপিতানি ভিতরে চলে গেল। মেয়েটি তার দিকে ফিরে বললো,. মজাক কর রহা থা। ডরো মৎ।

বলে, আবার ধীরে ধীরে কাছে এলো ওর। শিশির বললে, যাই?

মেয়েটি ওর বাহুপ্রান্ত ধরে রেলিং-এর দিকে ঠেলে দিলো। তারপর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো ওর। বললে,—ক্যাপিতানি বললে, নিচে গেছো কেন? ওকে নিয়ে ওপরে এসো না? তোমাকে দেখলে বা তোমার গলার স্বর কানে গেলে অন্য সব লোকেদের ঘুম ভেঙে যাবে। চাই কি তারা হন্তে হয়ে তোমার দিকে ছুটে আসতে পারে। জাহাজের চারদিকে জল আর জল। মাটি নেই। ওরা জাহাজী মানুষ, তার ওপরে এই মালবাহী জাহাজটায় 'তুমি,

ছাড়া কোনো মেয়ে মানুষ নেই, যদি ওরা ক্ষেপে গিয়ে তোমার কিছু ক্ষতি করে বসে তো দোষ দিতে পারো না।

বলতে বলতে অনুচ্চকণ্ঠে মেয়েটি একটু হেসে উঠলো, বললে, অথচ অবাক কাণ্ড, কেউ ক্ষেপে যায় না। এই যে তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছো, তুমি কি ক্ষেপে যাচ্ছো?

শিশির নিরুত্তরে ওর মুখের দিকে তাকালো। মেয়েটি বললে,—আসলে ক্যাপিতানিকে সবাই মনে মনে ভয় করে। এই জাহাজের ক্যাপিতানিই নয়, এই জাহাজের সে মালিকদেরও একজন বটে। তাছাড়া ও একটু বেপরোয়া, একটু খাপছাড়া প্রকৃতির লোক। পিস্তল আছে ওর কাছে, চাবুকও আছে।

বলেই একটু হেসে ওর হাতের ওপর হাতখানা রেখে একটু চাপ দিলো, বললে, ভয় নেই। তোমাকে ও ঠিক জোয়ান মানুষ বলে গণ্য করে না। একে ইণ্ডিয়ানরা ওদের চোখে 'কালো মানুষ', তার ওপর বয়স তোমার অল্প। নইলে অমনভাবে ঠাট্টা করে তোমার সঙ্গে? কই, অন্য কারুর সঙ্গে করে না তো!

হাতটা কিন্তু পরক্ষণেই সরিয়ে নিয়েছে মেয়েটি। এক মুহূর্ত থেমে থেকে আবার বললো—একটা জিনিস লক্ষ করেছো? আমাকে পারতপক্ষে নিচে নামতে দেয় না। তুমি ইন্দির সঙ্গে গল্প করতে চাও তো ওকে ওপরে ডেকে নিয়ে এসো, এই হলো ওর মনের ভাব।

আবার নিজের মনে হেসে উঠলো মেয়েটি, বললে, আচ্ছা বলো তো, আমি যদি ইচ্ছে করি অমুক মানুষটার সঙ্গে মিশবো, ওকি সত্যিই আমাকে আটকাতে পারে?

—পারে না! ওর পিস্তল আছে, চাবুক আছে বললেন না।

মেয়েটি তখনো হাসছে, বললে, পিস্তল তুলবে না, চাবুক তুলবে। কিন্তু আমি যদি তখন চিৎকার করে বলি, তুমি বে-আইনী কাজ করেছো? আমি ভাড়া করা মেয়ে মানুষ, আমাকে বউ বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে জাহাজে তুলেছো? ব্যস, সাপের ফণা তখ্‌খুনি নিচু হয়ে যাবে। এই অস্ত্র দিয়ে ওকে নিয়ে আমি যা খুশি তা করে বেড়াই।

—আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হলো কী করে?

—বলি নি? আলেকজান্দ্রিয়ায়। ওখানে একটি জমকালো হোটেলে আমি নাচ দেখাতাম। আমার কাছে তখনকার ছবি আছে, দেখাবো'খন।

শিশির বললে, বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

মেয়েটির চোখদুটি ছলছল করে এলো। বললে, আছে আমার বুড়ি দিদিমা, আর কেউ নেই। বাপকে দেখিনি কখনো, শুনেছি তিনি গ্রীক।

—আর মা?

—মা ইজিপ্সিয়ান। মা আমাকে ছোটবেলাতেই ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

—মারা গেছেন?

মেয়েটির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো, কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলো, মারা যায় নি। শুনেছি লণ্ডন না কোথায় আছে। কোনো খোঁজখবর নেই।

—করেন নি খোঁজখবর?

—না। আর তাছাড়া করে লাভও নেই। শেষকালে মা মেয়েতে চুলোচুলি বাধবে? আমাদের ব্যবসা যে এটাই! বলতে বলতে একটু যেন অবাক হয়েই তাকালো শিশিরের দিকে, বললে,—আচ্ছা সেই থেকে তুমি আমাকে 'আপ—আপ' করছো কেন বলো তো - 'তুমি' করে বলতে মুখে আটকাচ্ছে কেন?

তারপরে হঠাৎই হাত বাড়িয়ে ওর ঘাড়ের কাছটা বেষ্টন করে ধরে ওর মাথাটা টেনে আনলো বুকের ওপর। একটা মৃদু সেন্টের গন্ধ পাচ্ছিল সে প্রথম থেকেই। এবার যেন উগ্র হয়েই সেটা নাসিকায় প্রবেশ করে ওর সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীকে অবশ করে তুলতে চাইলো।

কিন্তু পরক্ষণেই ওকে চট করে ছেড়ে দিলো মেয়েটি। ওর চোখের দিকে তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শিশিরের চোখ দুটি বিস্ফারিত, নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এক হিংস্র শ্বাপদ, এখুনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

মেয়েটি দু-পা পিছিয়ে গেল। একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালো। ডেকটা শূন্য। তারপরেই হঠাৎ একটা চাপা হাসির লহর তুলে ত্রস্তা হরিণীর মতোই লঘু আর ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। একেবারে ক্যাপিতানির দরজায়।

পরদিন সকালে মিয়ানী এসে ওকে ঠেলাঠেলি করে ঘুম ভাঙালো। হাতে

ধূমায়িত দু-কাপ চা। একটি ওর হাতে দিয়ে নিজে বসলো চেয়ারটায়। বললো, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছো যে? রাত্রে ঘুমোও নি নাকি?

শিশির কোনো উত্তর দিলো না। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে এসে দেখলো, মিয়ানী ঘরে একা নেই, চীফ স্টুয়ার্ড এসে তার সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলছে। ওকে দেখে চীফ বললে, হে ইন্দি, তাইপ দিস।

বলে একটা কাগজ ফেলে দিলো ওর টেবিলে। তারপরে বললে, মিয়ানী হেল্প্ ইউ।

চীফ চলে যেতেই মিয়ানী কাগজটা তুলে ওর মুখের কাছে ধরলো। একটা চিঠির খসড়া, আগাগোড়া গ্রীক ভাষায় লেখা। শিশির চমকে বললে, দিস ইজ গ্রীক। আই কান্ট্।

—ওয়েল, মিয়ানী বললে,—আই কান্ট্ টু। আমিও পারবো না।

—সে কি!—শিশির ওর মুখের দিকে তাকালো। এ সব কাজের ব্যাপারে তার প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেলেও এখনো সে ইংরেজিতে তেমন দড় হয়ে ওঠে নি।

মিয়ানী বললে—ক্যাপিতানি লিখেছে। বরাবর সে-ই তো তোমাকে ডেকে কী কী লিখতে হবে সব বুঝিয়ে দেয়, এবার খোদ গ্রীক ভাষায় লিখতে গেল কেন? তোমাকে ডাকলো না যে বড়ো?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে।

মিয়ানী বললে,—ডেকে কি তোলা যেতো না? ব্যাপারটা তা নয়। ক্যাপিতানি তোমার ওপর বোধহয় রাগ করেছে। কিম্বা হিংসা করছে মনে মনে।

—কেন?

মিয়ানী বললে, কালকের ঘটনা আমরা জানি না মনে করো? চীফ অফিসারের ঘরে আমি আর চীফ চুপচাপ বসেছিলাম আলো নিভিয়ে। পোর্ট হোল দিয়ে তোমাদের দেখছিলামও বটে, কথাও শুনছিলাম। আমি জানতাম ম্যারিয়া 'ইন্দি' জানে। কিন্তু সেটা সে জানতে দেয় না। চীফ কালকে খানিকটা আঁচ করেছে, সে-ও জানতো না।

শিশির ভীত-সন্ত্রস্ত স্বরে বললে, আমি তো কোনো দোষ করিনি!

—আলবাৎ করেছো,—মিয়ানী বললে,—আমি তোমাকে কী বলেছিলাম?

ধীরে ধীরে তোমাকে টানবে। তোমাকে খেলাবে। তারপরে মারবে। আমি ছিটকে এসেছি ওর খপ্পর থেকে। আমি ওর সব ছলাকলার খবর জানি, তাই তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছিলাম।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিশির। মিয়ানী তাড়া দিলো। বললে,—চা খাও?

কয়েক চুমুকেই চা শেষ হয়ে গেল। মিয়ানী বললে, বেশ, এই শেষবার। এরপর যদি তোমাকে কখনো দেখি ওর সঙ্গে ওরকম গল্প করতে, তাহলে আমি আর কিছুতেই তোমাকে সাহায্য করবো না।

শিশির টপ করে ওর পায়ের কাছে বসে পড়লো, নিজের দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো। মিয়ানী সেটা লক্ষ্য করলো। তারপরে বলতে লাগলো,—বম্বেতে তোমার নেমে যাওয়ার কথা ছিল। যদিও আমরা জানতাম, যে রোগ সেই পার্সারের হয়েছে, তাতে সে সারবে না। আমরা সবাই মনে মনে প্রস্তুতও ছিলাম সেইজন্য। জাহাজে যখন তুমি রয়েই গেলে, তখন তোমাকে ভালো করে কাজ শিখতে হবে না? নাম ডোবাবে নাকি তোমার কর্তাদের, যারা তোমাকে চেষ্টা চরিত্র করে জাহাজে চাকরি করে দিয়েছে? কাদের দৌলতে অতগুলো টাকা তুমি পকেটে পুরেছো? আর তাছাড়া বম্বে থেকে জাহাজ যখন ছাড়লো, তখন কি তোমার উচিত ছিল না কালকুত্তায় চিঠি লেখা, তোমার বাড়িতে? আমি বেশ জানি তুমি লেখো নি। লিখেছো?

শিশির হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে রেখেছে। সেইভাবেই মাথা ঘষতে ঘষতে বললে, লিখেছি, কিন্তু—

—কিন্তু কী?

বলে ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মিয়ানী, তারপরে বললে, কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছো তো? ·

—হ্যাঁ।

—তার, তাকে, তোমার 'লেডি-লাভ'কে?

মুখ নিচু করলো শিশির, কোনো কথা বললো না।

মিয়ানী বললে, আমি এই চিঠির কথাই বলছিলাম, লেখা উচিত ছিল না কি?

একটু থামলো, তারপরে আবার বললে,—যা বলি, শোনো। তোমার 'লেডি-লাভ'-এর কথা ভাবো। তার মুখখানা সবসময়ই চিন্তা করো, যদি

বাঁচতে চাও। ও সর্বনাশী তোমার কী করবে, যদি তোমার প্রিয়ার স্মৃতি সবসময় তোমাকে ঘিরে থাকে?

সত্যিই এক অদ্ভুত ধরণের অনুশোচনায় শিশিরের ভিতরটা যেন পুড়ে পুড়ে যাচ্ছিল। আত্মগ্লানি।

মিয়ানী সিগারেট ধরালো. ওর দিকেও একটা এগিয়ে দিলো, বললে, আমি অবশ্য খতম হয়ে গেছি। না হলে আমি কি পোর্টে নামলে ওসব অস্থানে-কুস্থানে যাবার লোক?

বলতে বলতে মিয়ানী যেন এক স্বপ্নালোকে উত্তীর্ণ হলো। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়তে লাগলো। যেন ভিন্ন এক জগতের কথা বলতে লাগলো,—আমি সাইপ্রাস দ্বীপের লোক। সেখানে আমারও এক 'লেডি-লাভ' ছিল। কিন্তু তার মর্যাদা আমি রাখতে পারি নি। আমি তাকে হারিয়েছি।

সোজা হয়ে বসে মিয়ানী. বললে,—ঐ শয়তানীর পাল্লায় পড়েই আমি তাকে চিঠি লিখতে ভুলে যেতাম। বোধহয় প্রেমের নিয়মই এই। সে মনে মনে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। তাই একদিন—

একটু দম নিয়ে, একটু থেমে মিয়ানী বলতে লাগলো,—একদিন চিঠি পেলাম, সে অন্যকে বিয়ে করছে!

শিশির মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো।

মিয়ানী বললে, আমরা ক্যাথলিক, অনেকটা তোমাদের মতো; প্রেমের মূল্য আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কথা থাক। আমি তাই তোমাকে বলছিলাম, আমার মতো ভুল যেন তুমি করো না। আর, যত তাড়াতাড়ি পারো তাকে চিঠি লেখো। এডেনে জাহাজ থামবে। ওখানেই পোষ্ট করবে চিঠি এয়ারমেলে। মনে থাকবে?

শিশির মাথা নিচু করলো। তার 'লেডি-লাভ'? 'কে?' সুষমা?

কে জানে? সত্যিই কি তার কথা সে ভাবে? সত্যিই কি তার কথা মনে হয়? মনে হয়ত পড়ে। হ্যাঁ. মনে পড়ে তার একটি কথা: 'আর কখনো আমার সামনো এসো না!'

শিশির মনে মনে বললো, তাই কি সমুদ্রে ভেসে পড়তে শেষ পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে তাগিদ অনুভব করেছিলাম?

মিয়ানী বললে, নাও, আপাতত চিঠিটা লেখা যাক। তুমি টাইপে বসো. আমি একেবারে 'ডিক্টেট' করে যাই।

—বানান ?

—হবে'খন। নইলে 'কারেক্ট' করে আর এক কপি ছাপানো যাবে।

শিশির টাইপরাইটারে কাগজ পরিয়ে প্রস্তুত হলো। ডিক্টেসন দিতে দিতে মিয়ানী মুখ তুলে বললে, তোমার হাতই এখনো সেট্ করে নি, স্পীড তুলবে কী ? তোমার উচিত সব সময় বসে বসে টাইপ অভ্যাস করা।

—তাই করবো এবার থেকে।

মিয়ানী বললে,—নিশ্চয়। ক্যাপিতান যেটুকু তোমাকে ডাকবে, সেটুকুই তোমার ওপরে যাবার ছুটি। আর বাকি সময়টা—

বলে হাত বাড়িয়ে ওর মাথার সামনের চুল মুঠি করে আলতোভাবে ধরলো মিয়ানী, বললে,—মনে থাকবে ?

হেসে ফেলে শিশির বললে, থাকবে।

চিঠিটা টাইপ করে রেডি করতে সময় গেল এক ঘণ্টার ওপর। এর মধ্যে মিয়ানী উঠে গিয়েছিল ত্বার। ওপরে। রেডিও-রুমে। যদি কোনো 'খবরাখবর' এসে থাকে ?

প্রথমবার কিছু বলেনি সে। দ্বিতীয়বার বললে,—মাদাম এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, হলদে একটা গাউন পরে ঘুরছেন, অবশ্য ঐ ঘরের মধ্যেই।

যাইহোক, তারপরে চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেনের ঘরে যেতে হয়েছিল শিশিরকেই অবশ্য। অফিসিয়াল চিঠি। ক্যাপ্টেন বললে, এইরকম যেসব চিঠি দেবো, সমস্তই জড়ো করে রাখবে। এডেন এলেই এজেন্টের অফিসে গিয়ে দিয়ে আসবে পোস্ট করবার জন্য।

এছাড়া জাহাজের অন্যান্য কাজ আছে। চীফ স্টুয়ার্ডের সঙ্গে ঘণ্টা চার-পাঁচ অন্তত বসতে হয়। মোটামুটি কাজের ধরণটা রপ্ত হয়ে গেছে শিশিরের। চিঠির ব্যাপার ছাড়া, ক্লিয়ারেন্সের ফর্ম ভর্তি করে রাখতে হয়। এধরণের কাজ তাকে আগেও করতে হতো। যেটুকু নতুনের মধ্যে, তাও শিখে নিয়েছে মিয়ানীর দৌলতে। কথায় কথায় মিয়ানীকে সেদিন ও বললে, জরুরী খবর-টবর সবই তো তুমি পাঠাও রেডিও মারফৎ। বাকি যেটুকু থাকে, তার জন্য 'রাইটার'-রাখবার দরকার কী ?

মিয়ানী বললে,—আচ্ছা লোক তো তুমি ! রাইটার না থাকলে তুমি আসতে পারতে ? আসলে তুমি 'পার্সার', তোমার ক্যাশ রাখার ব্যাপারটা

শুধু ক্যাপিতানি অন্য হাতে দিয়েছে। তাই, মাইনেও তোমার আগের পার্সারের থেকে কম। আর তাছাড়া, জাহাজে মোটামুটি ইংরেজি জানা একজন লোক—

শিশির বললে, তুমিই তো রয়েছো?

মিয়ানী বললে—আমাকে ওরা বিশ্বাস করে কতটুকু? আমি যে ইংরেজি জানি, এটা ক্যাপিতানিরা ভালো করে বোঝেই না। গ্রীক জাহাজীদের কাছে 'কালকুত্তার লোক' ভালো ইংরেজি জানে বলে প্রসিদ্ধ আছে।

শিশির ভাবে, তাহলে তো দেখছি 'ভাগ্য' মানতে হয়। তার এভাবে হঠাৎ জাহাজে আসা, ভাগ্য ছাড়া আর কী!

সারা দিনগুলো কাজকর্মে বেশ কেটে যায়, রাত্রে কেমন যেন শূন্য লাগে সবকিছু। যে যার ঘরে গিয়ে বসে, রেডিও শোনে। শুধু তারই কিছু করবার নেই। বাইরের শূন্য রেলিংটা তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। সমুদ্র শান্ত, ছোট ছোট ঢেউতে ভরা! এক এক সময় সেই ঢেউগুলো পর্যন্ত নীরব হয়ে যায়। তখন আসে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ তারা দেখার লগ্ন। তারা থেকে আলো এসে ছিটকে পড়ে জলের ওপর। সুন্দর একটি আলোক-পথ তৈরি হয় তখন, যার নাম তারাপথ।

কিন্তু রেলিং-এ সে যাবে কেমন করে? যদি গিয়ে দাঁড়ায়, আর ঠিক তখন যদি শোনে মাদামের কণ্ঠস্বর? নিজেকে শাসন করবার জন্যই যেন কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলে এসে বসে শিশির। কিন্তু চিঠি লেখবার কি কখনো অভ্যাস আছে? লিখেছে কি কখনো কাউকে? কখনো না। কীভাবে লিখতে হয়? কী সম্বোধন করতে হয় যদি লিখতে হয় ছোটদিদিমণি সুষমাকে?

হরিশ মুখুজে রোডের এই বৃহৎ বাড়িটাকে যে লোকে জাহাজ বলে, সেটা তার আকৃতি দেখে ততটা নয়, যতটা প্রকৃতি দেখে। কাছেই যে ছোট্ট পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানটা রয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়ালো মুন্সিজী।

দোকানী বললে, জাহাজের খবর কী আছে?

মুন্সিজী বললে, তা সে বাবা আদার বেপারিকে শুধাচ্ছো কেনো?

দোকানী বয়সে মুন্সিজীর মতো প্রবীণ নয়, তবু চোখেমুখে এমন একটা অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে যে, তাকেই প্রবীণতর মনে হয়, যদিও তার মাথার চুল

মুন্সিজীর মতো সর্বাংশে শুভ্র হয়ে যায় নি। সময়টা দুপুর। দোকান বন্ধ করে সবাই বাড়ি যায় না, ঘুমোয়। কিন্তু এ লোকটা বসে বসে বিড়ি বাঁধে। বললে,—বেসুরো গাইছো কেন? তুমি আদার ব্যাপারী? তুমিই তো আসল জাহাজী লোক। জাহাজী বাবুদের কোন ব্যাপারে তুমি না আছো?

মুন্সিজী ওর টাট থেকে একটা আলগা বিড়ি উঠিয়ে নিয়ে ওর পাশে বসলো কোনরকমে পা ঝুলিয়ে। দেয়ালে ঝোলানো দড়িটা টেনে নিয়ে দড়ির মুখ থেকে আগুন ছুঁইয়ে বিড়ি ধরালো। তারপরে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ওদের নোকরি আর করবো না, ঘেন্না ধরে গেল।

একথাটাও পুরোনো। বহুবার বহু লোকে শুনেছে একথা ওর কাছ থেকে। দোকানী একটু হাসলো মাত্র, আর কিছু বললো না। বলার দরকারও নেই। মুন্সিজী দম-দেওয়া 'কলের গান'-এর মতো ঘ্যানোর ঘ্যানোর করতে লাগলো, ওদের ঐ খোঁড়া মেজোবাবুকে দেখেছো? শালা বিলকুল হারামি আছে। বললুম, পাঁচটা টাকা দিবেন? বড্ড দরকার আছে। তা যেন খ্যাঁকশেয়ালির মতো তেড়ে এলো। জানিস দোস্ত, ওদের ঘাটে জাহাজ না থাকলেই মাথা গরম। আবে, চব্বিশ ঘণ্টা জাহাজ বাঁধা থাকবে নাকি গঙ্গায় তোর জন্য? দুচারটে আসবে, ব্যস তাতেই করে খা। খোঁড়া পায়ে তো অফিসে বসে বসে হুকুম চালাস, আর শনিবার শনিবার মাঠে গিয়ে—। তোবা তোবা! খেঁকিয়ে উঠিস কাকে, না, আমাকে! আমি না হলে তোর চলে? টিপ্‌স্ দেবে কে? না, এই মুন্সি। সাহেবকে 'বোতল' দিতে হবে, খুঁজে এনে দেবে কে? এই মুন্সি। তোমার দরকার পাঁচশো পাউণ্ড গোস্ত, জাহাজে সাপ্লাই দিতে হবে আজই, মাথা খুঁড়েও জোগাড় করতে পারছো না? তখন কী হবে? ডাকো এই মুন্সিকে। সাচ বলছি দোস্ত, মাঝে মাঝে ঘেন্না ধরে যায়। শালা ইংলিশ জানে? ইংলিশ না জানলে দুনিয়ায় কিছু করতে পারছো না তুমি! ধরো না কেন, ঐ শিশিরবাবু, ওটাকে তোমরা ধরে-বেঁধে সায়েব সাজিয়ে জাহাজে ঠেলে দিলে। আমি তালিম না দিলে ইংলিশ শিখতে পারতো? তুমি ইস্কুলে গিয়ে হাজার পড়ি-লিখি আদমি হওনা কেনো, 'জবান' ঠিক না হলে সেটা কোনো কাজেই আসবে না। সে ছিল যুদ্ধের সময় 'জাভা-বেঙ্গল' কোম্পানীতে এক সাহেব। খানদানি একেবারে। আমাকে বলতো, তোমার জবান বহুৎ বঢ়িয়া! বাঙালীবাবুরা খাতাই লিখতে পারে, কথা বলতে পারে না।

বলতে বলতে তেরছা চোখে 'জাহাজী' বাড়িটার দিকে কী দেখে হঠাৎ তড়াক করে নেমে দাঁড়ালো মুন্সিজী। ধড়ফড় করে বললে, লে দোস্ত, এক প্যাকিট গোল্ড ফ্লেক দে, শালা মেজো এখনি তড়পাবে!

দোকানী একটু অবাক হয়ে বললে, হঠাৎ উঠলে যে?

মুন্সিজীর চোখ তখনো ও-বাড়ির দরজায়। বললে, শালা পিয়ন ঢুকছে। জরুরী চিঠিপত্র থাকতে পারে তো? অফিসে বাবুরা নেই, সবাই ওপরে উঠে গেছে। আমি না হলে ও চিঠি হাতে করে নেবে কে? অফিসের বাবুরা তো এখন টেবিলে পা তুলে দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। দে ভাই সিগারেটটা তাড়াতাড়ি।

দোকানী সিগারেট ওর হাতে দিতে দিতে বললে, দামটা কই?

—আবে সে হবে'খন,—বলে, মুন্সিজী তখন প্রায় ছুটতে আরম্ভ করেছে।

দোকানী পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো— কালকেরটাও বাকি আছে।

কে কার কথা শোনে? দোকানী জানে, মেজোবাবু যখনই লোক পাঠায়, পয়সা দিয়েই পাঠায়। অন্য কর্মচারীরা যখন আসে, পয়সা নিয়েই আসে। মুন্সিজী এলেই সর্বনাশ, পয়সা ও ঠিক বাকি রাখবে। অবশ্য সেও বিড়ি বেচে খায়, পয়সা সে আজ না হয় কালকে আদায় করবেই।

'মুন্সিজী'র কথামতো অফিসে কেউ নাক ডাকাচ্ছিল না। এমন কি মেজোবাবু তখনো ওপরে যান নি, সিগারেটের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আর গুম হয়ে বসে আছেন সেজোবাবু তাঁর ঘরে, চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নামই নেই। বড়বাবুর তো কথাই ওঠে না, জাহাজ থেকে পড়ে যাবার পর তাঁর পা প্লাষ্টার করা আছে, তাঁর নিচে নামতে এখনো পুরো দু-মাসের ধাক্কা। পিয়ন মেজোবাবুর হাতে চিঠির তাড়া তুলে দিলো। মেজোবাবু যখন চিঠির নাম-ঠিকানাগুলো দেখছিল, তখনই ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হলো মুন্সিজী।

ওকে ছুটে আসতে দেখেই মেজোবাবুর রাগ জল হয়ে গেল। নইলে আবার তাড়া দিতেন, এত দেরি হচ্ছিল কেন, অ্যাঁ? ও হাঁপাচ্ছিল দেখে তিনি অনুমান করলেন হয়ত কাছের দোকানে পায়নি, দূরের দোকানে যেতে হয়েছিল। সিগারেটটা নিয়ে চিঠির তাড়াটা মুন্সিজীর হাতে ধরিয়ে দিলেন, সেজোকর্তাকে দাও গিয়ে।

বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

চিঠিগুলো নিয়ে মুন্সিজী সেজোবাবুকে দিলো। সেজোবাবু সামনের

টেবিলটা দেখালেন নিশ্চুপে, একটা অলস দৃষ্টি ফেললেন চিঠিগুলোর ওপরে হাত দিয়ে ছুঁলেন। এক মনে কী যেন ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন,—মুন্সিজী ?

—আজ্ঞে।

—শিশিরের খবর কিছু জানো ?

মুন্সিজী চোখ কপালে তুলে বললে, না স্যার, কী করে জানবো ?

সেজোবাবু বললেন, ভেবেছিলাম বম্বে থেকে ছেলেটা চলে আসবে। মাঝখানে একটি মাত্র পোর্ট—কলম্বো। কোনোরকমে চলে যাবে। কিন্তু এখন তো সারা ইয়োরোপ ঘুরতে বেরুলো। কাজকর্ম ও চালাতে পারবে কী করে ?

মুন্সিজী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সেজোবাবু তার দিকে ফিরে বললেন, পার্সারটা এখানে 'পি-জি'তে ছিল, মারা গেছে। শিশির ছিল ওর বদলি, বুঝলে ? এখন কী করা যায় বলো তো ? অবশ্য চিঠি পেয়েছি, ও ভালো আছে, জাহাজ পৌঁছেছে এডেনে। এডেনে পৌঁছেছে কী, এতদিনে হয়ত ছেড়ে গেছে।

মুন্সিজী বললে, তোবে আর ভাবছেন কেন ?

সেজোবাবু চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। যেন মুহূর্তে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, দূর, ভাবছে কে ?

বলে, চিঠিগুলো দেখতে লাগলেন। অধিকাংশই অফিসের চিঠি। নানান দেশ থেকে চিঠি আসে ওদের। বিভিন্ন জাহাজের ক্যাপ্টেন সৌজন্যসূচক চিঠি লেখে অনেক সময়। এরা তার উত্তর দেয় অনেক মুসাবিদা করে খুব ভালো আর দামী কাগজে টাইপ করে। কোম্পানীর নাম মাথার ওপর খুব সুন্দর করে ছাপানো, আলাদা প্যাডই আছে ওদের সেইজন্য।

চিঠি দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন সেজোবাবু, কালী—কালী ?

কালী অন্দরমহলের চাকর। সে ওঁর ডাক হয়ত শুনতেই পেলো না। সেজোবাবু মুন্সিজীকে বললেন, ডাকো তো কালীকে ?

মুন্সিজী তাড়াতাড়ি ভিতর-বাড়ির দরজার মুখে গিয়ে চ্যাচাতে লাগলো, কালী—কালী ?

কালী লুকিয়ে তখন একটি খিলিপান মুখে দিয়েছিল। চিবুতে চিবুতে সামনে এসে বললে, কী? ডাকছো কেন?

মুন্সিজী তেড়ে উঠলো, আবে, ডাকছি কি আমি? জলদি যাও, সেজোবাবু গর্দান নেবে। ঘণ্টাখানেক ধরে চেল্লাচ্ছে!

কালী তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। সেজোবাবু ওর হাতে একটা খাম তুলে দিয়ে বললেন, চিঠি এসেছে। ছোট দিদিমণিকে দে গিয়ে।

কালী চিঠি নিয়ে ছুটলো। মুন্সিজী বললে, এই, কার রে?

—ছোট দিদিমণির,—বলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো ভিতরের বাড়িতে।

গোল গোল চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো মুন্সিজীর। সে ভাবলো, চিঠি দিয়েছে কে, আমার কি তা জানতে বাকি থাকে? দিয়েছে শালার বসন্তবাবু বম্বে থেকে। রঙের চিঠি আর কী। শালা মুহাব্বতের কারবার দেখ, কোথায় বম্বে, আর কোথায় কলকাতা। এতদুর ফারাক, তবু 'নাজুক দিল্' ঠিক তড়পাবে!

সেজোবাবু বাকি চিঠিগুলো একে একে খুলতে আরম্ভ করলেন। অফিসের নানান খবর। তার মধ্যে একটা জার্মান জাহাজের খবরই মারাত্মক। গত যুদ্ধের আগে জার্মান-জাহাজ খুবই আসতো। আর আসে না বলে তাদের কাজও হয় না। খুব পয়সা দিতো ওরা। সেই পুরোনো এক জাহাজের ততোধিক পুরোনো এক কাপ্তেন চিঠি দিয়েছে। সে এখন মেরিন সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট একটি জাহাজী লাইনের। ইণ্ডিয়ায় আবার যাতায়াত শুরু করবে এই লাইন। কাজকর্ম এখনো করছো তো? পত্রপাঠ চিঠি লিখো যদি কনট্র্যাক্টর হতে চাও।

সেজোবাবু চিঠিখানা পড়তে পড়তে উত্তেজনায় উঠে পড়লেন। ছুটে চললেন ওপরে বড়দার কাছে। বড়দা শুয়ে শুয়ে একটি পত্রিকা পড়ছিলেন। বউদি বাচ্চাদের নিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে।

—জানো বড়দা,—সেজোবাবু বললেন, হান্‌সা লাইনের কথা তোমার মনে আছে? সেই লাইন ভেঙে ভেঙে এখন নতুন নতুন লাইন হচ্ছে। হান্‌সার জাহাজের এক ক্যাপ্টেন- ক্যাপ্টেন রিশটার—তাকে তোমার মনে আছে? সে চিঠি লিখেছে, সে এখন ঐ লাইনের মেরিন সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট—আমাদের কাজ দিতে চায়।

উৎসাহে বড়দা উঠে বসলেন, এমনকি বউদিও।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে দুই ভাইতে কথাবার্তা চলতে লাগলো। আধঘণ্টা পরে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন সেজোবাবু, এমন সময়, সুষমার সাড়া এলো,- সেজদা, শোনো ?

সেজদার মন তখন খুশিতে ভরপুর। এখনই টেণ্ডার নিয়ে বসতে হবে। মেজদাকে তুলতে হবে। বড়দার ঘরে সবাই মিলে পরামর্শ—

সেজোবাবু ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, কী রে ?

—আমার ঘরে একবারটি এসো ?

—চল,—বলে ওর পিছন পিছন ওর ঘরে গেলেন সেজোবাবু। টেবিলের ওপরে একটা খোলা চিঠি। তার সামনে মুখ কালো করে এসে দাঁড়ালো সুষমা। তারপরে সেই চিঠি সেজোবাবুর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে উঠলো,, ওর কী সাহস, যে আমাকে এইভাবে চিঠি লেখে ?

সেজোবাবু চিঠিখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। সুষমার রাগ যেন দ্বিগুণ হয়ে ফেটে পড়লো,—চাকর-বাকরকে লাই দিয়ে মাথায় তুললে এই দশাই হয় !

সেজোবাবু চিঠিখানা টেবিলে নামিয়ে রেখে শান্ত কণ্ঠেই বললেন, রাখ দেখি। দোষনীয় কিছুই লেখেনি।

—দোষনীয় আবার কী লিখবে !—সুষমা বলে ওঠে,—চিঠি লিখতে সাহস পায়, এইটেই দোষ।

যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেজোবাবু, বললেন,—ছোট থেকে তোদের এখানেই মানুষ। কে ওর আছে, কাকে ও চিঠি লিখবে ? পারিস তো একটা উত্তর দিস।

সেজদা তো ফতোয়া দিয়ে চলে গেলেন। চিঠিখানা হাতের মুঠোয় পাকাতে পাকাতে সুষমা গুম হয়ে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরে একসময় কী মনে করে চিঠিটা খুলে টেবিলের ওপর পড়তে লাগলো : 'ছোট দিদিমণি জাহাজ এডেনে পৌছিতেছে. আর আপনাকে চিঠি লিখিতেছি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহাজে আসিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম বম্বে নামিব, ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখিব, যাঁদের সঙ্গে দেখা করিবার দেখা করিব। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। অদৃষ্ট আমাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে দূরে, আরও দূরে। কবে ফিরিব জানি না। আপনাদের কথা সবসময় মনে পড়ে। বিশেষ করিয়া আপনার কথা। আপনার কাছ হইতে যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। বাবুদের বলিবেন,

পরের পোর্ট বোধ হয় পোর্ট সৈয়দ। সেখান হইতে চিঠি লিখিব। ভালো আছি। কাজকর্ম শিখিতেছি। নমস্কার জানিবেন। ইতি—শিশির।'

'বম্বে শহরে যাঁদের সঙ্গে দেখা করিবার, দেখা করিব' কথাটার মানে কী?' তুমি দেখা করবে কি করবে না তাতে আমার কী? আর তাছাড়া বসন্তবাবু তোমার কে? নিজের মনেই বসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে লাগলো সুষমা। বসন্তবাবু বম্বেতে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তুমি কী বলতে? বলতে, ছোট দিদিমণি দেখা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন? অবশ্য কথাটা সে ওকে একদিন বলে ফেলেছিল বটে, কিন্তু এখন সেটা মনে করতেও ধিক্কার আসে। কাকে পাঠিয়েছে? না, বাড়ির ঝিয়ের ছেলেকে। না বাপু, তুমি যে বম্বে নামোনি, এতে ভালোই হয়েছে। সে লোকটা কী মনে করতো? মনে করতো আচ্ছা মেয়েকেই বিয়ে করবার তোড়জোড় করছি বটে!

কিন্তু সে থাক। 'আপনার কাছ হইতে সদয় ব্যবহার পাইয়াছি' কথাটা লেখার তাৎপর্য? সুষমার মনে ঘা দেওয়ার চেষ্টা, না? সেদিনের সেই এক মুহূর্তের দুর্বলতাটাকেই সত্যি বলে ধরেছে নাকি? সুষমার গা যেন রাগে রি রি করে উঠলো। ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকাতো ছেলেটা। এক এক সময় মনে হতো, গিলে খেতে চায় নাকি? তারও সেদিন যে কী মতিচ্ছন্ন হলো? ছেলেটা ভাবলো সে বুঝি ওর প্রেমেই পড়ে গেছে! ছিঃ ছিঃ! লেখাপড়া জানেনা কিছু না, আস্ত হাঁদারাম! ভাবতে ভাবতে নিজেরই ওপর ঘেন্না ধরে গেল সুষমার। হে ভগবান, ওটা যেন আর কখনো দেশে ফিরে না আসে। মনে মনে বারবার বলতে লাগলো সুষমা, ওর জাহাজটাকে না হয় জলে ডুবিয়ে দাও, ওটাকে না হয় হাঙর-কুমিরে খাক।

'হাঙর-কুমির' সত্যি সত্যিই শিশিরকে না খাক, ওদের মতো জাহাজী লস্করদের বাগে পেলে খাবার জন্য হাঙররা যে প্রস্তুত থাকে, জাহাজের পিছন পিছন আসতে থাকে, এটা এডেনে পৌঁছবার আগেই টের পেয়েছিল শিশির। এডেন ছাড়তেই গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, সূর্যের তাপ যেন ছুঁচের মতো জামা ভেদ করে শরীরে ঢুকতে চায়। মিয়ানী ওকে বললো, অফিসারদের মতো সেলুনে বন্ধ না থেকে মাঝে মাঝে লস্করদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

শিশির বললে, ওদের ভাষাই তো আমার কাছে অন্তরায়।

মিয়ানী বললে, দু-একজন ক্যাপিতানের মতো ইংরেজি বলতে পারে, চলোই না?

দুজনে অগত্যা 'মিডশিপ'-এর বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়লো। মিডশিপের পিছনের অংশটা অবশ্য 'ইঞ্জিন'-এলাকা। মাঝখানে একটা ছোট্ট ফলকা। সেটা 'বাঙ্কার' বা 'কয়লা রাখার স্থান' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তারপরেই ইঞ্জিন-এলাকা। মাঝখান থেকে অতিকায় চিমনিটা উঠে গেছে, তার পাশে ইঞ্জিনিয়ার আর খালাসিদের কেবিন। প্রথমেই দেখা হলো চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। যখন জাহাজ কলকাতার গার্ডেনরিচের জেটিতে দাঁড়িয়েছিল, তখন কাজ দেখতে গিয়েই শিশিরের ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁর সঙ্গেই বা কেন, ইঞ্জিনরুমের সবার সঙ্গেই। নিচে, বয়লারে কাজ হয়েছিল, সেই সূত্রেই আলাপ। এমন কি, ইঞ্জিনরুমে, স্টোক হোল্‌ডে নেমেই তাকে কাজ দেখতে হয়েছিল কদিন। সেজন্য ও-অংশটাও তার জানা।

চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মাথাভর্তি বড়ো বড়ো চুল, কিন্তু সব পাকা। চেহারা দিব্যি শক্ত সমর্থ। মুখেও হয়নি তেমন গভীর রেখাপাত। হেসে বললেন, হ্যালো?

নিচে থেকে উঠে এসেছেন সবে, একটা বয়লার-স্যুট পরা, সারা গায়ে ঘাম, কিছু 'জুট-ওয়েস্ট' দিয়ে হাতের কালিঝুলি মুছছেন। বললেন, গোয়িং দাউন বিলো?

ওর হয়ে জবাব দিলো মিয়ানী, না—বড্ড গরম।

তখনো জাহাজ এডেনে পৌছয়নি। চীফ তাই হেসে বললেন, 'এদেন'-এ সব গরম ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সত্যি, জাহাজ যখন কোনো বন্দরে পৌছবো-পৌছবো করে, তখন জাহাজের লোকদের অস্থিরতা চরমে পৌছয়। শেষ কয়েকটি মুহূর্ত যেন আর কাটতে চায় না। কখন জাহাজ নোঙর ফেলবে, কখন এজেণ্টের লোক চিঠি আর টাকাকড়ি নিয়ে আসবে, কখন কাস্টম্‌স আর পুলিশের 'পারমিট' নিয়ে লোকগুলো মাটিতে নেমে দাঁড়াবে, সেই আশায় তারা সময় গুনতে থাকে অধৈর্য হয়ে। রেডিও-অফিসার ক্যাপিতানের হুকুমে আগেই এজেণ্টকে জানিয়ে দেয়, মোট কতো টাকা দরকার। স্থানীয় টাকা। তার হিসাব রাখে পার্সার, এক্ষেত্রে চীফ স্টয়ার্ড রাখছে। সে প্রত্যেকের নামে নামে টাকার

অঙ্কটা লিখে রাখবে, তার 'সমমূল্য' তার মাইনের টাকা থেকে কাটা যাবে। এই সবই মহা ঝামেলার ব্যাপার। পার্সারের বদলে তাকে করতে হচ্ছে বলে চীফ স্টুয়ার্ডের বিরক্তির অন্ত ছিল না। শিশিরকে বলতো, লুক। আই ডু ইয়োর জব। ইউ গিভ্ মানি।

ততদিনে শিশির একটু ধাতস্থ হয়ে উঠেছিল। বললে, নো মানি। আই গিভ ইউ এ প্রেজেণ্ট।

—হোয়াত্ প্রেজেন্ত?

শিশির বলতো, তুমি যা চাইবে।

চীফ স্টুয়ার্ড বলতো, অল রাইত্—গিভ মি এ নাইস গ্যাল, অ্যাঁ?

হেসে ফেলতো শিশির, বলতো, তোমরা সবাই 'গ্যাল' চাও কেন, বলো তো?

স্টুয়ার্ড দুটি হাত প্রসারিত করে কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিচের ঠোঁটটার একটা ওলটানোর ভঙ্গি করতো, বলতো, উই আর সেলারস!

কথাটার ব্যাখ্যা করতো মিয়ানী, বলতো, জলে জলে দিনের পর দিন থাকো, তুমিও ব্যাপারটা বুঝবে। সবাই যে বদমাইস তা নয়। কিছু না, হয়ত কয়েক ঘণ্টা স্রেফ গল্প করে কাটাবে। সেলারদের যে কতরকম খামখেয়ালী ভাব আছে, তা তুমি আর কিছুদিন থাকো, নিজেই টের পাবে।

যাইহোক মিয়ানী ওকে একেবারে জাহাজের পিছনে নিয়ে এলো। একেবারে পিছনে, 'আফ্‌ট-পার্ট'-এর কেবিনগুলোরও শেষের দিকে, যেখানে গ্রীক দেশের জাতীয় পতাকাটা উড়ছে। সেখানে রেলিং ধরে অনেকগুলো খালাসি জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কারুর গায়ে গেঞ্জি, কারুর গা খালি।

কিছু একটা দেখবার ব্যাপার আছে ভেবে মিয়ানী ওকে সেখানটায় নিয়ে গেল। সমুদ্রের এই খেলাটা জীবনে প্রথমে দেখলো শিশির। প্রথম দেখাতেই চোখ বন্ধ করলো। কীরকম ভয় করতে লাগলো যেন। সবার পিছনে থাকে 'হাল' আর 'প্রপেলার', যেটা কিনা সমগ্র জাহাজটাকেই চালিত করছে। এখান থেকে 'হাল' আর 'প্রপেলার' দেখা যায় না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। জল কেটে চলার দরুণ আর জলের মধ্যে প্রপেলারের বিদ্যুৎগতির জন্য আবর্ত সৃষ্টি হবার ফলে জলে ফেনার উদ্ভব হয়। ঢেউয়েরও রকমফের হয়। শিশিরের মনে হচ্ছিল, অজস্র সাপ যেন ফণা তুলে কিলবিল করতে করতে জাহাজটাকে ছোবল মারতে আসছে। ছোবল তুলছে, পারছে না, পিছিয়ে

যাচ্ছে, ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নতুন সাপ, তারা নতুন উদ্যমে আবার এগিয়ে আসছে।

আড়ষ্ট হয়ে এসবই দেখছে শিশির, মিয়ানী বললে, দেখতে পাচ্ছো? হাঙর?

হাঙর! অবাক হলো শিশির। আর তারপরেই, ঠিক সাপগুলোর মাঝ থেকে ভুস করে ভেসে উঠলো বিরাট এক হাঁ, সারি সারি চকচকে আর তীক্ষ্ণ দাঁত মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

শিশির ততক্ষণে সভয়ে রেলিং ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসেছে।

—কী হলো?

ভয়ে মুখখানা সাদা, দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর কী! খালাসিরা ওকে সকৌতুকে দেখছিল। একজন কী যেন সরস মন্তব্য করলো গ্রীক ভাষায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকগুলো হেসে উঠলো। তার সঙ্গে মিয়ানীও যোগ দিলো, কী যেন বললো ওদের। তারপরে ওকে সরিয়ে নিয়ে এলো মিডশিপের দিকে। ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে শিশির। মিয়ানী বললে, তোমাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করছিল। কী বলছিল জানো? ক্যাপিতানির দ্বিতীয় বউ।

—সে কী?

মিয়ানী বললে, কথাটা তোমার ভালো না লাগলেও ওদের বলতে যেয়ো না বা রাগ দেখিও না। বরং তুমিও দ্বিগুণ রসিকতা করবে। যদি ওরা জানতে পারে ওদের নামকরণে তুমি চটে যাচ্ছো, তাহলে আর রক্ষে নেই। তোমাকে ক্ষেপিয়ে একেবারে অস্থির করবে।

—কিন্তু এ ধরণের নামকরণ কেন?

—এটা ওদের স্বভাব। এক ঘেয়ে জলের জীবনে কৌতুক করে একটু আনন্দ পাওয়া। তুমি তো কেবিন ছেড়ে বড়ো একটা বেরোও না? তাই এই নামকরণ।

শিশির উত্তরে কিছু বললো না। মিয়ানীর সঙ্গে সেলুনে ফিরে এলো। দুজনে দুকাপ কফি নিয়ে একটা টেবিলে বসলো। সেলুনটা তখন ছিল একেবারে ফাঁকা।

শিশির বললে, ওটা হাঙর বুঝি?

—হ্যাঁ। খাবার লোভে জাহাজের পিছনে পিছনে আসছে।

—কী খাবার?

যদি বাসী মাংসটাংস কেউ ছুঁড়ে দেয়, কিম্বা মানুষ-টানুষ যদি পড়ে যায়, এই লোভে।

আঁতকে উঠলো শিশির,—মানুষ পড়ে যায় নাকি!

যায় না? মিয়ানী বললে,—এতো তবু সবে আরব সাগর থেকে এডেন উপসাগরে ঢুকেছি। এর পরে কী হয় দেখো না? গরমের চোটে অনেক সময় পাগল হয়ে যায় মানুষ।

—বলছো কী!

মিয়ানী চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। কফিতে চুমুক দিচ্ছে না, সিগারেটেও টান দিচ্ছে না, নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে কী যেন দেখছে!

দেওয়ালের নিচের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি, কিন্তু সেখানকার কিছু যে দেখছে এমন মনে হলো না। মনে হলো, ওর দৃষ্টি স্থান-কাল পার হয়ে হঠাৎই অতীতের গহনে অবগাহন করছে। কী যেন স্মরণ করে ওর চোখ দুটোও অকস্মাৎ ছলছল করে এলো। সেই বাষ্পাকুল চোখদুটো ওর দিকে ফিরিয়ে বলে উঠলো, —আমি তখন অন্য একটা জাহাজে। বম্বে থেকে জাহাজ যাচ্ছে বেইরুট, লেবাননের রাজধানী। সেখান থেকে 'সাইপ্রাস' বেশি দূরে নয়। যতদূর জানি. আমাদের সাইপ্রাসের প্রধান শহর 'নিকোসিয়া'য় জাহাজ ধরবে। প্রাণটা কত উৎফুল্ল থাকতে পারে সে তো বুঝতেই পারছো! জাহাজ চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে 'রেডসী' দিয়ে সুয়েজের দিকে। গরমে কিন্তু প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়। স্রেফ আণ্ডারওয়্যার পরে আমরা কজন একেবারে পিছনে আফ্‌ট্-ডেকে খাটিয়া নিয়ে শুয়ে আছি মাথার ওপরে একটা 'ওনিং' খাটিয়ে নিয়ে।

—'ওনিং' কী?

মিয়ানী বললে, কনট্রাক্টর ছিলে, আর 'ওনিং' কাকে বলে জানো না? কখনো জাহাজে সাপ্লাই করো নি? ক্যাম্বিসের মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি চাঁদোয়া। কোণায় কোণায় ফুটো করে আংটা বসানো থাকে, তাতে দড়ি গলিয়ে দিতে হয়। এ-জাহাজেও খাটাবে, 'রেডসী' আসুক।

—তারপর?

মিয়ানী বললে, ওপরে তবু একটু-আধটু হাওয়া দেয়। আর আশ্চর্য, হাওয়া যখন দেয়, সেটা কিন্তু গরম নয়, বরং একটু ঠাণ্ডার ভাব আছে, খুব আরাম হয় যেন। অথচ সেদিন এমন দুর্দৈব, হাওয়াটাও যেন বন্ধ হয়ে আছে। তবু জলের ওপর অতটা গরম লাগছে না, কিন্তু ভাবতে পারো ইঞ্জিন রুমে যারা

কাজ করে তাদের অবস্থা? ওপরের 'ভেন্ট্‌স' দিয়ে 'ব্লোয়িং সিস্টেমে' নিচে হাওয়া যায় বটে, কিন্তু কতক্ষণ ওরা দাঁড়াবে ব্লোয়ারের নিচে? কাজ করতে হবে তো?

একটুক্ষণ কাজ করছে, আর অমনি ব্লোয়ারের নিচে এসে দাঁড়াচ্ছে। মনে করো তখন জলন্ত বয়লারে ফার্নেসের ঢাকা খুলে তাতে কয়লা ঢালতে হবে। সেই জাহাজে ইঞ্জিন-খালাসি ছিল কয়েকটি তুর্ক। এই লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ের রঙ টকটকে। কিন্তু আগুনে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। একজনের আবার সামান্য একটু দাড়ি ছিল, সরু গোঁফ ছিল, অযত্নরচিত দাড়ি গোঁফ। লোকটাকে দেখলে আমার মনে হতো, খাঁটি মুর, ওথেলো।

—'ওথেলো' মানে?

মিয়ানী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, ওথেলো কে, তা জানো না? সেক্‌স্‌পীয়র পড়ো নি?

—কে সেক্‌স্‌পীয়র?

মিয়ানী ওর দিকে সম্পূর্ণ ফিরে বসলো, ওর ফ্যালফ্যাল-করা-মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। বললে,—কালকুত্তার লোক সাহিত্যের খবর মোটামুটি জানে শুনেছিলাম, তুমি আমার ধারণাটা বদ্‌লে দিলে!

—আমি কি ছাই ইংরেজি জানি? তাহলে কি আর তোমাকে—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে মিয়ানী বলে উঠলো,—ইংরেজি না জানতে পারো, তোমার ভাষা জানো তো? তোমাদের কালকুত্তার ভাষায় সেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ হয়নি, এ আমার বিশ্বাস হয় না। অমন যে আমাদের ছোট্ট দ্বীপ সাইপ্রাস, সেখানেও 'সেক্‌সপীয়রের গল্প' মুখে মুখে প্রচলিত।

শিশির অধোবদনে চুপ করে রইলো। সত্যিই এবার তার লজ্জা করতে লাগলো। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, সুষমা তো কলেজে পড়ে, সে হয়ত জানে। সে তো এতদিন তাকে মুখে মুখে অনেক কিছু শেখাতে পারতো! মিয়ানী হাতের পুড়তে-পুড়তে-নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আর একটা ধরালো, তারপরে বললো, মরুক গে। আমি মনে মনে ওকে 'ওথেলো' বলেই ডাকতাম। এই তুর্করা, আমি সাইপ্রিয়ট্‌ বলে আমার সঙ্গে মিশতো না, কথাও বলতো না। আমি মনে মনে হাসতাম, বলতাম, আরে বাবা, জলে যাদের বাস, তাদের কি আর জাত আছে?

যাই হোক, ওনিংস-এর নিচে আমরা কজন খাটিয়ায় শুয়ে আছি, হঠাৎ

দেখি, ইঞ্জিন রুম থেকে 'ওথেলো' বেরিয়ে এলো। নীল রঙের ট্রাউজার পরনে, 'রেড সী'তে পড়লে গায়ে কিছু চড়াতো না ওরা। ওথেলো বেরিয়ে এসে মিডশিপ ঘেঁষে 'পোর্টসাইড-রেলিং' এ এসে দাঁড়ালো। দেখে মনে হচ্ছিল, কোনো পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে এসেছে। সারা গা ভেজা, বড়ো বড়ো চুলগুলো কপালে, রগে লেগে আছে। নীল প্যান্টটা লেপ্‌টে আছে গায়ে। ওথেলো সেই অবস্থায় করলো কী, হঠাৎ আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কী বলে চ্যাঁচালো ঠিক বুঝলাম না তারপরে দেখি, চোখের পলকে রেলিঙে উঠে অভিজ্ঞ সাঁতারুর মতো 'ডাইভ' দিয়ে সমুদ্রে পড়লো। ঘটনাটা এমন অবিশ্বাস্য যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার পাশে যে ছিল সে-ও আমার মতো উঠে বসেছে। সে-ও দেখেছে ব্যাপারটা নিজের চোখে। বললে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

—সে কী!

—হ্যাঁ,—বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নিচে, ডেকের ওপর নামলো। আমিও গেলাম। দেখতে দেখতে সারা জাহাজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটাকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু চলমান জাহাজ থেকে লক্ষই বা হবে কতটুকু? লস্‌করদের দু-চারজন যারা বাইরে ছিল, তারা ছুটে জাহাজের পিছনে গেল। খবর করা হলো ক্যাপ্টেনকে। জাহাজ থামানো হলো। ক্যাপ্টেন নিচে নেমে এলেন, পিছনে গিয়ে দূরবীন দিয়ে ভালো করে দেখলেন আর গম্ভীর মুখে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। যাদের বোট নামাবার হুকুম দিয়েছিলেন, হাত নাড়িয়ে তাদের নিরস্ত করলেন। পিছনে, জলের খানিকটা জুড়ে রক্তে রক্তে লাল। যে মুহূর্তে লোকটা পড়েছে, সেই মুহূর্তেই হাঙররা ওকে টেনে নিয়েছে। নিয়ে, কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে। থার্ড অফিসার আমার কাছে ছিল। বললে, এটা হচ্ছে রেড সী। রাক্ষুসে, হাঙরগুলো মাইলের পর মাইল জাহাজের সঙ্গে চলে আসে খাদ্যের আশায়।

সেই নিদারুণ রেড সী দিয়েই তখন চলছে জাহাজ। শিশির পোর্ট সাইডের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মিয়ানীর কথাগুলোই ভাবছিল। সমুদ্রটা ঠিক একেবারে বেগুনি রঙে পরিণত হয়েছে। মাথার ওপর দিয়ে একখণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে, তারই ছায়াটা কালো হয়ে একটা জায়গায় পড়েছে। জাহাজটাও যেমন চলছে, তেমনি চলছে মেঘটাও। জাহাজের পিছন থেকে 'বস্‌ন' যেন কাকে ডেকে কী

বললো। লোকগুলোর খালি পা। খুব খাটো হাফপ্যাণ্ট শুধু পরনে। শিশিরেরও পা খালি, তবে যতটা ভাষণ গরম সে কল্পনা করেছিল, ততটা গরম নয়। একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, জল-ছোঁয়া হাওয়াটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বলে মনোরম।

এডেনের স্মৃতিও ভোলবার নয়। সে এজেণ্টের অফিসে গিয়ে কাগজপত্রের কাজ মিটিয়ে তার নিজের এয়ারমেলের চিঠিটা ফেলে দিয়ে চলে আসছে, হঠাৎ লক্ষ করলো, তাদেরই জাহাজের একজন খালাসি একটা স্কুটারে করে চলেছে, পিছনে গোলাপী লম্বা গাউন আর মাথায় ঐ রঙের বড়ো রুমাল বাঁধা একটি মেয়ে, যা এডেনে দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার। মেয়েটি খালাসির পেটের কাছে একটি হাত রেখে পিছনের সিটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। স্কুটার চালক নাবিকটি তাকে দেখতে পায় নি। দিব্যি নতুন ভাঁজখোলা ভালো প্যাণ্ট আর হাওয়াই সার্ট পরনে। প্রায় তার সামনে দিয়েই একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় ঢুকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শিশির জাহাজে এসে দেখে, জাহাজটা প্রায় খালি। নেহাৎ যাদের ডিউটি ছিল, তারা যেতে পারে নি। কিন্তু তারাও খাঁচায়-বাঁধা জন্তুর মতো ছটফট করছে।

ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেছে ম্যারিয়াকে নিয়ে। এমন কি মিয়ানী পর্যন্ত জাহাজে নেই। দুপুরে খাবার সময়ও লোক কম। ক্যাপ্টেন স্বয়ং অনুপস্থিত, চীফ অফিসার পর্যন্ত নেই। থার্ড অফিসার আর চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছিল আরও দু-চারজন। স্টুয়ার্ডও নেই, বেরিয়ে গেছে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় ফিরলো ক্যাপ্টেন। আর তার কিছু পরেই ফিরে এলো মিয়ানী। শিশির যেন ছটফট করছিল, জিজ্ঞাসা করলো, গেছলে কোথায়?

খুশি মনে শিস্ দিচ্ছিল মিয়ানী, বললে, বেহেস্তে। তোমাকে এতো খুঁজলাম, পেলাম না। না হলে তোমাকেও ঘুরিয়ে আনতাম।

শিশির ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলো। একবার মনে হলো জিজ্ঞাসা করে ওর অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু দুরন্ত লজ্জাই শেষ পর্যন্ত তার কণ্ঠ চেপে ধরলো।

মিয়ানী নিজেই প্রসঙ্গ তুললো। বললো, এক দিক থেকে এডেন হচ্ছে নাবিকদের স্বর্গ। ফ্রি-পোর্ট। যে যার পছন্দমতো জিনিসপত্র কেনাকাটা করছে দেখ গিয়ে।

শিশির ওর এইসব কথায় মন না দিয়ে বলে উঠলো, আচ্ছা মিয়ানী, আমাদের এক খালাসিকে দেখলাম স্কুটারে করে ছুটেছে, পিছনে একটি মেয়ে। এখানে কি স্কুটারটা ও কিনেই ফেললো নাকি ?

হেসে মিয়ানী বললে,—না হে না, ভাড়া করেছে। ভাড়া পাওয়া যায়। স্কুটারও পাওয়া যায়, অনেক সময় মেয়েও পাওয়া যায়।

—এই এডেনে !

—অবাক হচ্ছো তো ? স্বাভাবিক। যেখানে বোরখা পরা মেয়েরা ঘোরে, সেখানে ওরা এলো কোত্থেকে। গত যুদ্ধের ঝরতি-পড়তি আর কী! যুদ্ধের সময় এডেন ছিল জরুরী একটা মিলিটারি বেস্। হয়ে পড়েছিল কস্মোপলিটান টাউন। নানান দেশ থেকে এসেছিল নানান লোক। ভিনদেশী মেয়েও এসে জুটেছিল, স্পেন থেকে, পর্তুগাল থেকে। তাদের কেউ রয়ে গেছে আর কী! তাদেরই একটা জুটিয়েছে বোধহয়। ওদের বলতে পারো স্কুটার সঙ্গিনী। লোকটা নির্জন জায়গা দেখে স্কুটারে করে ছুটে যাবে আর ফিরে আসবে। অন্য আর কিছু নয়। শুধু—

বলে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে যা বললে, তা শুনে কান দুটো গরম হয়ে উঠলো শিশিরের। কথাটা তার চেতনায় বাস্তবিকই ধাক্কা দিলো, সে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো ওখান থেকে। পিছন থেকে ভেসে আসতে লাগলো মিয়ানীর হাসি।

ভোরে জাহাজ ছেড়েছিল। কিন্তু শিশিরের অনেক করণীয় ব্যাপার ছিল। আজকাল চিঠির গৎ তার জানা হয়ে গেছে, মোটামুটি সাধারণ চিঠিগুলো সে নিজেই লিখে নিতে পারে। একটু অন্য ধরণের হলেই মিয়ানীর সাহায্য নেয়। প্রায় এগারোটায় সে কাজ শেষ করেছিল। ভোরে এজেন্টের লোক এলে তার হাতে কাগজপত্রগুলি সঁপে দিতে হবে। অবশ্য ক্যাপিতানির সই নিয়ে নিতে হবে তার আগে।

এইসব কাজটাজ শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল শিশির। রাতের দিকে তেমন গরম থাকে না, রাত যত বাড়ে, তত ঠাণ্ডা হয়ে আসে চারদিক। এমন কি, ভোর রাত্রে গায়ের ওপর চাদর টেনে দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য; কিছুতেই ঘুম আসছিল না শিশিরের। তার মনের মধ্যে মিয়ানীর কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। বারবার যেন একটা মাছি এসে বসছে তার গায়ের ওপর, বারবার তাকে তাড়ালেও সে যায় না, ঘুরে ফিরে আবার সে কাছে আসে।

শিশিরেরও হয়েছিল সেই অবস্থা। একসময় নিজের মনটাকে চাবুক মারবার জন্যই যেন জোর করে উচ্চারণ করে উঠেছিল,—সুষমা!

সে রাত্রের কথা তার বেশ মনে আছে। যেন আধো ঘুম আধো জাগরণ। একটা স্কুটারের মতো কী যেন। সে নিজে তার চালক। চালাতে ভালো জানে না, বারবার এঁকে বেঁকে যাচ্ছে, আর পিছনে যেন অতি চেনা একটি মানুষ। তার কোমল সরু হাতখানা যেন ক্রমশই তার তলপেটের দিকে নেমে আসতে লাগলো।

ধড়মড় করে উঠে বসলো শিশির। তার তন্দ্রা ছুটে গেল। নিজেকে যেন তার নিজেরই ভয় করতে লাগলো। আলো জ্বাললো। পোর্টহোল দিয়ে ঝলমল করা তারাগুলো দেখা যায়।

খুব আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলো শিশির। চারদিক নিশুতি। পোর্ট সাইডে কোয়ার্টার মাষ্টার নিশ্চয় ডিউটি দিচ্ছে। সে সেদিকে না গিয়ে ষ্টার বোর্ড সাইডের রেলিঙে এসে দাঁড়ালো। তারার আলো জলের ওপর পড়ে কাঁপছে। হাওয়ার বেগে ঢেউ জেগেছে সমুদ্রে। শিশির সেই ঠাণ্ডা জলের কণায়-ভরা বাতাস বুক ভরে নিতে লাগলো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।

এমন সময় হঠাৎ ওপর থেকে একটা চাপা স্বর ভেসে এলো,—হে?

চমকে তাকালো শিশির। ম্যারিয়া দাঁড়িয়ে। সেই ড্রেসিং গাউন পরা, মাথার খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। ফিসফিসিয়ে বললে,—ওপরে উঠে এসো।

শিশির মাথা নাড়লো। গেল না। মেয়েটা বললে, উঠে এসো বলছি। নইলে আমিই নিচে নেমে যাবো। এসো?

পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে শিশিরের। সে নিদারুণ ভয় পেয়েছে। ওপরে গেল না, ছুটে চলে গেল নিজের কেবিনে।

তারপরে এই নিদারুণ রেড সী। সেই হাঙরের গল্প আর মিয়ানীর সেই ওথেলো।

মিয়ানী ওকে দেখে একসময় বললে, কী হে, শামুকের মতো খোলের মধ্যে ঢুকে আছো কেন? বাইরে এসো।

শিশির ধীরে ধীরে বাইরে এলো, নিচের ডেকে। সবারই স্বল্প বাস পরনে.

গা খালি। যখন অবকাশ পাচ্ছে, বিয়ারের বোতল মুখের কাছে ধরছে। মিয়ানী বললে, দেখ না খেয়ে একদিন।

শিশির বললো,—না।

বলে আর ভয়ে ভয়ে ব্রীজের দিকে তাকায়। যদি আবার তার ডাক আসে,—হে?

মিয়ানী বললে, কী ব্যাপার? ক্যাপিতানির 'অ্যান্টিলোপী' খাঁচায় গিয়ে ঢুকেছে কেন? বাইরে দেখছি না যে বড়ো?

শিশির মিয়ানীর কাছে সরে এলো, কানে কানে বলার মতো স্বরে বললো, একটা কথা শুনবে মিয়ানী?

—কী?

—কাল রাতে আমাকে ডেকেছিল সে। আমি যাই নি।

মিয়ানীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। ওদের হাঁটতে হাঁটতে 'আফট্ পার্ট'-এ যাবার কথা, কিন্তু মিয়ানী থমকে দাঁড়ালো, বললে, এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—তোমার কেবিনে।

—কেন?

—কথা আছে।

গেল দুজনে। একান্ত নিভৃতিতে বসে মিয়ানী বললো,—কাল রাতে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেছে।

শিশির ওর দিকে উৎসুক চোখে তাকালো। মিয়ানী বললে, মেয়েটা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে শিশির বললে, তারপর!

মিয়ানী বললে, আমি আর কোয়ার্টার মাস্টার গ্যাংওয়ের কাছে গল্প করছিলাম। আর সবাই ঘুমিয়ে।

শিশির বললে, কখন এটা ঘটলো বলো তো?

—তা প্রায় ভোর-রাত্তিরে।

শিশির একটু চমকে উঠলো, ভাবলো, ডাকবার পরই কি এ-ঘটনা ঘটে?

ঠিক এ চিন্তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল মিয়ানীর কণ্ঠে,—তাহলে কি তোমার সঙ্গে কথা বলার পরই এটা হলো? বলে, একটু থেমে তারপরে আবার বললে,

—না, তোমাকে নিয়ে নয় বোধ হয়। ক্যাপিতানির সঙ্গে হয়ত কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়ে থাকবে। দুটো-একটা কথা যা আমাদের কানে ছিটকে এসে বাজছিল, তাতে মনে হলো, কথামতো আলেকজান্দ্রিয়ায় সে নেমে যেতে চায়, ক্যাপ্টেন তা চায় না, এই নিয়ে বাদানুবাদ। হয়ত ম্যারিয়া এ বিষয়েই কিছু বলতে চেয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে কেন শুনলে না বলো তো?

শিশির বললো, আমার বড্ড ভয় করছিল।

মিয়ানী ওর হাতটা চেপে ধরে বললে, তুমি একটা কাজ করো। কোনো এক অছিলায় দেখা করো ওর সঙ্গে। শোনো, ও কী বলতে চায়।

—ক্যাপিতানি যদি রেগে যায়?

মিয়ানী বললে, না-না, তোমার ওপর রাগ করবে না! তুমি অল্পবয়সী, তার ওপর ইণ্ডিয়ান। তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবে, চট করে সন্দেহ করবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশিরকে যেতে হলো না। সেই দিন রাত্রে, তখনো 'সুয়েজ' আসে নি, ওর ঘরের দরজার হাতল বাইরে থেকে খুলে ওর ঘরে ঢুকে পড়লো ক্যাপিতানি স্বয়ং। রাত তখন গভীর, চারদিক নিশুতি, ক্যাপিতানির মুখে মদের গন্ধ। সে বললে, হে ইন্দি, কাম আপ কুইক্, সী ওয়াটস্ ইউ।

ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে শিশির। তার ঘর ছিল অন্ধকার। অন্ধকারে যে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সত্যিই ক্যাপিতানি তো? ক্যাপিতানি হলে সে নিজেই তাকে কেন ওপরে নিয়ে যেতে চায় এই গভীর রাত্রে? মদ্যপায়ীর খেয়াল না অন্য কিছু?

পায়জামার ওপর সার্টটা গলিয়ে নিয়ে শিশির সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওপরে এলো। ক্যাপিতানি তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ওর দিকে ঘুরে বললে, গো ইনসাইদ।

ভিতরে গেল শিশির। এঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ নেই। পাশের ঘরে পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

জাহাজটা তখন সামনে পিছনে দুলতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রে ঢেউ জেগেছে, বাতাস বইছে সজোরে। একটা সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ যেন কামরাটাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরছে!

হঠাৎ ভিতরের সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,

—ভিতরে এসো।

বুকের ভিতরে আতঙ্কিত একটা জীব যেন থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে শিশির বলতে গেল, ম্যাডাম—

কিন্তু স্বর ফুটলো না ভালো করে। মনে হলো একটা ভীত জন্তু যেন ঘড়ঘড় আওয়াজ তুললো।

দপ করে জ্বলে উঠলো ভিতরের ঘরের আলোটা। ম্যারিয়া আবার বললে, ভিতরে এসো।

পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল শিশির। খাটের ধারে দেওয়াল ঘেঁষে একটা ইজিচেয়ার গোছের বস্তু আছে, তার ওপরে বসেছিল ম্যারিয়া পরণে সেই ঢোলা গাউন, মাথার চুল খোলা, এলোমেলো হয়ে আছে, চুল 'শ্যাম্পু' করলে যেরকম অবস্থা হয় সেরকম আর কী।

ও ঘরে ঢুকতেই সোজা হয়ে বসলো ম্যারিয়া। ওর দিকে তাকালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বললে, তুমি ছুটি চেয়েছিলে না?

শিশির কথাটা ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে হতভম্বের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। ম্যারিয়া আরও উত্তেজিত আর ধারালো গলায় বলে উঠলো, চুপ করে রইলে কেন? দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলে না? পোর্ট সৈয়দে নেমে যাও। ক্যাপিতানি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজী।

সত্যি কথা বলতে কী, শিশির তো এটাই চেয়েছিল। জাহাজে সে আসতে চায় নি। আর যদিই বা জাহাজে এলো, জাহাজ বম্বেতে পৌঁছবে, আর সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে যাবে, এটাই তো সাব্যস্ত ছিল। তার মানসিক প্রস্তুতিও হয়েছিল সেইভাবে। সেজন্য বম্বের পর থেকে শুরু হয়েছিল তার হৃদয়-যন্ত্রণা।

তাই এখন তো তার বলা উচিত। বলা উচিত, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে। শিশির নিজেকে নিজে 'ধাক্কা'ও দিতে চাইলো, আর কী সামনে সুয়েজ, তারপরে পোর্ট সৈয়দ, তল্পিতল্পা বাঁধো, প্রস্তুত হও। দেশে ফিরে একেবারে সুষমা দিদিমণির সামনে, 'এই দেখুন, আমি ফিরে এসেছি।' কিন্তু বাইরের 'শিশির' ভিতরের 'শিশির'কে নড়াতে পারলো না। চুপ করে স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো। ঈষৎ বিস্ময়ের আভা ফুটে উঠলো ম্যারিয়ার চোখে। সে বললে, কী? চুপ করে যে? উত্তর দাও?

শিশির বললে, হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছেন কেন ?

—হঠাৎ কেন হবে ? তুমি তো ছেড়ে যেতেই চাইছিলে ?

—ক্যাপিতানি রাজী হলেন ?

—কেন রাজী হবেন না ?

—আমার কাজ কে করবে ?

—সে ভাববে ওরা। তোমার তা নিয়ে মাথা ব্যথার কী দরকার ?

শিশির নিরুত্তরে মাথা নিচু করে রইলো। ম্যারিয়াও চুপচাপ। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের প্রান্ত চেপে রেখে সে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

জাহাজটা তখন বেশ দুলছিল। বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ একটা তো ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হলো সমুদ্রের মন্দ্রকল্লোল। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, যেন চারদিকেই নানান লোকেরা একসঙ্গে জটলা করছে।

শিশির মুখ তুললো। আর ঠিক সেই সময় ম্যারিয়াও মুখ ফেরালো ওর দিকে। সুন্দর মুখখানি কিসের একটা ক্ষোভের উত্তাপে আরও রাঙা হয়ে উঠেছে, বাল্বের আলোতেও তা যেন অনুভব করা যায়। শিশির বলে উঠলো, আপনি রাগ করেছেন ?

ম্যারিয়ার চোখদুটি হঠাৎ-ই জলে ভরে উঠলো এ কথায়, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালো।

শিশির বললে, আমি কি কোনো দোষ করেছি ?

ম্যারিয়া মুখ না ফিরিয়েই নিচু গলায় উত্তর দিলো, কে বলেছে সে কথা ?

তবে ?

—তবে কী ?—ম্যারিয়া মুখ ফেরালো ওর দিকে।

—আমাকে তাহলে চলে যেতে হচ্ছে কেন ?

এবার ম্যারিয়ার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো বিচিত্র হাসি। বললে,—ও, তাহলে তুমি যেতে চাও না ? জাহাজেই থাকতে চাও ?

শিশির একটুক্ষণ থেমে থেকে আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, মন্দ কী। নতুন নতুন দেশ দেখা হবে ?

ম্যারিয়া ওর দিকে অদ্ভুত একরকম দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। শিশির বললে, কাজ তো মোটামুটি আমি শিখে নিয়েছি।

—ছাই নিয়েছো।—ম্যারিয়া বললে, আমি জানি না, বুঝি না কিছু ? যে তোমাকে পিছন থেকে চালনা করছে, তাকে বলে দিও, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাকে আমি গুলি করে মারবো।

শিশিরের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। মনে হলো, আশ্চর্য নয়, এই মেয়ে ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে! সে বললে, আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন! সে আমাকে সাহায্য করে, চালনা করে না।

ম্যারিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, দু-এক পা হয়ত বা ওর দিকে একটু এগিয়েই এলো। তারপরে বললে, ঠিক আছে, তার আর আমার ব্যাপার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বলতে বলতে দুটি হাত ওর কাঁধের ওপর রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে একটু পিছিয়ে গেল শিশির। ম্যারিয়া অবাক হয়ে বললে, কী হলো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে শিশির বললে, একটা সত্যি কথা বলবেন?

—কী?

—কাল নাকি আপনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন?

একটু অবাক হয়েই ম্যারিয়া বললে, কে বললে একথা!

—যে-ই বলে থাকুক, আমি শুনেছি।

আবার সেই রকম দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রইলো কিছুক্ষণ ম্যারিয়া, তারপরে বললে,—নিশ্চয়ই মিয়ানী বলেছে একথা? ও আমার সব খোঁজখবরই রাখে দেখছি!

—তাহলে একথা সত্যি? এই হাঙর ভরা সমুদ্রে আপনি—

ম্যারিয়া দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দুটি হাত দিয়ে ওর ঘাড়ের কাছটা জড়িয়ে ধরলো, বললে,—যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? প্রেমে পড়েছো নাকি?

দুটি কবোষ্ণ নরম বাহু তার ঘাড়ের কাছে বেষ্টন করে আছে, তার চোখেমুখে যেন লাগছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। শিশির বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, যদি বলি, হ্যাঁ?

ওকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎই চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ম্যারিয়া। হাসতে হাসতে পিছন ফিরলো। দুটি হাত মুখে চেপে উচ্ছ্বাসকে যেন দমন করতে চাইলো। তারপরে একসময় ঘুরে আবার ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো সে। মুখখানি রাঙা। হাসির দমকটা সামলে নিয়েছে, তবু চোখেমুখে কৌতুক ও কৌতূহল যেন যুগপৎ খেলা করছে।

ম্যারিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, ইণ্ডিয়ানরা যখন প্রেমে পড়ে, তখন খুব গভীর ভাবেই পড়ে, তাই না?

একটা বিহ্বলতার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে শিশিরকে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে,—হ্যাঁ।

ম্যারিয়া আবার ওর দিকে এগিয়ে এলো। বললে, কতখানি গভীর হয়েছে তোমার প্রেম?

—আমি জানি না—আমি জানি না—বলতে বলতে সে যেন জোর করে নিজেকে ছিট্‌কে সরিয়ে নিয়ে এলো পাশের ঘরে।

পাশের ঘরটা অন্ধকারই ছিল। শুধু এক কোণের একটা চেয়ার থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার অস্পষ্ট একটি কুণ্ডলী উঠছে। ধোঁয়ার থেকে সিগারেটের গন্ধটাই ওর নাসিকায় প্রবেশ করলো আগে। থমকে দাঁড়ালো। কী জানি কেন, সঙ্গে সঙ্গে ওর মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল।

—দেন ইউ গো অফ্ (off) দি শীপ?—ক্যাপিতানির কণ্ঠস্বর।

—স্যার?

ক্যাপিতানি তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে, নো ফিয়ার। গেত্ দাউন।

সেই চেয়ারটার দিকে শিশির এগিয়ে গেল। তারপর শুষ্ক গলাটা ঢোঁক গিলে একটু নরম করে শিশির বোঝাতে গেল, ম্যাডাম সে—জ—

—আই নো—আই নো।

আর ঠিক সেই সময়ে এ-ঘরের ভিতরে চলে এলো ম্যারিয়া। এসেই আলোটা জেলে দিলে। হঠাৎ-ই চোখে আলো লাগায় হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করলো ক্যাপিতানি। তার দিকে তেড়ে গিয়ে ম্যারিয়া গ্রীক ভাষায় কী যেন বলে উঠলো। শুনে মনে হলো, যেন প্রচণ্ড ঝগড়ার কথা চলছে।

ক্যাপিতানির কণ্ঠ কিন্তু নিস্তেজ, ধীর-স্থির। সে বরং আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো, বললে, অল রাইত্—অল রাইত্—ইউ সেত্‌ল (settle) আপ, আই গো হুইল হাউস। শীপ লিস্‌টিং (জাহাজ ঢুলছে)।

বলতে বলতে বাইরে চলে গেল ক্যাপিতানি। ম্যারিয়া ঘুরে দাঁড়ালো ওর দিকে, বললে, জানো? ক্যাপিতানির সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে।

—কেন?

—তোমাকে নিয়ে।

রুদ্ধশ্বাসে ভীত গলায় প্রশ্ন করলো শিশির, কেন!

ম্যারিয়া বললে ভয় নেই, তোমাকে ও হিংসা করে না। ও বলতে চায়, তোমার সঙ্গে বেশি গল্প করলে জাহাজের অন্য লোকেরা ক্ষেপে যেতে পারে।

—তার মানে!

ম্যারিয়া বললে, ক্যাপিতানি বলে, হয় সবার সঙ্গে গল্প করো, আর নয়ত কারও সঙ্গে কোরো না। কী কাণ্ড বলো দেখি! লোকটা খালি 'ক্ষেপে যাবে—ক্ষেপে যাবে' বলে শাসায়! কই, কেউ তো ক্ষেপে না?

শিশির বললে, আপনিই বা ওর কথা শুনে চলেন না কেন?

—ঈস!—ম্যারিয়া বললে, দুদিনের জন্য আমার মালিক হয়েছে বলে কি আমার স্বাধীনতায় হাত দেবে নাকি?

বলতে বলতে আবার ওর কাছে সরে এলো, ওর একটা হাত হাতের মধ্যে তুলে নিলো। বললে, জাহাজ সুয়েজে যখন ধরবে, তখন আমার সঙ্গে যাবে মরুভূমিতে?

তারপরে ওর হাতটা দোলাতে দোলাতে বললে, মরুভূমিতে আমরা হারিয়ে যাবো, ফিরবো না।

শিশির ওর ভাবালুতার সুরে সুর মেলালো না। সে বললে, আমি বড়ো ভীতু, জানেন? আমার—

বাকি কথাটা সে শেষ করতে পারলো না।

ম্যারিয়া বললে, যা বলছি শোনো, পোর্ট সৈয়দে নেমে যাবে। যখন ক্যাপিতানি ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তোমাব ভয়টা কিসের? কোনো ভয় নেই, আমিও তোমার সঙ্গে নামবো।

—মানে?

আবার সেই বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো ম্যারিয়ার মুখে। বললে, ক্যাপিতানি আমাকেও ছেড়ে দিচ্ছে। বুঝলে না? আমি আবার স্বাধীন। তখন তোমাকে আমাকে কারও কাছে কোনোরকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

আশ্চর্য, এত বড়ো সিদ্ধান্তের কথাটা শিশির মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারলো না। ম্যারিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে [illegible] নামবার সিঁড়িটার কাছে দাঁড়ালো। জাহাজটা তখন অসম্ভব দুলছিল, আর দুলছিল বলেই ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য শিশিরকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো, নইলে তার মনের যা অবস্থা, তখুনি তরতর করে তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার কথা।

থমকে একটু দাঁড়ালো সে। হুইল হাউস থেকে দ্রুতপায়ে থার্ড অফিসার বেরিয়ে এলো, ওর পাশ দিয়ে হন হন করে নিচে নামছিল, শিশির জিজ্ঞাসা করলো,—ক্যাপিতানি ?

থার্ড অফিসার ওর প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝলো বলে মনে হলো। হাত তুলে হুইল হাউসটা দেখালো, তারপরে অভ্যস্ত পায়ে নিচে নেমে গেল। জাহাজ এত দুলছে, তবু ওদের স্বচ্ছন্দ গতিতে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা হয় না।

শিশির নিচে নামলো না। তার ভয় হলো, নিচে নামলেই মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে মিয়ানীর। তার সেই তীর্যক দৃষ্টি বিদ্ধ করবে তাকে, প্রশ্ন করবে, কী কথা হলো ? সব কথাই সে তাকে বলেছে, কিন্তু আজকের কথাটা তার কারও কাছে ব্যক্ত করতে ইচ্ছে করলো না। কথাটা যে ভয়ঙ্কর! একটি অজ্ঞাত-কুলশীল তরুণীর সঙ্গে মরুর বুকে হারিয়ে যাওয়া! আর তা-ও তার মতো মানুষের পক্ষে! যে পৃথিবীর কিছুই জানে না, মন যার ভীরু, অভিজ্ঞতা যাকে নিকষ কঠিন পাথরে ঘষে বিশ্বের জনারণ্যে ছেড়ে দেয় নি! মিয়ানী শুনলে গর্জে উঠবে, বলবে, নিজের ঘরের কথা ভেবেছো ? নিজের প্রেমের কথা ? কিন্তু সেখানেও যে প্রচণ্ড সংশয়ের কৃষ্ণ যবনিকাখানি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

শিশির ভাবতে ভাবতে বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই হুইল হাউসের কাছে উঠে এলো। চমক ভাঙলো ক্যাপিতানির গম্ভীর কণ্ঠস্বরে,—হুজ দ্যাট ?

তাড়াতাড়ি দরজার ফাঁকে আরও সরে এলো। ক্যাপিতানি হুইলের দুটি হাতল দুহাতে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, কাম ইন ?

শিশির ভিতরে এলো। ক্যাপিতানি হুইলের দুটি হাতলে হাত রেখে দৃঢ়ভাবে চালনা করছে নিজেই। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকেই আবদ্ধ। একজন লস্কর সার্চলাইটের মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রীজের ফাঁক দিয়ে বাইরে আলো ফেলছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। সেই আলোয় সামনের সমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কী যেন দেখছে ক্যাপিতানি। তার উদ্দেশে বললে, নাউ লুক ইন্দি, দিস ইজ গাল্ফ অব সুয়েজ—উই গো সুয়েজ—স্তে ওয়ান অর তু দেজ (দু-একদিন থাকবো), দেন লিত্‌ল বিতার লেক অ্যান্দ্‌ গ্রেত্‌ বিতার লেক, দেন গো ইসমাইলিয়া। গদ নোজ হাউ মেনি দেজ ওয়েতিং (ঈশ্বর জানেন কতদিন সেখানে অপেক্ষা করতে হয়)—লত্‌ অব শীপ্‌স্‌ মেকিং কিউ তু এনতার দ কেনাল (বহু জাহাজ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুয়েজ

ক্যানেলে ঢুকবার জন্য)—দেন উই গো পোর্ত সৈয়দ অ্যান্দ্‌ উই গেত্‌ দাউন। তেক হার হোম। (ওকে বাড়ি নিয়ে যাও)।

অবাক হয়েই ওর কথাগুলো শুনছিল শিশির। এতদিনের অভ্যাসে বুঝতে ওর অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু, 'লিত্‌ল বিতার লেক', গ্রেত্‌ বিতার লেক', 'ইসমাইলিয়া',—এসব সে কিছুই বুঝছিল না। কিন্তু সেসব কথার থেকে 'তেক্‌ হার হোম' কথাটাই মারাত্মক।

শিশির বলতে গেল, কিন্তু আমি কেন স্যর ?

'স্যর' বললে, অল রাইত্‌—অল রাইত্‌—ইয়ু নো গো—(তোমাকে যেতে হবে না)—শী গো এলোন (ও একাই যাবে)।

এক কথায় সবকিছু ওলোট-পালট করে দিলো ক্যাপিতানি। এটা ওদের স্বভাবই বোধ হয়। কিম্বা, ভাষার অন্তরায় বলে কথা বাড়াতে চায় না, এক কথায় সব সিদ্ধান্ত পালটে দেয়।

শিশির আবারও বলতে গেল, কিন্তু উনি যাবেনই বা কেন ?

কাঁধ ঝাঁকানীর সেই অভ্যস্ত ভঙ্গিটি করলো ক্যাপিতানি, তারপরে বললো, —লেত্‌ হার গো—আই দোন্ত ওয়ান্ত্‌—কথাটা শেষ না করে সামনের আলোয় কী লক্ষ করে ওদের ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো। লস্‌করটি দৌড়ে কাছে এলো। হুইলটা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্যাপিতানি জানালার কাছে এগিয়ে গেল। তারপরে ওখানে দাঁড়িয়েই লস্‌করকে কী সব নির্দেশ দিতে লাগলো।

এতক্ষণে থার্ড অফিসারটি ফিরে এসেছে। ক্যাপিতানি তাকেও যেন কী বললো। সে হুইল হাউস ছেড়ে ব্রীজে গিয়ে সার্চলাইটের মতো আর একটা যন্ত্র দিয়ে 'লাইট্‌-সিগন্যাল' করতে লাগলো। এ যেন আলোয় আলোয় কথাবার্তা। জাহাজ মন্থরগতি, দূরে একটা লাইট হাউসের চূড়া দেখা যায়, সেখান থেকে আলো জ্বলে জ্বলে উঠছে, আর প্রত্যুত্তরে থার্ড অফিসার আলোটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করছে।

ক্যাপিতানি শিশিরের দিকে মুখ ফেরালো, বললো, হে ইন্দি, তেল্‌ মিয়ানী উই কাম সুয়েজ। (মিয়ানীকে গিয়ে বলো আমরা সুয়েজে পৌঁছেছি)।

বেশ দ্রুত গতিতেই এবার ছুটে গেল শিশির, কিন্তু নিচে কোথাও মিয়ানীকে দেখতে পেলো না। চীফ অফিসার কেবিন থেকে বেরিয়ে বস্‌নকে ডাকছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে আঙুল দিয়ে ওপরের দিকটা দেখালো। জাহাজ সুয়েজে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে জাহাজের।

শিশির তাই আবার এলো ওপরে। ক্যাপিতানির ঘরে যথারীতি পর্দা ফেলা, ভিতরে রেডিও বাজছে। এখানে এতো রাত, পৃথিবীর কোথায় কোন দেশে বুঝি সন্ধ্যা রাত, সেখানকার রেডিও কেন্দ্রে বিচিত্র সুর বাজছে যন্ত্রসংগীতে। ম্যারিয়া রেডিও খুলে সেই সঙ্গীতছন্দে তন্ময়। হুইল হাউসে ক্যাপিতানি কর্তব্যরত, জাহাজ জুড়ে কর্মচাঞ্চল্য, কিন্তু সেসব দিকে তার বুঝি ভ্রুক্ষেপও নেই।

শিশির ওয়ারলেস ঘরেই খুঁজে পেলো মিয়ানীকে। কানে যন্ত্রদুটি বসিয়ে সে তার কর্তব্যকর্মে নিমগ্ন হয়ে গেছে। শিশিরকে দেখে মুখ ফেরালো, কী খবর ?

শিশির বললে—ক্যাপ্টেন পাঠালো। আমরা সুয়েজে পৌছেছি।

মিয়ানী বললে, —না, তা ঠিক নয়, সুয়েজের দ্বারদেশে পৌছেছি। এখানে আমাদের নোঙর ফেলে থাকতে হবে। কাল পাইলট্ এলে, তখন লিট্‌ল বিটার লেকের দিকে রওনা।

ঐ নামটা ক্যাপ্টেনও বলছিল বটে, আরও একটা কী নাম—

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিয়ানী বললে, গ্রেট্ বিটার লেক। এ দুটোই পর পর আমাদের পার হয়ে যেতে হবে ইসমাইলিয়া পর্যন্ত। ইসমাইলিয়া থেকেই প্রকৃত সুয়েজ খাল আরম্ভ। কিন্তু এসব কথা থাক, আসল কথাটা বলো। ম্যাডাম তো রাত জেগে রেডিওর বাজনা শুনছে। তোমার সঙ্গে কী কথাঁবার্তা হলো ?

মিয়ানীকে বলবার জন্যই তো তার মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, শিশির কিছুই বলতে পারলো না। তবু বললে, উনি শহরে ঘুরতে বেরোবেন, আমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

মিয়ানী একটু হেসে বললে, ঝগড়া কি মেটেনি ?

—কাদের ?

— ক্যাপিতানি আর তার অ্যান্টিলোপীর ?

—কী জানি।

— তোমাকে দিচ্ছে কেন ম্যারিয়ার সঙ্গে ? নিজে না গিয়ে ?

শিশির কিছু বললো না। তার বুকের ভিতরে চাপা একধরনের উত্তেজনা থরথর করে কাঁপছিল। একবার মনে হলো, বলেই ফেলে সে সমস্ত কথা মিয়ানীকে। কিন্তু পরক্ষণেই সে মূক হয়ে গেল। ম্যারিয়া তাকে কী সংকল্পের কথা জানিয়েছে, ক্যাপিতানিও অবশেষে তাকে কী বলেছে, কিছুই সে বলতে পারলো না।

ধীরে ধীরে সরে এলো সে মিয়ানীর কাছ থেকে। তখনো রেডিওটা বাজছে ম্যারিয়ার ঘরে। নিচে নেমে এলো শিশির। একবার রেলিং ধরে দাঁড়ালো, জাহাজ তখন নোঙর ফেলছে, ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিল শিকলের। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লো শিশির। আর, শুয়ে শুয়েই টের পেলো, জাহাজের হাঁকডাক কমে আসছে। কতো কী এলো-মেলো চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগলো মাথার ভিতরে। একসময় 'আধো ঘুমে আধো জাগরণে' তার মনে হতে লাগলো, সেজোবাবুর সঙ্গে মনে মনে কলহ করে চলেছে। আর একবার মনে হলো, তার টাইপরাইটারে সে ক্রমাগত স্পিড্ তুলবার চেষ্টা করছে আর মিয়ানী ধমকাচ্ছে, আরও স্পিড চাই, নইলে জাহাজে তোমাকে রাখবে কেন ?

এইভাবে একটা তীব্র অস্বস্তির স্বরে আচ্ছন্ন হয়ে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম ভাঙলো দরজায় একটা 'ঠকঠক' শব্দ শুনে। আগন্তুক হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে পারতো, কিন্তু ভদ্রতা করে সে তা না করে দরজায় 'নক্' করলো।

—কাম ইন।

ঢুকলো মিয়ানী।

—কী ব্যাপার ?

মিয়ানী তাকে ইঙ্গিত করলো বাইরে আসতে। বাথরুম হয়ে বাইরে এলো শিশির। পোর্টসাইডের রেলিং-ঘেঁষে মিয়ানী দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তীরভূমি স্পষ্ট চোখে পড়ে। খেজুর গাছ আর বালিয়াড়ি। তার মাঝে মাঝে পাকাবাড়ি, টিনের শেড। ভোর হয়ে গেছে তবু ইলেকট্রিক বাতিগুলো জ্বলছে।

জল স্থির। নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতো শান্ত কয়েকটা শুভ্র সীগাল্ পাখি ডানা মেলে ঘুরপাক খাচ্ছে। জাহাজের গ্যাং-ওয়েটা ফেলা নেই। তবু যেখানে ফেলা হবে, সেই জায়গাটা আন্দাজ করে করে একটি ছোট পান্সি নৌকো এসে হাজির। ঠিক তাদের সেই খিদিরপুরের গঙ্গার মতো। মাঝি একজন। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা সার্ট আর কাবুলিদের মতো পায়জামা। দাড়ি গোঁফ কিন্তু কামানো। লোকটা ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো। গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে বললে, সাব, গো আউট ?

মিয়ানী শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, বললো, বুঝতে পারলে কী বলছে ?

—পারে যাবার কথা বলছে তো ?

মিয়ানী মুচ্কি হাসলো, বললো, শুধু পারে কেন, অনেক জায়গায় যাবার কথা বলছে।

শিশিরের কানের কাছটা গরম হয়ে উঠলো। লজ্জাটা একটু সামলে নিয়ে বললে, তা যাও না তুমি ?

মিয়ানী সামান্য একটু শব্দ করে হাসলো। রাত্রের ডিউটিতে যে কোয়ার্টার মাস্টারটি ছিল, তার ডিউটি তখনো 'অফ' হয়নি, সে হাঁটতে হাঁটতে ওদের ভাষায় কী যেন বললো। লোকটা তাকালো নিচের দিকে।

নৌকোর মাঝিটা তখন পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করেছে, —সাব, মান ?

কোয়ার্টার মাষ্টার হাত নেড়ে জানালো, নো মানি।

শিশির ব্যাপারটা এতদিনে বুঝে গেছে। এ-ও সেই খিদিরপুরের মতো। অন্ধকার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো, জাহাজী লস্কররা বেরোলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছোট করে বলবে, সাব, মানি ?

জাহাজীদের কাছে বাড়তি জমানো টাকা কিছু কিছু থাকে অনেক সময়। কিন্তু সেসব হচ্ছে অন্য দেশের টাকা।

কলকাতায় চলবে কেন ? ঐ লোকগুলো বিদেশী নোটের বদলে টাকা দেবে বেশ কিছু লাভ নিজের জন্য রেখে দিয়ে। শিশির বুঝলো, এ-ও তাই। তাদের টাকা বদলে মিশরী নোট্ দেবে।

মাঝিটা নোটগুলো পকেটে রেখে দিয়ে আবার মুখ উঁচু করলো। হাসতে লাগলো। সামনের গোটাকয়েক দাঁত সোনা বাঁধানো। মিয়ানী চেঁচিয়ে বললে, হাসছো কেন ?

মাঝি বললে, অল্ স্লিপ্। আই ওয়েট। (সবাই ঘুমুচ্ছে, আমি একটু অপেক্ষা করি)।

মিয়ানী হেঁকে বললে,—হে, নো পুলিস, নো কাষ্ট্ম্স্ ?

মাঝি মাথা নেড়ে বললে, নো কাষ্ট্ম্স্। নো ট্রাবল নাউ। দে অল্

স্লিপ্। (এখন পুলিশও নেই, কাষ্টম্‌স্‌ও নেই, কোনো ঝামেলাও নেই, ওরা সব এখন ঘুমুচ্ছে।)

মিয়ানী আবার হেঁকে বললে,—হোয়াট্ অ্যাবাউট্ 'গাল্‌স্?' দে অল্ স্লিপ্ টু? (ছুঁড়িগুলোর খবর কী? তারাও কি সবাই ঘুমুচ্ছে?)

মাঝি হাসলো আবার। বললে,—নো, দে ওয়েক। কাম। নাইস স্টাফ্। (না, ওরা জেগেছে। এসো না? খাসা দেখতে)।

মিয়ানী হাসতে লাগলো, গলা নামিয়ে বললে,—উই হ্যাভ ওয়ান। নাইস স্টাফ্। (আমাদেরও একটি আছে, খাসা দেখতে)।

মাঝি একটু অবাক হলো বোধ হয়। কিন্তু খানিকক্ষণ। আবার সে হাসতে লাগলো তেমনি করে।

শিশির বললে, আচ্ছা, যতদূর দেখতে পাচ্ছি, কয়েকটা বাড়ি, খেজুর গাছ আর বালির পাহাড়। এর মধ্যে আবার ওসব এলো কোথা থেকে?

মিয়ানী বললে—বালির ওপারে শহর আছে। বাড়িঘর—গাড়ি—উট—এমনকি রেলষ্টেশনও আছে।

বলতে বলতে ওর মুখের ওপর থেকে সেই কৌতুকের আভাটা যেন মিলিয়ে গেল। বললে—ভিতরে এসো। কফি খাওয়া যাক।

দুজনে দু কাপ কফি নিয়ে শিশিরের কেবিনে এসেই বসলো।

চুমুক দিতে দিতে মিয়ানী বললে, এই সুয়েজ হয়ে আমি একবার এক জায়গায় গিয়েছিলাম। ট্রেনে করে 'কায়রো' যাওয়া যায়, আবার অন্যপথে 'আলেকজান্দ্রিয়া' যাওয়া যায়। আমি আলেকজান্দ্রিয়া গিয়েছিলাম। কী, চমকে উঠলে যে?

শিশির বললে, না, মানে—

মিয়ানী বললে,—আমি জানি কেন তুমি চমকে উঠেছো। আমার মতো তুমিও জানো, ম্যারিয়ার বাড়ি আলেকজান্দ্রিয়ায়। হ্যাঁ তাই, আমি ম্যারিয়ারই সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়েছিলাম। এই তো গত ট্রিপে। ঠিক এখনকার মতোই ব্যাপার। ক্যাপিতানির সঙ্গে ঝগড়া। শেষকালে ক্যাপিতানি ওকে ছুটি দিলেন দিন কয়েকের জন্য। পোর্ট সৈয়দে এসে আমরা আবার জাহাজে উঠলাম।

শিশিরের কফির পেয়ালাশুদ্ধ হাতটা কাঁপছিল। মিয়ানী সেটা লক্ষ করলো। বললে,—একটু পরেই হয়ত তুমি ওর সঙ্গে শহরে বেড়াতে যাবে। কিন্তু শহর

ছেড়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যাবে না তো? আমি জানি, চুক্তি হিসাবে ম্যারিয়ার আলেকজান্দ্রিয়াতেই নেমে যাবার কথা।

কফির গেলাসটা রেখে শিশির ওর একটা হাত চেপে ধরলো, উত্তেজিত গলায় বললে, আমাকে মাপ করো আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম। প্রথমে হয়েছিল পোর্ট সৈয়দে নেমে যাবার কথা। আমি আর ফিরবো না, ওকে পৌঁছে দিয়ে দেশে ফিরে যাবো।

—তারপর?

—তারপর ম্যারিয়া বললে, সুয়েজেই নামবে। মরুভূমিতে হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা আর ফিরবো না।

—ম্যারিয়াও না?

—না।

গম্ভীর কণ্ঠে মিয়ানী বললে, এটাই নতুন লাগছে। যাক, তারপর?

শিশির ঢোঁক গিলে বললে, তারপর আর কী?

মিয়ানী বললে, তুমি কী স্থির করলে?

শিশির দুটি হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো, ক্লিষ্টকণ্ঠে বললে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

মিয়ানী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তুমি যদি না যাও ওর সঙ্গে?

চোখ থেকে হাত সরালো শিশির, বললে,—ক্যাপিতানি তা-ও বলেছে। বলেছে, ও তাহলে একা যাবে।

এ কথায় যেন নিশ্চিন্ত হলো মিয়ানী, বললে,—তা-ই যাক না। ব্যস, আর কোনো কথা নয়। তুমি টাইপরাইটার নিয়ে এসো। যখন জাহাজী লোক হয়েই থেকে গেলে, অন্তত ছ-মাসের মধ্যে দেশে ফিরতে পারছো না। কিন্তু ক্ষতি কী তাতে, চিঠির পর চিঠি লেখো দেশে।

—উত্তর পাচ্ছি কই?

মিয়ানী উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলো, বললে, পাবে—পাবে। পোর্ট সৈয়দ আসুক।

যেন এ-ব্যাপারের ওপর যবনিকা পড়ে গেছে, এমনি ভঙ্গিতে মিয়ানী বলতে লাগলো,—জানো? আলেকজান্দ্রিয়ার পুরোনো শহরের দিকটা বড়ো ঘিঞ্জি। পুরোনো শহর তো? গম্বুজওলা সেকেলে অট্টালিকাও অনেক দেখতে পাবে।

অনেকটা দুর্গের মতো, বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল একসময়। এখন সব ইটের পাঁচিল দিয়ে ভিতরে-ভিতরে ভাগ হয়ে গেছে।

—তুমি কদিন ছিলে?

—কদিন আর? দিন তিনেক। দুর্গের মতো একটা বাড়ির এক কোণে। ইটের পাঁচিল দিয়ে ভাগ করা একটা অংশ। গোটা তিনেক ঘর নিয়ে ওরা থাকে।

—কারা?

মিয়ানী বললে, ম্যারিয়া। ম্যারিয়ার দিদিমা। বুড়ি খুব অদ্ভুত মানুষ। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে কোন্ দেশের লোক তুমি? বললাম, সাইপ্রাস ব্যস, বুড়ি সেই যে বিরস মুখ করে আমার কাছ থেকে উঠে গেল, আর কাছে আসে নি। লম্বা, সাদা আলখাল্লার মতো গাউন পরা, পা পর্যন্ত ঢাকা। তার ওপর চাদর জড়িয়ে থাকে। যেন তোমাদের কালকুত্তার কোনো বুড়ি।

শিশির অবাক হয়েই সব শুনছিল। কিন্তু সে কি ঘুণাক্ষরেও জানতো, মিয়ানীর মতো এ-অভিজ্ঞতা সে-ও লাভ করবে, এবং অচিরেই?

বেলা প্রায় দশটার সময় পাইলট-বোট এসে লাগলো। পাইলটের সঙ্গে কী কথাবার্তা হলো ক্যাপিতানির কে জানে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল, তার ছোট ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে ম্যারিয়ার পাশে সে বোটে গিয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেনই ডেকে পাঠিয়েছিল আগে। বললে, ম্যারিয়া একা যেতে পারবে না, তুমি সঙ্গে যাও। ইসমাইলিয়াতে অনেক জাহাজ জমে আছে, দিন পাঁচ-ছয় ওখানে থাকতে হবে। তুমি পোর্ট সৈয়দে চলে আসবে। সেখানে যদি দেখ, জাহাজ পৌঁছয়নি, তাহলে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে আর আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। তোমার টাকাকড়ি নিয়ে যাও। ও-মাসের মাইনেটাও দিয়ে দিচ্ছি। ফর্মে আমি সই করে দিচ্ছি, তুমি পরে 'ফিল আপ' করে নিও। সঙ্গে তোমার আইডেনটিটি কার্ড ও সার্ভিস বুকটা নিয়ে নাও। আর ফর্ম আছে—ছুটির। সেটিও সই করে দিচ্ছি। নামটাম সব বসিয়ে নিয়ো। যাও।

যেন ঝড়ের বেগে সব কিছু হয়ে গেল।

•

প্রথমেই সে ছুটে গেল মিয়ানীর কাছে। মিয়ানী সব শুনে শান্ত গলায় বললে, আমি জানতাম। কোনো ভয় নেই। কিন্তু খবরদার, নিজেকে সামলে রাখবে। আর, দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে না। এখনো পোক্ত হও নি, একা একা বিপদে পড়বে। যথাসময়ে ঠিক পোর্ট সৈয়দে আসবে। কেমন? চিয়ারিও।

—চিয়ারিও।

বোটটা জল কেটে কেটে যত তীরের দিকে যাচ্ছে, তত যেন ভয় করছে শিশিরের। একবার মনে হলো, দিদিমণির চিঠি আসবে পোর্ট সৈয়দে, মিয়ানীকে বলা হলো না, যত্ন করে সে রেখে দিতো। আবার মনে হলো, চিঠিতে কী লিখবে? কেমন করে চিঠি লেখে মেয়েরা? কী সব লেখে? ওদিক থেকে একটা ভয়-ভয়-করা ভাবই জমা হয়ে আছে তার মনে। আর এদিকে অদ্ভুত এক আকর্ষণ—যা অজানিত, তাকে জানবার। দেখাই যাক না, তাকে নিয়ে কী করে ম্যারিয়া। সে ইণ্ডিয়ান, তাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসাই করতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

তীরে নামতেই একদল লোক তাদের ছেঁকে ধরলো। তার মধ্যে পুলিসও আছে, কাষ্ট্‌মস্‌ও আছে। তাদের ঝামেলা চুকিয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি। একটা লোক ওদের দুজনের হাতের ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশদুটো যেন ছিনিয়ে নিলো। ম্যারিয়া হেসে ওকে বললো, ডরো মৎ। সামান লেতা হায়। কুলি।

এরপরে রেলষ্টেশন। ট্রেন। হৈ হৈ। একটি উঁচু শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসলো ওরা। এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। কামরাটার মধ্যে আবার দুটো ভাগ। একভাগে দুটি মানুষ দুটি বার্থ জুড়ে বসে আছে, অন্য ভাগে তারা দুজন।

জানালার ধারে ম্যারিয়ার মুখোমুখি বসলো শিশির। গাড়ি ছাড়লো অনেকক্ষণ পরে। বাইরের দিকে তাকিয়ে, বালিয়াড়ি, উটের সারি, আর ছোট ছোট ঘর দেখতে দেখতে ওর মনটা হঠাৎ অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে উঠলো। হোক এটা বিদেশ, তবু তো মাটি!

সে ইচ্ছে করলে ঐ বালির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যতদূর খুশি যেতে পারে।

কোন্ একটা ছোট স্টেশনে এসে যেন গাড়িটা থামলো। কয়েকটা মানুষের ছোটাছুটি, মুহূর্তের কোলাহল, তারপরে আবার যাত্রা। এরপর থেকে আর বালির পাহাড় নেই, শুধু বালির মাঝে মাঝে খেজুর গাছের জটলা, তার ছায়ায় জানলাবিহীন মাটির বাড়ি। পথে দেখা যায় কয়েকটা উট সারি দিয়ে চলেছে।

ম্যারিয়া যেন অন্য জগতের মানুষে পরিণত হয়েছে। কামরার দেওয়ালে মাথার ভার রেখে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মুখের হালকা

প্রসাধন বালির কণা-বওয়া হাওয়ায় হাওয়ায় বুঝি মিলিয়ে গেছে, অদ্ভুত বিষণ্ণতা ছায়া ফেলে থমকে থেমে আছে ওর সারা মুখখানা জুড়ে। চোখের নিচে একটু কালিমার ছাপ, বড়ো বড়ো চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার জন্য।

শিশিরের কিন্তু সেদিকে লক্ষ ছিল না। জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে-ও যেন কেমন উন্মনা হয়ে গেছে। আকাশের হালকা সাদা মেঘ কেমন অদ্ভুত ছায়া ফেলেছে উধাও বালিরাশির ওপরে, চারদিকে রৌদ্রের তাপ বালুকণায় ঝিলমিল করছে, আর তার মাঝখানে একখণ্ড কালো ছায়া। আরও অত্যাশ্চর্য কাণ্ড, সেই ছায়ার মধ্যে একটি কি দুটি খেজুর গাছ, তার নিচে গলায় দড়ি বাঁধা শুভ্রকায় একটি বড়ো ছাগল মুখ নিচু করে তার বিরল খাদ্যের সন্ধান কবছে। ওপরে মেঘ, মরুর বুকে মেঘের ছায়া, আর সেই ছায়ার কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি খেজুর গাছ আর একটি শ্বেতকায় প্রাণী, সব মিলিয়ে সে এক অনির্বচনীয় চিত্রকল্প !

—গট্ ম্যাচিস ?

ওরা চমকে তাকালো। পাশের খোপের মানুষদুটির একটি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। নাতিদীর্ঘ স্থূলকায় মানুষটি, ফরসা টকটকে রঙ। কালো গোঁফ আছে সযত্নবর্ধিত, মুখখানি গোলগাল, পরনে ঘোর নীলরঙের প্যান্ট আর সাদা হাওয়াই সার্ট। সোজা হয়ে বসলো শিশির, ম্যারিয়ার মুখের দিকে তাকালো, ম্যারিয়া মুখখানা আবার জানালার দিকে ফেরালো। গায়ের স্কার্ট জাতীয় সিল্কের কালো ওড়নাটা বুকের ওপরে ভালো করে বিন্যস্ত করে দিলো। লোকটা আবার বললে, মিশ্‌টার, নো ম্যাচিস উইথ ইউ ?

শিশিরের পকেটে দেশলাই সিগারেট দুই-ই ছিল, পকেট থেকে দেশলাই বার করে লোকটার হাতে দিলো। লোকটি দেশলাই নিয়ে ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরালো, তারপরে ম্যারিয়ার হালকা গোলাপী রঙের ফ্রকের দিকে ঘনঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে হঠাৎই শিশিরের পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো। বললে, ইউ ফরেনার, ইজ্‌নট্ ইট্ ? (তুমি বিদেশী, তাই না ?)।

শিশির মাথা নেড়ে জানালো,—হ্যাঁ।

উৎসাহিত হয়ে লোকটি আরও কী কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কথা ঢেকে দিয়ে ম্যারিয়া শিশিরকে বলে উঠলো, ইধার আও।

শিশির উঠলো। ম্যারিয়া বললে, জানালা বন্ধ করে দাও তো, গরম লাগছে। তার ওপর বালি উড়ছে দেখছো না ?

শিশির ম্যারিয়ার পাশের জানালা বন্ধ করলো। কাঁচের পাল্লা নয়, কাঠের ঘুলঘুলি। সে যখন জানালাটা বন্ধ করতে ব্যস্ত, লোকটা ততক্ষণে সরে এসে সামনের জানালা ঘেঁষে বসে ঐ জানালাটারও পাল্লা বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। শিশির তার কাজ করে নিজের জায়গায় বসতে না পেরে লোকটাব ডান পাশে বসতে যেতেই ম্যারিয়া ওকে ইঙ্গিতে ওকে ওর পাশে গিয়ে বসতে বললো। শিশির ওর নির্দেশমতো ওর কাছে গিয়ে বসামাত্র ম্যারিয়া তার ফ্রকের নিচেকার সুডৌল সুঠাম নগ্ন পা দুখানি বার্থের ওপর তুললো, ঠিক লোকটার পাশাপাশি, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত দিয়ে শিশিরের গলাটা বেষ্টন করে ধবে একটু কাত হয়ে হয়ে ওর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজলো।

ভীষণ লজ্জা করছিল শিশিরের। সে ওকে ছাড়িয়ে একটু সবে বসবার চেষ্টা করতেই ম্যারিয়া ওকে আরও জোর করে ধবে রাখলো। গলার কাছ থেকে হাতটা সবিয়ে নিলো বটে, কিন্তু ওর কাঁধের কাছে মাথাটা এলিয়ে দিতে দ্বিধা করলো না। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমুই।

সামনের লোকটার চোখদুটি বিস্ফারিত। তার নধব দেহ, গোলগোল মুখ, ঘনগোঁফ, আর ঐ হতভম্ব ভঙ্গি, সব মিলিয়ে এক হাস্যকর পরিস্থিতিরই সূচনা করলো বটে।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তার পরে 'আই অ্যাম সরি' বলে লোকটা উঠে তাদের নিজস্ব খোপে ফিরে গেল। ম্যারিয়া চোখ তুললো, তারপরে মিটিমিটি হাসতে হাসতে সোজা হয়ে বসলো। ওর দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, বুঝলে?

—বুঝলাম।

ম্যারিয়া গায়ের ওপর থেকে সিল্কের ওড়নাটা সবালো। বললে, ভীষণ গরম, তাই না? ফ্যানের হাওয়া, তা-ও আগুন।

—জানালা খুলে দেবো?

—না-না! পাগল! গরম হাওয়ায় বালি উড়ছে, সারা কামরা ভরিয়ে দেবে। কে জানে! শিশিরের কিন্তু মারাত্মক গরম লাগছিল না।

ম্যারিয়া বললে, —আবার এসে জ্বালাতন করতে পারে। খোপের দরজাটা বন্ধ করে দাও তো?

খোপের দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা সত্যিই আছে। শিশির এগিয়ে গিয়ে টেনে সেটা বন্ধ করে দিলো। ফিরে এসে তার জানালাটার কাছে বসছিল,

ম্যারিয়া খপ করে ওর হাতটা ধরে পাশে বসিয়ে দিলো। তারপরে মুচ্‌কি হেসে বলতে লাগলো—তোমার তো ও লোকটার মতো আমার হাঁটু দেখার দরকার নেই, তবে সামনে গিয়ে বসছো কেন?

প্রশ্নের তীক্ষ্ণ নির্লজ্জতায় শিশিরের কানদুটো আবার গরম হয়ে উঠলো। সে এ-ভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো, লোকটি কে?

ম্যারিয়া বললে, কী করে জানবো? ফার্স্টক্লাসে যখন যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই হেলাফেলার লোক নয়।

শিশির বললে, ইংরেজি ভুল বলে লক্ষ করেছেন?

অল্প একটু হেসে ম্যারিয়া বললে, তাতে কী হয়েছে? ইংরেজি নিয়ে তোমরা ইণ্ডিয়ানরা, বিশেষ করে কালকুত্তার লোকেরা যতবেশি মাথা ঘামাও, এমন কেউ ঘামায় না। ওটা বিদেশী ভাষা, যেটুকু নিতান্ত দরকার, সেটুকু শিখলেই হলো, এছাড়া ওর আর কী দরকার? ইংরেজদের সামনের দেশ ফ্রান্স, সেখানকার কজন লোক ইংরেজি জানে?

শিশির ওর মুখের দিকে তাকালো। বললে, জাহাজে আমি যে কী ভয়ে ভয়ে থাকতাম, আপনাকে কী বলবো! টাইপরাইটিংটা মোটামুটি রপ্ত হয়েছে, কিন্তু চিঠি লেখালেখির ব্যাপার? কয়েকটি গৎছাড়া বাইরের কিছু লিখতে গেলেই গেছি আর কী!

ম্যারিয়া বললে, ঐ 'গৎ'-ই যথেষ্ট। এটুকু জানলেই তুমি জাহাজী মানুষ হয়ে গেলে। এর আর বেশি কী চাই?

শিশির বলতে বলতে কেমন যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, চাই। আমি লেখাপড়া তেমন শিখতে পারি নি। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে লেখাপড়া শিখতে।

—কী ধরণের লেখাপড়া? সায়েন্স?

—না—না—আর্টস্।

নিজেকে একটু এলিয়ে দিয়ে বসেছিল ম্যারিয়া, এবার গদির ওপরে সোজা হয়ে বসলো, একটু ফিরলো ওর দিকে, তারপরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে ফেললো।

—হাসলে যে?

ম্যারিয়া ওর দিকে আবার সরে এলো। ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো, তারপরে ওর করতলের উল্‌টো দিকটা নিজের হাতের ওপর মেলে

ধরে, অপর হাতটি তার সূক্ষ্ম রোমরাজির ওপর সঞ্চালন করতে করতে বললো, তুমি কার পাল্লায় পড়েছো জানো না! যেটুকু লেখাপড়া শিখেছো, তা-ও ভুলিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচি।

ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলো শিশির, অস্ফুট কণ্ঠে বললে,—কেন?

ম্যারিয়া কপালের ওপরে এসে পড়া চুলের গোছাগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে, আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়াশুনা করেছি, সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ পাস করেছিলাম, তা জানো? কিন্তু সে গুণটা কোনো কাজে লাগলো না, কাজে লাগলো রূপটা। কিন্তু থাক সে-সব কথা। তোমার ঐ 'কেন'র উত্তর আপাতত না দিলেও আমার চলবে! অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও তো?

—কী?

—পকেট থেকে দেশলাই যখন বেরোলো, সিগারেটও নিশ্চয়ই আছে। জাহাজে কখনো তো দেখিনি সিগারেট খেতে। কালকুত্তায়ও কখনো দেখি নি। এটা অভ্যাস করলে কবে?

একটু লজ্জিত হয়ে শিশির বললে, বেশি খাই না।

—শক্ত সমর্থ নওজোয়ান, খাবে না কেন? কিন্তু জাহাজ থেকে কতো সিগারেট এনেছো?

—কতো আবার! এক কার্টন। যা কাষ্ট্‌মস অ্যালাউ করে।

ম্যারিয়া বললে, কী আফশোস! আমাকে বললে না কেন? আমি ক্যাপিতানির কাছ থেকে আট-দশ কার্টন নিয়ে আসতাম। ভালো সিগারেট।

—কাষ্টম্‌স?

ম্যারিয়া মুচ্‌কি হাসলো। বললো, সে সব কী করতে হয়, আমি জানি। এটা আমার দেশ, ভুলে যাচ্ছো কেন? এই যে তুমি এসেছো, তোমার ভিসা আছে, পাসপোর্ট আছে?

—কেন?

ম্যারিয়া বললে,—জাহাজের সূত্রে সাতদিন মাত্র তোমার ছুটি, তা-ও এই রাস্তা, আলেকজান্দ্রিয়া আর পোর্ট সৈয়দ। তার বাইরে কোথাও যাবার কোন হুকুম নেই। অথচ আমি যদি চাই, তোমাকে মিশরের যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। স্ফিংস দেখতে যাবে?

ভীতস্বরে শিশির বললে, না—না—কোথাও না। আপনাকে পৌঁছে দেবো, আর পোর্ট সৈয়দে ফিরে যাবো।

অনুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো ম্যারিয়া। বললো, সেই আশাতেই বসে থাকো।

—মানে!

লঘু গলায় ম্যারিয়া বললে, মানে কিছু নয়! কতকাল পরে দেশে যাচ্ছি বলো তো?

বলতে বলতে ওর প্যান্টের পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ম্যারিয়া চট্ করে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলো। লম্বা ধরণের 'পলমল' সিগারেট, একটা বার করে শিশিরের মুখে গুঁজে দিলো, তারপরে আবার ওর পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরিয়ে দিলো। বললে, নিশ্চিন্তে বসে হালকা মনে খাও দেখি। সাত-পাঁচ ভাবতে যেও না। যারা সব সময় ভাবে, আমি দুচক্ষে তাদের দেখতে পারি না। তোমার কোনো ভয় নেই, বিপদ নেই, আমি আছি।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে শিশির বললে, কই, আমরা তো মরুভূমিতে হারিয়ে গেলাম না!

—মনে আছে কথাটা?

—আছে বই কী!

ম্যারিয়া মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। বললে, এটা কী? হারিয়ে যাওয়া নয়? তুমি কি ভাবছো জাহাজে তুমি ফিরে যেতে পারবে?

—কেন?

—থাক। বললেই তো আবার ভাবতে বসবে। ম্যারিয়ার তোমাকে ভালো লেগেছে, ম্যারিয়া যদি তোমাকে ছেড়ে না দেয়?

শিশিরের মুখখানা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল এ-কথায়। আবার একটা আতঙ্কের ছায়া পড়লো তার মুখে।

ম্যারিয়া হেসে বললে, ভয় নেই। তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

শিশির বলতে চেষ্টা করলো, না—না—তা নয়।

ম্যারিয়ার চোখ তখনো কৌতুকে নাচছে। হঠাৎ সে ওর ঠোঁট থেকে খপ্ করে কেড়ে নিলো জলন্ত সিগারেটটা। নিয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে ধোঁয়া বার করতে লাগলো।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো শিশির। সিগারেট টানতে টানতে ওর দিকে চোখ ফেরালো ম্যারিয়া।

আর কী অদ্ভুত মানুষের মনের গহনতল, সঙ্গে সঙ্গে শিশিরের ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটলো। এক দুরন্ত কামনা এসে তার রক্তে যেন হঠাৎই জোয়ার তুলে দিলো। ম্যারিয়ার ওপর তার একটা ভালো লাগার আবেশ জেগেছিল, একথা সত্যি। কিন্তু এ শুধু ভালো লাগা নয়, এ এক সর্বগ্রাসী বুভুক্ষের রূপ! এ-রূপ জাগলে মানুষ আর নিজের চিত্তের ধৈর্য রাখতে পারে না, তার সংকোচ, সংযম, বিবেক সব জলাঞ্জলি দিয়ে মুহূর্তে পশুতে পরিণত হয়।

ম্যারিয়ার দিকে অপলক সে তাকিয়ে আছে। সেই চোখের দৃষ্টি দেখে একটু চমকে উঠলো ম্যারিয়া। এ কী অদ্ভুত দৃষ্টি মানুষটার দুটি চোখে!

অভিজ্ঞা রমণীর পক্ষে এ-দৃষ্টির অর্থ বুঝতে দেরি হবার কথা নয়। স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়ার বশেই ম্যারিয়া একটু সরে বসলো। ওর চোখ থেকে চোখ কিন্তু সে সরায় নি। অস্ফুটকণ্ঠে বললো, কী হলো তোমার?

শিশির যেন আত্মবিস্মৃতের মতো ঝুঁকে পড়লো ওর ওপর। আত্মবিস্মৃতের মতোই বলতে লাগলো, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, আমি তোমার কাছেই থাকবো!

চাপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো ম্যারিয়া। একটা হাত দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে নিজের মুখখানা পিছিয়ে অপর হাতখানা দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেঝের ওপরে। তারপরে হাসতে হাসতেই বললে, এটা ক্লিওপেট্রার দেশ, মনে থাকে যেন!

একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলো শিশির,—কার দেশ?

—ক্লিওপেট্রা। নাম শোনো নি?

—না।

—সে কী! সেক্সপিয়ারের বই পড়ো নি?

—না। তোমাকে তো বলেছি—

—ঠিক আছে। তোমাকে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেবো, আর লক্ষ্মীছেলের মতো বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাবে।

—ঠাট্টা করছো?

আবার হেসে উঠলো ম্যারিয়া। তারপরে মেঝের ওপরে পড়ে থাকা

জলন্ত সিগারেট খণ্ডটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—ওটা জলছে। শীগ্‌গির নিভিয়ে দাও তো?

নিভিয়ে দেবার জন্য উঠতে হলো শিশিরকে। ম্যারিয়া ঘড়ি দেখে বলে উঠলো, পরের বড়ো স্টেশনে খাবার দিয়ে যাবে। তা এখনো আধ ঘণ্টা। একটু শুই।

বলতে বলতে নিজেকে বার্থের ওপর এলিয়ে দিলো ম্যারিয়া।

শিশির ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দেহের অলস ভঙ্গিমাটা লক্ষ করলো, তারপরে সে বিপরীত দিকের বার্থে বসতেই ম্যারিয়া বললে, ওখানে কেন? এখানে এসো?

— শোও না? আমি এখানে বসি।

মুচকি হাসলো ম্যারিয়া। বললে, নিভে গেল?

—কী?

—ঐ যে সিগারেটের খণ্ডটা?

—হ্যাঁ। নিভিয়েই তো দিলাম।

—ঠিক তো? না, এখনো ধিকি ধিকি জলছে?

শিশির ওর কথার ইঙ্গিত এবার বোধহয় ধরতে পারলো। মুখ নিচু করলো, কানের কাছটা আবার যেন গরম হয়ে উঠলো।

ম্যারিয়া বললে, ওখানে বসে তো আবার আমার পায়ের দিকে তাকাবে। তার থেকে এখানেই এসো।

এরপরে আর না উঠে পারা যায় না। ওর শিয়রের কাছে গিয়ে বসলো শিশির। বললে, অমন করে কথা বলো কেন?

ম্যারিয়া হঠাৎ একটু মাথাটা উঠিয়ে ওর কোলের ওপরে রাখলো। রেখে, পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। মুখখানা দেখা যায় না। ম্যারিয়া নিরুত্তরে চুপচাপ পড়ে রইলো ওভাবে।

শিশির একখানা হাত উঠিয়ে দিলো ওর বাহুর ওপরে। স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গিনী, রূপসী মেয়ে, দূর থেকে তেজস্বিনী শক্ত ধরণের মেয়ে বলেই মনে হয়, কিন্তু এতো কোমল! এতো কোমল ওর দেহবল্লরী? কে জানে ওর মনটাও হয়ত ওর দেহের মতোই সুকোমল।

—ম্যারিয়া?

কোনো উত্তর নেই।

—আমার কেউ নেই, জানো? আমি যদি এখানে চিরদিনের জন্য থেকে

যাই, কারও কিছু বলার নেই, কেউ আমার জন্য কোথাও এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

তখনো কোনো সাড়া নেই।

—কী হলো, কথা বলছো না যে?

ম্যারিয়া তখনো নিরুত্তর।

কী একটা সন্দেহ করে শিশির নিচু হয়ে ওর মুখটা দেখবার চেষ্টা করলো। হাত দিয়ে মুখখানা ফেরাবার প্রয়াস করলো। তারপরে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, একী, কাঁদছো!

ম্যারিয়া ওর কোল থেকে মাথা নামিয়ে গদির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজলো। শিশির অবাক হয়ে গেল। হাত সরিয়ে নিলো ওর বাহু থেকে। এই মেয়ে যে কখনো কাঁদতে পারে, এ তার স্বপ্নেরও অতীত।

—কী হলো, কাঁদছো কেন?

মুখ তুললো না ম্যারিয়া, উত্তরও দিলো না। ওর দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ অদ্ভুত এক মায়ায় ভরে উঠলো সারা মন। ক্যাপিতানির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে এই মেয়ে। হয়ত তার জন্যই মনটা ওর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কে বলতে পারে? ওর মাথার ওপর হাতখানা রাখলো শিশির। দেহটা নড়ে উঠলো ম্যারিয়ার। মুখখানা কাত করলো। হয়ত একটু সামলে নিলো নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো। শিশিরকে আড়াল করে চোখ মুছলো।

শিশির বললে, ট্রেনের গতি কমে এসেছে। স্টেশন হয়ত সামনে।

ওর দিকে মুখ ফেরালো ম্যারিয়া, চোখ দুটো একটু লালচে দেখাচ্ছে।

শিশির ওর চোখের ওপর চোখ রেখে বললো, মন কেমন করছিল?

বাঁকা একটু হাসি ফুটে উঠলো ম্যারিয়ার ঠোঁটের প্রান্তে।

শিশির বললে, সাতদিন ছুটি, তারপরে পোর্ট সৈয়দে ফিরে গেলেই ত হবে! আবার দেখতে পাবে ক্যাপিতানিকে, সবাইকে।

ম্যারিয়ার বাঁকা হাসিটা আরও স্পষ্ট হলো। তারপরে একসময় সেটা মিলিয়ে গেল। গম্ভীর, থমথমে মুখে ম্যারিয়া বলতে লাগলো,—দেখ, তোমাকে সোজাসুজি একটা কথা জানিয়ে দেই। যাকে তোমরা 'মুহব্বৎ' বলো, আমার তাতে বিশ্বাস নেই। মানব আর মানবী আদিম প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে মেশে! ক্যাপিতানির মধ্যেও এই আদিম প্রেরণা, তোমার

মধ্যেও এই আদিম প্রেরণা, আমার মধ্যেও এই আদিম প্রেরণা! তাহলেই বুঝতে পারছো? তুমিও আমার প্রেমে পড়ো নি, আমিও তোমার প্রেমে পড়ি নি। এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক তুমি, তোমাকে এমনিতেই মোহমুগ্ধ করায় আনন্দ আছে। তারও ওপর তোমাকে যে আকর্ষণ করেছি, তাব পিছনে আমার একটা স্বার্থ আছে। ট্রেন আলেকজান্দ্রিয়ায পৌছবার আগেই তোমাকে তা বলা দরকার। কিন্তু এ-ও এখন থাক, ট্রেন বোধ হয় থামলো. দেখ তো. খাবার নিয়ে আসছে কিনা?

শিশির তবু উঠলো না, অধীব হযে বললো, ওরা ঠিক আসবে। তুমি তোমার কথাটা শেষ করো।

—শেষ নয়, আরম্ভ করতে হবে। ইউ গেট্ আপ। জল্‌দি।

শিশির তবু উঠলো না. বললো, কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন. হঠাৎ?

ম্যারিয়ার মুখে আবার ফুটে উঠলো সেই বাঁকা হাসি। বললে. 'আওরৎ'দের কান্নার খবব এত সহজেই শুনতে চাও?

—তুমি বলো।

ম্যারিয়ার মুখখানা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরালো। বলতে লাগলো, আমার কান্নার জায়গা একটি মাত্র আছে, কান্নার স্মৃতি একটি মাত্র আছে। কখন যে সেই স্মৃতি আমার মনটাকে এসে দুহাতে নাড়া দেয়, তা আমি জানি না।

—কিসেব এই স্মৃতি? কার? বলবে? মিযানীর কী?

একটু বুঝি অবাকই হলো ম্যারিযা। তারপবে হাসি টেনে আনলো ঠোঁটের কোণে, বললো. তুমি নিতান্তই কাঁচা। তোমাকে জীবনের এই কঠিন দিকের পরিচয় দিতে মায়াও হয়। তবু তোমাকে বলবো, কারণ, তোমাকে গড়ে পিটে ইস্পাত তৈরি কবার ভার দেখছি আমারই ওপর পড়ছে। শোনো তাহলে। কোনো পুরুষেব জন্য কাঁদবার মেয়ে ম্যারিয়া নয়। আমার কান্না পায় তখনই, যখন একটি নারীব কথা ভীষণভাবে মনে পড়ে। ইনি আর কেউ নন, আমার দিদিমা। এঁরই কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। মিয়ানীকে একবার নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে দিদিমার পছন্দ হয় নি।

—আমাকে পছন্দ হবে?

ম্যারিয়া সাগ্রহে বললে, বোধহয় হবে। কেন না, তুমি ইণ্ডিয়ান।

—কিন্তু তাতে কী?

ম্যারিয়া বললে, কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। তিনিও ইণ্ডিয়ান।

— তার মানে!

ম্যারিয়া বললে, মানে তেমন কিছু নয়। আমার মা ইজিপ্সিয়ান, বাবা ছিলেন গ্রীক। আবার আমার মায়ের মা, অর্থাৎ দিদিমা, যাঁর কথা তোমাকে বলছি, তিনি ইণ্ডিয়ান, বিয়ে করেছিলেন ইজিপ্সিয়ানকে। বাপের পরিচয়েই তো সন্তানের পরিচয়? তাই ইণ্ডিয়ান মায়ের মেয়ে হয়েও মা হলেন ইজিপ্সিয়ান। বুঝলে কথাগুলো? এই বুড়ি দিদিমাই আমার সব। এঁর জন্য আমার মন যখন কেঁদে ওঠে, তখন কারও সাধ্য নেই আমাকে আগলে রাখে। আমি তাঁরই জন্য ক্যাপিতানির সঙ্গে ঝগড়া করে সুয়েজে নেমে পড়লাম। আমি তাঁরই জন্য 'মেয়েমানুষের ছলাকলায়' তোমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেছি। হাঁ করে চেয়ে আছো কী? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটাকে কি তুমি বুঝতে পারবে?

বলতে বলতে আবার হেসে ফেললো ম্যারিয়া হাত বাড়িয়ে ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বললে, তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ, এখনো তোমার চোখে স্বপ্নের কাজলরেখা আঁকা রয়েছে। তোমাকে এই তীব্র খাঁটি কথাগুলো না বললেই হতো। আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবেসেছি, তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি, তোমার জন্য আমার অত বড়ো 'খদ্দের'—'অ্যাণ্টিলোপ'—জাহাজের ক্যাপিতানিকে পর্যন্ত ছেড়ে চলে এসেছি,—এই সব বলে বলে তোমার মাথাটা বেশ করে চিবিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো করতাম। তাই না? কী, 'শক্' পেলে নাকি? মুখে যে রা নেই!

—সাব?

ম্যারিয়া মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালো, তারপরে বললো, নাও, দরজা নড়ে উঠেছে। খানা হাজির। শুনানী আপাতত মুলতুবি রইলো, কেমন?

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটা নতুন-পুরোনোর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ থেকে সঞ্জাত বলা যেতে পারে। কোথাও কোথাও ফাঁকা মাঠের মতন, এটা শহরের নতুন এলাকা। কিন্তু শহরের পুরোনো অঞ্চলটা রীতিমত ঘিঞ্জি। বিরাট বিরাট গম্বুজওয়ালা পাথরের বাড়ি, আবার গায়ে গায়ে হুমড়ি-খাওয়া ছোট ছোট বাড়িও আছে। পরিসর পথ দিয়ে আধুনিক মডেলের মটোর গাড়িও চলে, আবার তুর্কি

চালে উটও হেঁটে যায়। বন্দরটা নাকি বেশ বড়ো, বহু জাহাজ একসঙ্গে জেটিতে বাঁধা পড়তে পারে।

ওরা যখন পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। একটা জোয়ান মেহেদি রঙ করা দাড়িওয়ালা লোক ওদের হাত থেকে ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ দুটোই ছিনিয়ে নিলো। এবার ঘাবড়ে গেল না শিশির। বুঝলো, লোকটা কুলি।

ম্যারিয়া তার কালো স্কার্টটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে ছোট ঘোমটায় পরিণত করেছে। স্টেশন পেরিয়েই একটা ট্যাক্সিতে এসে উঠলো ওরা। স্থানীয় কিছু টাকাপয়সা জমানো ছিল ম্যারিয়ার কাছে। তাই থেকেই খরচ-খরচা চলছে আপাতত। ওর নিজের টাকা এখনো বদলে নেওয়ার সুযোগ আসে নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ফটকের কাছে গাড়ি এসে থামলো। দিল্লীর লাহোরী দরওয়াজার মতো দেখতে অনেকটা, তবে আকারে ছোট। ওরা ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে নিজেরাই ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ নিয়ে সেই দরওয়াজার মধ্যে ঢুকে গেল। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা। বিচিত্র বেশের সব মানুষজন চলেছে। 'আওরৎ' দেখে অনেকেই ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো। অন্য কিছু নয়, সম্ভবত পাড়ায় মেয়েটি কে এলো, সেটা জানতেই তারা উৎসুক।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে মিয়ানার বর্ণনা মতো একটি দুর্গের মতো বাড়িতে প্রবেশ করলো। বেশ বোঝা যায়, এটি কোনো সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরই অট্টালিকা ছিল এককালে, এখন নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিরাট পাথর গাঁথা বাড়ি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইটের দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা। এমন কি, বিরাট উঠোনটা পযন্ত চার ভাগে ভাগ করা।

ওদের ওপরে উঠতে হলো না, ম্যারিয়াদের আস্তানা নিচেই। উঠোনে ঢুকে ডান কোণে চলে যেতে হয়। সেই কোণটার দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ার পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠলো। একরকম ছুটেই সে ও অঞ্চলের দাওয়ায় গিয়ে উঠলো বলা যায়।

দাওয়ার মাথা থেকে সরাসরি কয়েকটা অর্কিডের টব ঝুলছিল। একটা টবেই একটা ফুল ফুটেছে। দাওয়ার বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বলছিল, তার আলোয় ফুলের রঙটা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু আকারে বেশ বড়ো, এটা অনুভব করা যায়।

দাওয়াতেই একটা ইজি চেয়ার পাতা ছিল। সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো শিশির পায়ের কাছে তার ট্রাঙ্কটা রেখে। ম্যারিয়া কোনো একটি ঘরে

নিশ্চয়ই ঢুকে পড়েছে। তার কণ্ঠস্বরের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। দাওয়াটা চওড়া, লম্বাও বেশ, দুখানা পাশাপাশি ঘর পার হয়ে খানিকটা ভিতরে ঢুকে গেছে। সেখানে খাবার টেবিল আর চেয়ার পাতা। টেবিলে একটি ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল শোভা পাচ্ছে।

বাড়িটা বোধহয় বিরাট, নানান স্ল্যাটে ভাগ করা। কলকাতায় বড়বাজারের কাছে জাহাজের জন্য কী একটা সাপ্লাইয়ের খোঁজে তাকে একবার পাঠিয়েছিল সেজোবাবু। সেই বাড়িটাও ছিল প্রকাণ্ড, আর এই রকম ইঁটের দেওয়াল উঠে নানান ভাগে বিভক্ত। পায়রার খোপ ছিল সারি সারি সাজানো, অজস্র পায়রা বকবকম করতো সবসময়, এখানে সেটা অনুপস্থিত। এত বড়ো বাড়িটা, মাত্র সন্ধ্যা রাত্রি, ঘরে বা দাওয়ায় আলো জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু কোনো কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। একটা মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতের স্বর শুধু ভেসে আসছে কোথা থেকে।

হঠাৎ একসময় ঐ খাবারের টেবিলের সংলগ্ন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ম্যারিয়া চঞ্চল পায়ে। হাসি-হাসি খুশি খুশি মুখ, দ্রুত পায়ে তার কাছে ছুটে এলো। বললে, নিজের জায়গায় এসে সব ভুলে গেছি। তোমাকে যে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, সে খেয়ালও নেই। বসলেও তো পারতে, ঐ চেয়ারটায়?

তারপরেই মুখ ফিরিয়ে উঁচু গলায় ডেকে উঠলো, ফরিদা—ফরিদা?

ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মধ্যবয়সী একটি মেয়েমানুষ, পরনে গাউনই অবশ্য, কিন্তু পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা। মুখের ওপর ওড়নার ঘোমটা টানা। ম্যারিয়া তাকে ডেকে ওদের ভাষায় কী যেন বললো। বলার ঢংটা হিন্দী-উর্দু'র মতোই, কিন্তু ওর কাছে দুর্বোধ্য। মেয়ে মানুষটি ওর কথা শুনে ভিতরে চলে গেল।

ম্যারিয়া ওর দিকে ফিরে বললে, বুড়ি বাড়িতে নেই, জানো? থুত্থুড়ে বুড়ি, কানে শোনে না, চোখেও ভালো দেখে না, কাছেই কার সঙ্গে নতুন 'দোস্তি' হয়েছে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। অথচ এমনিতে ঘর থেকে বেরোয় না বুড়ি।

পেছনের ঘরটা খোলবার শব্দ হলো। দেখা গেল সেই মেয়ে মানুষটি দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যারিয়া ওর দিকে তাকিয়ে চটুল কণ্ঠে বললো, আইয়ে জনাব।

শিশির ট্রাঙ্কটা তুলবার উপক্রম করতেই ম্যারিয়া বললে, থাক না ওটা? ফরিদা ঠিক জায়গায় রেখে দেবেখন।

বলে ফরিদাকে কী একটা হুকুম দিয়ে ও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল শিশিরকে নিয়ে।

ঘরটা খুব বড়ো নয়। কিন্তু এক নজরে দেখলেই বোঝা যায়, বসবার ঘর। কার্পেট পাতা, সোফাকাউচ সাজানো। ওকে ঠেলে একটা সোফায় বসিয়ে দিলো ম্যারিয়া, নিজেও বসলো পাশে। বললে, এক কাপ কফি খেয়ে তারপরে উঠবো। চান না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। তুমি চান করবে তো?

শিশির মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে ফরিদা একটা পর্দা নিয়ে ঢুকলো দরজায় লাগাবে বলে। ওটা দরজার কাছে রেখে আবার ভিতরে গেল। এলো একটা টুল নিয়ে। ম্যারিয়া বললে, পর্দা-টর্দা খাটানো হয় না, ঘরটা বন্ধই তো থাকে। কে আসবে বুড়ির সঙ্গে দেখা করতে বলো?

বলতে বলতে উঠলো ম্যারিয়া, ফরিদাকে বললো অন্য কী একটা কাজ করতে। তারপরে সে চলে যেতে, নিজেই টুলের ওপর দাঁড়ালো পর্দার গোল কাঠটা লাগাবার জন্য। দরজা বেশ উঁচু। ঘরগুলো আকারে ছোট, কিন্তু উচ্চতায় কম নয়। ভারী পর্দাটা টাঙিয়ে দিয়ে ম্যারিয়া এসে আবার বসলো ওর কাছে। বললে, দিদিমা তোমাকে দেখে যা খুশি হবে না!

শিশির বললে, এটি কে? এই 'ফরিদা' না, কী যেন বলে ডাকলে যাকে?

—ও হচ্ছে ঝি। অনেক দিনের পুরানো।

ম্যারিয়া নিজেকে একটু এলিয়ে দিলো সোফার ওপর। বললে, গরম হচ্ছে না খুব?

—না, তেমন গরম তো মনে হচ্ছে না।

ম্যারিয়া বললে, দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নেই। ওঘরে একটা বাড়তি টেবিল ফ্যান আছে, সেটা নিয়ে ফিট্ করে দিচ্ছি। এঘরের সিলিং ফ্যানটা খারাপ হয়ে গেছে, মেরামত করতে নিয়ে গেছে। ফরিদাকে কফি করতে বলেছি, নইলে ওকে পাখা আনতে ফরমাশ করতাম।

—তোমার দিদিমা কখন আসবেন?

ম্যারিয়া বললে, বুড়িকে আনতে যেতে হবে। ফরিদাই যাবেখন।

শিশির বললে, আচ্ছা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো?

—কী?

—তোমার দিদিমা তো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ইণ্ডিয়ার কোন্ অংশের মানুষ?

মুখের ওপর চিন্তার ছাপ পড়লো ম্যারিয়ার। বললো,—আমার দিদিমা একটু অদ্ভুত মানুষ। ছোট থেকেই তো দেখে আসছি। রেডিওর ইণ্ডিয়ান স্টেশন পর্যন্ত ধরতে দিতো না। আর এখন তো বদ্ধ কালা। আমি বসে বসে ইণ্ডিয়ান স্বর শুনতাম, বুড়ি নিজের মনে জপের মালা ঘুরিয়ে চলেছে।

—জপের মালা?

ম্যারিয়া বললে, কেন, অবাক হবার কী আছে? আমরা ধর্মে খৃষ্টান। যদিও আমি চার্চে-টার্চে কখনো যাই না।

—খৃষ্টানরা জপ করে?

—করে না? দেখো নি রোজারি?

—না, আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

ম্যারিয়া বলতে লাগলো, দিদিমার প্রচণ্ড অভিমান ছিল ইণ্ডিয়ার ওপরে। ধারে কাছে কোনো ইণ্ডিয়ান এসেছে শুনলে দেখা করতে যাওয়া দূরে থাক, ঘরের কোণে এসে মুখ গুঁজে বসবে। অবশ্য আমার মা বা বাবা, কারুরই ওসব বিষয়ে মাথাব্যথা ছিল না, নইলে তখনকার দিনে জোরটোর করলে কী হতো বলা যায় না। আমি বড়ো হলাম, লোকজনের সঙ্গে মিশে হিন্দী শিখলাম, দিদিমা দেখি হঠাৎ একদিন আমার সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা হিন্দী বলতে শুরু করলো। খুশি হয়ে বলে উঠলাম, ইণ্ডিয়ার ভাষা তুমি তাহলে ভুলে যাওনি! শুনে বুড়ি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে সেই প্রথম দুর্বলতার প্রকাশ! তারপরে কতবার বুড়িকে বলেছি, যাবে একবার ইণ্ডিয়ায়? আমি যে করেই হোক নিয়ে যাবো। বুড়ি কিছুতেই রাজি হয় নি। তারপরে জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি ইণ্ডিয়ার কোন্ অংশের লোক? কালকুত্তার লোক না, বম্বাইয়ের? বুড়ি শুধু বলেছে, কালকুত্তাও জানি, বম্বাইও জানি। কিন্তু কিছুতেই বলেনি, সে কোথাকার লোক। পীড়াপীড়ি করতে শুধু একটু হেসেছে, বলেছে, ওসব দিয়ে আর কী দরকার? যা চুকেবুকে গেছে, তা ধরে টানাটানি করে আর লাভ কী? ইদানীং দেখছিলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের ট্রাঙ্কটা খোলে, আর বহু পুরোনো দু-একখানা বই যা আছে, তা খুলে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু পড়বেই বা কী? দুটি চোখেই ছানি পড়েছিল। ছানি কাটানো হয়েছে দু-দুবার। মোটা কাচের চশমা পরেও বুড়ি ঠিক পড়তে পারে না। বয়স কম নয়, ছিয়াত্তর। কিন্তু বয়স আন্দাজে যেন আরও বেশি থুত্থুরে হয়ে পড়েছে। আমি বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে এনে গল্প করতাম, দিদিমার সঙ্গে আলাপ

করিয়ে দিতাম। বুড়ি গল্পগুজব করে যাতে একটু সুখ পায়। শেষ এনেছিলাম মিয়ানীকে। কিন্তু বুড়ির পছন্দ কাউকেই নয়। শুধু শেষবার বলেছিল, কোনো ইণ্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে ভাব করতে পারিস না?

বলেই হেসে উঠলো ম্যারিয়া,—ভাব তো করেছি, তারপরে কী দাঁড়ায়, জানি না।

শিশির বললে, আচ্ছা তোমার মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই?

মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল ম্যারিয়ার। বললে,—না।

ইতিমধ্যে কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলো ফরিদা। আর সমস্ত কথাই চাপা পড়ে গেল।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ম্যারিয়া ফরিদাকে বোধহয় হুকুম করলো দিদিমাকে নিয়ে আসতে। একটু পরেই দেখলো শিশির, ফরিদা একটা টর্চ নিয়ে এ-ঘরের পর্দা ঠেলেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

শিশির প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললে, তোমাদের বাড়িটা কিন্তু অদ্ভুত। এতো বড়ো বাড়ি, এতো ঘর, কিন্তু কোনো গোলমাল নেই।

ম্যারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। বললে,—এ শহরের মতো বাড়িটাও কস্‌মোপলিটান। পৃথিবীর সব জাত এসে ভিড় করেছে আলেকজান্দ্রিয়ায়, এবাড়িতেও তাই। খোপে খোপে ভাগ হয়ে সব বাস করে, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। আগে খুনখারাপীও হতো, আজকাল মিশরী পুলিসের দাপটে সব শান্ত হয়ে গেছে। নাও, এসো?

শিশির আশ্চর্য হয়ে বললে, কোথায়?

—পাশের ঘরে।

—কেন?

—আহা! এসোই না?

পাশের ঘরটা বেডরুম। বসবার ঘরটার থেকে আকারে একটু বড়ো। একপাশে একটা মেহগনির দামী খাট, অন্যদিকে লোহার ছোট একটা খাট, গদি ফেলা আছে। বিন্যস্ত কিছু নেই। ঘরের অন্যান্য আসবাব যেমন যেখানে শোভা পায়, তেমনি। একদিকে একটা বইঠাসা আলমারি, তার পাশে বেদীতে দুটি বাতিদানে ছোট দুটি বাল্‌ব জ্বলছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, দুটি মোমবাতি। সেই বাতিদানের ওপরে, দেওয়ালে, একটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি।

ঘরের পাশের দেওয়ালে কোনো দরজা নেই। তৃতীয় ঘরটিতে যেতে গেলে দাওয়া দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। ভিতরের দিকে শুধু একটি দরজা আছে।

ম্যারিয়া বললে, তোমার বাক্সের চাবিটা দাও।

—কেন ?

—তক্‌রার কোরো না। দরকার আছে।

চাবিটা ওর হাতে দিলো শিশির।

ম্যারিয়া বললে, ভিতরের বন্ধ দরজাটা দেখছো ? ওটা বাথরুম। সোজা ঢুকে যাও। ফরিদা তোয়ালে-টোয়ালে সব গুছিয়ে রেখেছে। পকেটের সিগারেট, ব্যাগ-ট্যাগ সব বার করে রেখে দাও। ভিতরে গিয়ে সব ছেড়ে রেখে এসো। ওয়াসারম্যান এসে সব নিয়ে যাবে।

শিশির হাসলো। ওর এই মৃদু কর্তৃত্বের সুর সত্যিই ভালো লাগছিল। তবু বললে, জাহাজে কাপিতানির বউ বলে ভয়ে ভয়ে মিশতুম, আর এখানে—

ঝংকার দিয়ে উঠলো ম্যারিয়া, বললে, যাও-যাও, আর বাচালতা করতে হবে না। কবিরা আমাদের জলের সঙ্গে তুলনা দেয় জানো না ? যে রঙে রাঙাবে, সেই রঙেই বদলে যাবো।

শিশির আর দেরি করলো না, বাথরুমে ঢুকে গেল।

চানটান করে যখন বেরুলো একটা তোয়ালে কোমরে বেড় দিয়ে, তখন ঘরে কেউ ছিল না, দাওয়ার দিককার দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করা। লোহার খাটের গদির ওপরে ওর স্লিপিং সুটটা রাখা, ওটা মিয়ানীই তাকে কিনে দিয়েছিল কলম্বো থেকে। তার পাশে রাখা ড্রেসিং গাউনটা তার নয়। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত ওটা ও পরেই ফেললো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালো, তারপরে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালো। তখনো পর্যন্ত কারও সাড়াশব্দ নেই। ঘরটার মধ্যে পায়চারি করতে করতে একসময় ও বাইরের ঘরে এসে বসে পড়লো। এঘরেও কেউ নেই। কোথায় গেল ম্যারিয়া ? ওর দিদিমাও কি ফিরে আসে নি এখনো ?

ভাবতে ভাবতে সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা থেকে উঁকি দিলো ম্যারিয়া, তুমি এই ঘরে ? আমিও দিদিমার বাথরুমে গিয়ে চান সেরে নিলুম। খুব তাড়াতাড়ি এসেছি না ? দাঁড়াও, এসে বসছি কাছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যারিয়া চলে এলো। সিল্কের ঢোলা পাজামার ওপরে সেই ওর অভ্যস্ত ড্রেসিং গাউনটা পরেছে। মুখে এরই মধ্যে হালকা একটু পাউডারের ছোপ। ভিজে চুলগুলো খোলা, কাঁধ ছাপিয়ে এসেছে।

এসেন্সের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে ওর কাছে এসে বসলো ম্যারিয়া। বললে, দেখ, এখনো দিদিমার দেখা নেই। ঠুকঠুক করে আসবে তো? এইটুকু পথ আসতে কতটা সময় লাগিয়ে দেয় দেখ। তুমি সিগারেট খেয়েছো, না? সারা ঘরে গন্ধ।

শিশির বিশেষ কিছু না ভেবে ঝপ করে বলে বসলো, তুমি খাবে একটি?

ম্যারিয়া মুখ টিপে হাসতে লাগলো। মুখখানায় বুঝি একটু আরক্তিম আভা জাগলো। ভ্রূভঙ্গি করে তাকালো ওর দিকে, ছেলেমানুষের মতো মাথা নেড়ে জানালো, - না।

তারপরেই বললে, তোমাদের পুরুষদের ব্যাপার আমি জানি।

—কী?

ম্যারিয়া বললে, এক একজনের এক এক রকম। তোমার ব্যাপারটাও বুঝেছি।

শিশির উৎসুক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। ম্যারিয়া বললে, বলবো?

বলো না?

—নিজের দুর্বলতার খবর শুনলে কোনো পুরুষই কিন্তু খুশি হয় না।

—তা হোক। বলো।

ম্যারিয়ার চোখ দুটো তখনো কৌতুকে ঝলমল করছে। বললে, যে মেয়েকে ভালো লেগেছে, তাকে যদি হঠাৎ সিগারেটে টান দিতে দেখ, তাহলে—

বাধা দিয়ে শিশির বললে, থাক। বুঝেছি।

খিলখিল করে হেসে উঠলো ম্যারিয়া। তারপরে ওর দিকে একটু ঘেঁষে এসে ওকে মৃদু একটু ধাক্কা দিয়ে বললে, ভীরু কোথাকার!

আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দাওয়ায় তখন কার বুঝি সাড়া বেজে উঠেছে। পরক্ষণেই শোনা গেল ম্যারিয়ার কলকণ্ঠ। ওদের ভাষায় সে যেন কী সব বলে উঠলো। উচ্ছ্বাসেরই অভিব্যক্তি। তার সঙ্গে মিলিয়ে কাঁপা ক্ষীণ এক কণ্ঠস্বর। নিশ্চয়ই ওর দিদিমা।

দিদিমাকে নিয়ে দাওয়া দিয়ে সোজা তৃতীয় ঘরটিতে চলে গেল ম্যারিয়া। তারপর কেটে গেল বেশ কয়েকটা মুহূর্ত। কোথায় কে যেন গীটার বাজাচ্ছে। রেকর্ড, কি রেডিও, কি সত্যিকার গীটার শিশির ঠিক বুঝতে পারলো না।

হঠাৎ মাঝের দরজা দিয়ে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো ম্যারিয়া। ওর একটা হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিলো, শীগগির ওঠো। দিদিমা তোমায় ডাকছে।

সেই দাওয়ায়, ডাইনিং টেবিলের পাশে, ফুলদানির কাছে বসে ছিলেন দিদিমা। সাদা গাউন পরা পায়ের পাতা পর্যন্ত। গায়ে সাদা স্কার্ট। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। রোগা-রোগা চেহারা, দীর্ঘাঙ্গিনীই ছিলেন, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, মুখখানা রেখাঙ্কিত। মাথার চুলও সাদা, ছোট্ট খোঁপা করে বাঁধা। শিশির কাছে গিয়ে বললে, নমস্তে।

কথাটা তিনি ঠিক শুনতে পান নি, তবে ওকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ম্যারিয়া হিন্দীতে জোর গলায় বললে, তোমায় নমস্তে জানাচ্ছে।

বুড়ি মৃদু গলায় বললে, বইঠো।

শিশির বসলো টেবিলের অপর প্রান্তে, ওঁর মুখোমুখি।

বুড়ি তখনো ওকে দেখছে। বললে,—ইণ্ডিয়ান ?

—ইয়েস।

বুড়ি কিছুক্ষণ অপলকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বুড়ির চোখদুটি জলে ভরে উঠলো। ঠোঁটদুটি কাঁপতে লাগলো। তিনি মুখখানা ফিরিয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। তারপর অন্ধ ব্যক্তি যেমন শূন্যে হাত মেলে হাতড়াতে হাতড়াতে পথ চলতে থাকে, তেমনি করে উঠে ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। ম্যারিয়া ওকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললো। মৃদু গলায় ওদের ভাষায় কিছু বললো। বুড়ি কী বললো বোঝা গেল না। শিশির দেখলো, ওকে ধরে ধরে ম্যারিয়া ভিতরের ঘরে চলে গেল। এ ঘরের দরজায় কোনো পর্দা ছিল না। ফরিদা আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

কিন্তু একটু পরেই দরজা ঠেলে ওর কাছে সরে এলো ম্যারিয়া। বললে, বুড়ি একটু 'ইমোশনাল' হয়ে পড়েছে তোমাকে দেখে। কিছু ভেবো না, এখুনি সামলে নেবে। এসো আমরা ওঘরে গিয়ে বসি।

আবার সেই বসবার ঘর।

ম্যারিয়া বললে, বুড়ি একটু কাঁদুক। এমনিতে ভয়ানক শক্ত মনের মানুষ। চোখে জল-টল বেশি আমি দেখিনি। দেশ সম্বন্ধে ভীষণ অভিমান বুকের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, তোমাকে দেখে গলে যায় তো বুড়ি একটু সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

শিশির চুপ করে ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা।

ম্যারিয়া বললে, যাই, খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হলো দেখি।

চলে গেল ভিতরে।

কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। একটু পরেই ফিরে এলো। বললে, বুড়ি একটু সামলেছে। বললে, ওর যেন অযত্ন না হয়। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ো।

শিশির বললে, আচ্ছা ম্যারিয়া, ওঁরই জন্য কি তুমি সত্যি সত্যি আমাকে নিয়ে এলে ?

ম্যারিয়া ওর দিকে তাকালো, কথাটায় অবিশ্বাস করছো নাকি ?

—না—না—ভাবছি শুধু।

ম্যারিয়া ওর কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ে বললে, দেখ, যদি জীবনে সুখী হতে চাও, তো, কখনো ভাবতে বসো না। জীবনে যখন যা ঘটুক না কেন, সহজভাবে নেবে। ঘটনা এলো, ঘটলো, ব্যস সব চুকে গেল, আর দ্বিতীয়বার ওর দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ো না।

—তাই কি পারে মানুষ ?

—আমার বুড়ি দিদিমা হয়ত পারে না, কিন্তু আমি পারি। আজকের মানুষ পারে। আর তাকে পারতেই হবে। নাও এসো, আর বকবক করতে পারি না।

—কোথায় ?

—পাশের ঘরে। আমাকে একটু সাহায্য করবে ? তোমার খাটটা এ ঘরে আনবো।

—কেন ?

ম্যারিয়া হেসে ফেললো, তা বলে কি সত্যি সত্যি একঘরে শোবো নাকি ?

স্বভাবতই শিশির একথায় লজ্জা পেলো। সে বললো, না-না, তা নয়, মানে—

—থাক। এখন এসো। আমরা খাট টানাটানি করি, ফরিদা ততক্ষণে টেবিলে খাবার সাজাক।

খাবার টেবিলে ওরা দুজনেই বসলো। ম্যারিয়া বললে, দিদিমা ঘরেই খেয়ে নিচ্ছে। বুড়ি খায়ই বা কতটুকু ? তাছাড়া শুনলে হয়ত অবাক হবে, বুড়ি ভেজিটেরিয়ান। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছে নাকি দাদু মারা যাবার পর।

—অদ্ভুত তো !

—অদ্ভুত কেন ? ইণ্ডিয়ানদের তো সেটাই দস্তুর।

—তা হলেও—

ম্যারিয়া বললে, বুড়িকে জানো না, ও ভিতরে ভিতরে ভীষণ জেদী মানুষ। অবশ্য, আমি ওর থেকেও বেশি। নাও, রুটি ছেঁড়ো ? হাতে গড়া তন্দুরি রুটি। তোমার ঐ জাহাজ-টাহাজের পাঁউরুটি নয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে এসে দেখলো, ফরিদা খাটের ওপর বিছানা-টিছানা পেতে একেবারে তৈরি করে রেখেছে। পায়ের কাছে একটি কম্বল।

শিশির অবাক হয়ে বললে, কম্বল কী হবে এই গরম কালে ?

—গরম লাগছে কী ?—ম্যারিয়া বললে,—এখানে দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা। শেষ রাত্রে গায়ে কম্বল টেনে দিতে হয়। কী, এখুনি শোবে নাকি ?

—দূর নটাও বাজে নি।

ওর হাতটা টেনে নিয়ে হাতঘড়িটা দেখলো ম্যারিয়া, তারপরে বললে, নটা বাজতে দশ। আমার মনে হচ্ছে, ভীষণ রাত হয়ে গেছে! খুব ঘুম পাচ্ছে কিনা ? যাই, শুয়ে পড়ি ?

—যাও না ?

চাপা হাসিতে ভরে গেল ম্যারিয়ার মুখ। বললে, এতো সহজেই ছেড়ে দিচ্ছো ? তোমার একটি সিগারেটে টান দেবো নাকি ?

শিশির কিন্তু এ পরিহাসে যোগ দিলো না, বললে, আচ্ছা ম্যারিয়া, বুড়ি দিদিমাকে তুমি এতো ভালোবাসো, অথচ ওঁকে ছেড়ে তুমি থাকো কী করে ?

—থেকেছি নাকি ?—ম্যারিয়া বললে,—মাত্র দুবার। নাইটক্লাবে চাকরি করি, কতো রকমের মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। 'অ্যান্টিলোপ' জাহাজের ক্যাপিতানি জাহাজে করে ইণ্ডিয়া যাবার লোভ দেখাতো। রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু সেবার ওর জাহাজ বোম্বে পর্যন্ত গিয়েই ফিরে এলো।

—তারপর ?

—সেই থেকে ক্যাপিতানি আমাকে ছাড়ে না, আমি কী করবো ? টাকাও পাওয়া যায় প্রচুর। এবার 'কালকুত্তা' যাবে শুনে আমি আরও উৎসাহ পেলাম। জিজ্ঞাসা করো, তারপর ?

—তারপর ?

ম্যারিয়া হাসলো। বললো, ক্যাপিতানির বউ সেজে আছি, 'গ্রীক' ছাড়া আর কোনো ভাষা জানি না, তোমাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সব কিছু হঠাৎ ভালো লেগে গেল। ভালো কথা, সেই পুতুলটি দিদিমাকে দিয়েছি। জানো, ভীষণ খুশি। পুতুলটার ওপর বারবার হাত বুলোয়। নিজের হাতে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে, দেখো 'খন।

—কোন্ পুতুলটা?

—সেই যে কালকুত্তায় তোমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম না? ওটা স্যুটকেশে করে জাহাজ থেকে বয়ে আনলাম যে!

—হুঁ, তারপর?

ম্যারিয়া বললে, তোমাকে দেখে বেশ লাগলো। লাজুক-লাজুক ভাব। জাহাজে কনট্রাক্টরের কাজ নিয়ে আসো। আমার খুব মজা লাগতো তোমাকে দেখে। এর মধ্যে পার্সারের হলো অসুখ। লোক নেওয়ার কথা উঠলো। ক্যাপিতানি এদিক থেকে খুব সেয়ানা, লোক না নিয়েই কাজ চালাবার বন্দোবস্ত করলো। আমি তখন জেদ ধরে বসলাম। বুঝলে? আমি না থাকলে তোমার জাহাজে ওঠা জীবনে কখনই হতো না।

শিশির ওর হাতটা চেপে ধরলো। বললে, আমি এখন কী করবো বলো তো?

—কেন? এ কথা কেন?

শিশির কাঁপা গলায় বলে উঠলো, তুমি তো তোমার কথা বলে গেলে। আমার কথাও তো কিছু থাকতে পারে!

—কী কথা?

—আমি জাহাজে আর যাবো না, বাড়িও আর ফিরবো না, এখানেই কোনো কাজটাজ জুটিয়ে দাও। আমি কাজ করবো আর পড়াশুনা করবো। আমি লেখাপড়া জানি না বলেই আমার এত ভয়।

হয়ত সে আরও কিছু বলতো। কিন্তু হঠাৎ ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কথা কেন, বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাসটাও বন্ধ হয়ে গেল। ম্যারিয়া ওকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, খুশি তো?

শিশিরের সারা শরীরের মধ্য দিয়ে বুঝি বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটে গেল। কিন্তু সে কোনো কথাই বলতে পারলো না। ওর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। উঠে দাঁড়ালো ম্যারিয়া, বললে, শুয়ে পড়ো, কথা হবে কাল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নিশ্চুপে। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে ম্যারিয়া। বাইরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলো শিশির। কিন্তু ঘুম আসছে কই? যাকে সে প্রাণপণে ভুলতে চায়, ম্যারিয়া তারই কথা আবার তাকে নিবিড ভাবে মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল।

'অ্যান্টিলোপ' জাহাজটা ইসমাইলিয়ায় পৌঁছে নোঙর ফেলেছে, কোয়ার্টার মাষ্টার পোর্টসাইডের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে স্তিমিতচক্ষু রাত্রির শহরটার দিকে। ক্যাপিতানি ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে মিয়ানী। চিঠি লিখছে একটি নীল কাগজে, মাই ডিয়ার শিশির—

আর তখন কলকাতায় সেই নিশ্চল জাহাজটিতেও দুটি প্রাণীর ঘুম নেই। সেজোবাবুর ঘরে, মশারীফেলা বিছানাটার পাশে ছোট্ট টেবিলের সামনে বসে ঘোমটা-ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পটার আলোয় কীসব কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি নিয়ে তন্ময় হয়ে সে-সব এক মনে পড়ে চলেছেন সেজোবাবু, বিছানায় মশারীর আড়ালে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তাঁর স্ত্রী ও দুই শিশু, পুত্র ও কন্যা। সেজোবাবু অফিসের বাইরের কাজ নিয়েই মত্ত থাকতেন, ভিতরে ভিতরে ব্যবসার অবস্থা যে এমন শোচনীয় হয়েছে তা তিনি জানতেন না। বড়দা নিজেই সব দুশ্চিন্তার ভার বহন করে গেছে, কাউকে কিছু বলে নি। আজ পা ভেঙে পড়তে সব কিছু জানাজানি হয়ে গেছে। একটা ভারী কাজ বাগাবার জন্য জেদাজেদি করে টেণ্ডার দিতে গিয়েই চরম লোকসান হয়ে গেছে। তার ওপর ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট। তাদের রেট-বেড়ে যাওয়া। নাঃ, দোষ দেওয়া যায় না বড়দাকে। এ-ব্যাপারে লোকসান অনিবার্য ছিল। এখন বোম্বেতে গিয়ে কর্তাদের ধরাধরি করে যদি কিছু সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, টাকা যারা ধার দিয়েছে, তারা কারবার 'অ্যাটাচ্' পর্যন্ত করতে পারে। ভরসা ঐ বসন্ত। ওরাই টাকা ধার দিয়েছিল, কড়ার অনুযায়ী যা তারা সময়মতো শোধ দিতে পারে নি। আবার ওরাই তাদের প্রধানতম প্রতিযোগী। ওদের বম্বে-কলকাতা দুজায়গায় অফিস, কিন্তু সেজোবাবুদের মাত্র কলকাতায়। ওরা বড়ো 'ফার্ম', সেজোবাবুরা তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। সব দুশ্চিন্তারই শেষ হয়, যদি ক্যাপ্টেন রিশটারের দৌলতে হান্সা লাইনের সেই কাজটা পাওয়া যায়। কিন্তু তার আগে? কাল ভোরেই প্লেন ধরে সেইজন্য

সেজোবাবু বোম্বে চলেছেন। টিকিট করা হয়ে গেছে। বসন্তকে টেলিগ্রামও করে দেওয়া হয়েছে। উঠতে তো হবে গিয়ে ওর ওখানেই।

সেজোবাবুর মতো অন্য আর একটি ঘরেও আলো জলছিল। এঘরেও টেবিলের সামনে বসে রয়েছে একজন। ঝকঝকে বড়ো ডায়রির একটি পৃষ্ঠা খোলা, কলম হাতে চুপ করে বসে আছে কয়েকটি অক্ষরের দিকে তাকিয়ে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো, পরণের সাদা শাড়িটা একটু অবিন্যস্ত, গায়ে জামা নেই, শুতে যাবার আগে এসে ডায়রি নিয়ে বসেছে, অন্য কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

কলমটা আবার তুলে নিলো। লিখলো,—মানুষ বোধহয় সবসময় তার নিজের কাজের জন্য দায়ী নয়। তার অজ্ঞাতে সে এমন এক-একটা কাজ করে বসে, যার জন্য তার মন সবসময় ঠিক প্রস্তুত থাকে না। আমি দুটো ভুল করেছি। কিসের একটা অন্ধ আবেগ আমাকে প্রথম ভুলটা করিয়েছে, আর সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আমি দ্বিগুণ লজ্জাজনক একটা কাজ করে বসে আছি। এটা করতাম না, যদি না ঐ লক্ষ্মীছাড়ার চিঠিটা আসতো। ওর ঐ চিঠি আমাকে যেন ক্ষিপ্ত করে তুললো। আমি সেই ক্ষিপ্ততার মুহূর্তেই দ্বিতীয় ভুলটা করে বসলাম। যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছিল, আমি উপযাচিকার মতো তাকেই চিঠি লিখে ফেললাম। সে যে আমাকে কতখানি নিচ মনে করলো তা কে জানে! আমি বাজে কথা লিখি নি। লিখেছিলাম, 'দুটি পরিবারে যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিবাহের প্রস্তাব। এর পিছনকার ব্যবসায়ী স্বার্থবোধই আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আপনি ব্যক্তিগতভাবে ভেবে দেখবেন আমি আপনার যোগ্য কিনা। আপনি একান্নবর্তী পরিবারের মানুষ, আমিও তাই। কিন্তু যারা একটু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, যারা নিজস্ব এক রুচিবোধ করে তোলে, তাদের পক্ষে এই একান্নবর্তিতা যে কতো বড়ো অভিশাপ, সে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। বলতে বাধা নেই, আমার পরিপার্শ্ব আমার কাছে জ্বালাস্বরূপ। এর থেকে মুক্তি পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু এক বন্ধন থেকে আর আর এক বন্ধনে গিয়ে না পড়ি, দয়া করে এটা দেখবেন। আপনি আপনার পরিবার থেকে বাইরে আছেন বলেই ভরসা। আমি শুনেছি, আপনার মনেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবল, আপনি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য দেবেন আমি জানি।' কিন্তু আশ্চর্য, পক্ষকাল হতে চললো, কোনো উত্তর পেলাম না। বড্ড লজ্জা করছে।

সেজদা কাল ভোরেই চলে যাচ্ছে প্লেনে করে বোম্বে, ওঁর ওখানেই উঠবে। উনি যদি সেজদাকে আমার চিঠিখানা দেখান ? আমার লজ্জার আর অন্ত থাকবে না। আমি মুখ দেখাবো কেমন করে ?

এই পর্যন্ত লিখেছে, হঠাৎ আলোটা দপ্ করে নিভে গেল। মাথার ওপরকার পাখাটাও থেমে গেল। বুঝলো, 'বৈদ্যুতিক গোলযোগ' ঘটেছে। এখুনি সারা বাড়িতে সাড়া জাগবে। ভিন্ন ভিন্ন ঘরের দরজা খুলবে। বারান্দায় পায়ের শব্দ জেগে উঠবে। আলো নেভার জন্য কেউ তত উদ্বিগ্ন হবে না, পাখা বন্ধ হওয়াতেই দুশ্চিন্তা।

সুষমা ডায়রিটা বন্ধ করে অন্ধকারেই মশারির ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। বাইরে যেন সেজদার গলা শোনা যাচ্ছে। কাকে ডেকে কী যেন বলছে। যা খুশি ওরা বলাবলি করুক, সে উঠবে না, চুপচাপ শুয়ে থাকবে। এলোমেলো চিন্তায় তার ঘুম আসবে না।

কিন্তু, তাই কি হয় ? রাত তিনটের সময় বাড়ির আলোগুলো আবার জ্বলে উঠলো, পাখা আবার ঘুরতে লাগলো বনবন করে। সুষমা অবশ্য টের পেলো না। সে তখন গহীন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে।

আরও দু-ঘণ্টা কাটলো, নিচের অফিস ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। দূরে কোথায় কোন্ বস্তিতে মুরগি ডাকছে। বাইরের ফটকে কড়া নড়ে উঠলো,—মুন্সিজী—মুন্সিজী ?

অফিসঘরের সামনের বেঞ্চিতে একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সারা গা ঘামে ভিজে গেছে, তবু চাদর মুড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যা মশা! ইদানিং কলকাতায় মশা বেড়ে গেছে সাংঘাতিক।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে লোকটা উঠে বসলো। দরজায় তখনো ডাক চলেছে, মুন্সিজী—মুন্সিজী ?

—আ গিয়া ড্রাইভারজী ?—লোকটা এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা খুললো।

ড্রাইভার ভিতরে এলো, বললে, গ্যারাজের চাবি কই, মুন্সিজী ?

—চাবি আছে,—মুন্সিজী ঘুম ঘুম চোখে বললে,—এত তাড়া কেনো, কটা বাজলো ?

—ঘড়ির দিকে তাকাও না ?

মুন্সিজী ঘড়ি দেখে নিয়ে বললে, আই বাপ—পাঁচটা বেজে গেল! দাঁড়াও কলতলাটা ঘুরে আসি। ওপরেও হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে।

মুন্সিজী তাড়াতাড়িই ফিরে এলো। ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বার করে ড্রাইভারকে দিয়ে বললে, লাও ভাই। গাড়ি বাহার করো। লেকিন বাৎ কী আছে? বন্ধে যাচ্ছে কেন সেজোবাবু? শুনছি, ব্যবসাপত্তর ভালো যাচ্ছে না।

ড্রাইভার বললে, কার বা ভালো যাচ্ছে? এ-জাহাজী কারবার এবার লাটে উঠলো! 'লেবার' নিয়ে আর ঠিকাদারী করে খেতে হবে না!

—কেয়া তাজ্জব!—মুন্সিজী বললে, লেকিন ভাই সাব, একটা কথা বলবো। শুনে তোমরা নারাজ হও আর যা-ই করো। সে ছোকরা ছিল বাবুদের সাচ্‌মুচ 'পয়া আদমি', ও চলে গেল তো লাও, বেওসায় মন্দি শুরু হয়ে গেল। সমঝালে আমি কার কথা বলছি? শিশিরবাবু।

এ বাড়িতে সবার আগেই ঘুম ভেঙেছিল দিদিমার। ফরিদা দিদিমার কাছেই থাকে। ম্যারিয়া এসেছে বলে ও বাড়ি গিয়েছিল ছুটি নিয়ে। ফিরে এসে দেখে, ভারতীয় সাহেবটি উঠে বাইরের দাওয়ায় ইজি চেয়ারে বসে আছে, বুড়ি দিদিমা তার ঘরের ভিতরে একটা ট্রাঙ্ক্ খুলে কী-সব কাগজপত্র বার করলো। ম্যারিয়ার সাড়াশব্দ নেই। সে বোধহয় এখনো ওঠে নি।

ফরিদা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল বুড়ির কাছে। বুড়ি চোখে ভালো দেখে না, কিছু ধরতে গেলে হাত কাঁপে, ট্রাঙ্কের ভারী ডালাটা যদি ওর হাতের ওপর পড়ে যায় তো, হাত একেবারে থেঁতলে যাবে।

ফরিদা ধমকে উঠলো। কী করছিলে তুমি? হঠাৎ তোমার ঐ ভারী ট্রাঙ্কটা খোলবার দরকার পড়লো কেন? আমি আসা পর্যন্ত তোমার তর সইলো না!

বুড়ি দুটি অসহায় চোখ মেলে ফরিদার দিকে তাকালো। চোখদুটি লাল। সকালে উঠেও বুড়ি কেঁদেছে নাকি? হঠাৎ নাতনীকে দেখে এত কান্নাকাটিই বা করছে কেন বুড়ি? হাত ধরে ওকে উঠিয়ে দিলো ফরিদা। বুড়ির, অন্য হাতে পুরোনো লালচে কাপড়ে মোড়া কী একটা লম্বা মতন বই বুঝি। ওটা দিয়ে আবার কী হবে? বুড়ি ছেলেমানুষের মতো হাতটা সরিয়ে নিলো। ফরিদা যেন কেড়ে নেবে, এই ভয়! ফরিদা মুখ টিপে হাসলো। মনে মনে

বললো, আমি যদি কিছু তোমার নিতে চাই, তুমি কি বাধা দিতে পারো? তোমার সারা সংসারটাই তো আমার ওপর ফেলে রেখেছো। আমি চুরি করে শেষ করে দিলে তোমার সংসার টেঁকে?

এই সময় ভেসে এলো ম্যারিয়ার কণ্ঠস্বর—ফরিদা?

ফরিদা সাড়া দিয়ে দাওয়ায় এলো। ম্যারিয়ার ঘর খুলে গেল। বাথরুম থেকে মুখে জলটল দিয়ে বেরিয়েছে। বললে,—কফি।

তারপরে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেলে শিশিরের সঙ্গে। অল্প একটু হেসে ম্যারিয়া বললে,—গুড মর্ণিং। কেমন ঘুম হলো?

—ভালো।

—আমিও ঘুমিয়েছি মড়ার মতো। কিন্তু এখানে বসে যে? দিদিমা কই?

—বোধহয় ভিতরে। আমি বসে বসে ঐ অর্কিডটার ফুল দেখছি। কী অদ্ভুত ভায়োলেট্ রঙ, তাই না?

—ভায়োলেট্ তোমার ভালো লাগে?

—লাগবে না!

ম্যারিয়া হাসলো, আমারও রঙটা খুব পছন্দ। আচ্ছা, বসে থাকো, আমি একটু ঘরদোর দেখি।

একটা সুর গুনগুন করতে করতে ম্যারিয়া তার দিদিমার খোঁজেই গেল বুঝি।

ওখানে বসে সামনে তাকালে একফালি উঠোনটার পাড়ে উঁচু ইটের দেওয়ালটা দৃষ্টি রোধ করে। অন্য স্যুটে যারা থাকে তাদের একটি ছোটছেলে লাল রঙের খেলনা-মোটরে চড়ে ঐটুকু উঠোনেই চক্কর দেবার চেষ্টা করছে। টুকটুকে ফরসা ভারী সুন্দর ছেলেটা। সকাল হতে সারা বাড়ি জুড়ে তবু একটু কোলাহল জেগে উঠেছে। কে জানে কেমন শহর এই আলেকজান্দ্রিয়া। আজ একবার ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

সকালের প্রাতরাশ শেষ করবার পর সেই প্রস্তাবই করলো শিশির। ম্যারিয়া বললে, একা বেরোবে নাকি?

—তুমিও চলো না?

ম্যারিয়া হেসে ফেললো। বললো, এই তো পুরুষের বুলি ফুটেছে। কমপ্লেক্স—কমপ্লেক্সই তুমি গেলে!

কথাটা মিয়ানীও বলতো। শিশির জিজ্ঞাসা করলো, কিসের কমপ্লেক্স?

—নিজেকে 'ছোট' ভাবা। মিঃ ব্রাউনস্কিন, এখানে তুমি কারও সাবর্ডিনেট্ নও, বুঝলে?

শিশির বললে, আমাকে হঠাৎ 'ব্রাউনস্কিন' বললে কেন?

ম্যারিয়া চোখ বড়ো বড়ো করে ওর দিকে তাকালো,—ও জিউস! এ কমপ্লেক্সটাও আছে দেখছি! না—না—তুমি ব্রাউনস্কিন নও, তুমি ফেয়ারস্কিন।

শিশির বললে,—ইউ সিলেকটেড এ রং পার্সন। ফুল অফ কমপ্লেক্স!

ম্যারিয়া বললে, জানো? এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা কী বলেন? লজ্জা পাবে না তো কথাটা শুনলে?

—কী?

—নিজেকে ছোট ভাবার এই যে কমপ্লেক্স,—একে দূর করতে হলে উঁচু কোটির মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হয়।

—মানে!

—মিশতে হয়, কথাটা বুঝলে তো? একটু ফ্লার্ট-টার্ট—

সোজা হয়ে বসলো শিশির। কিন্তু ম্যারিয়ার চোখের দিকে সোজা তাকাতে পারলো না, মুখটা নামিয়ে নিলো।

ম্যারিয়া তরল কণ্ঠেই বললে, সত্যি বলো, দেশে থাকতেই এরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কী?

শিশির উঠে দাঁড়ালো, পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

দাওয়া থেকেই ম্যারিয়া বললে, কথাটা কিন্তু সত্যি। অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে।

ভিতর থেকে শিশির বললে, আমার মনে হয় ঠিক উল্‌টো। কমপ্লেক্স বাড়ে।

পর্দা সরিয়ে ম্যারিয়া বললে, অভিজ্ঞতা আছে তাহলে?

প্রথমটা একটু বিচলিত বোধ করলেও নিজেকে সামলে নিলো শিশির। বললে, অভিজ্ঞতা হলো না? একজন শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে মিশছি—

ম্যারিয়ার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠলো, বললে,—যাঃ! তাই বলেছি বুঝি? আমি বলছিলাম অন্য কোনো—

—আমি ত তোমাকে বলেছি, আমার কেউ নেই, আমি এক সংসারে আগাছার মতো বেড়ে উঠেছি মাত্র।

ম্যারিয়ার মুখখানাও গম্ভীর হয়ে এলো। অন্য দিকে চোখ রেখে কী যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে সব ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো করে বলে উঠলো, যাক, শোনো? স্যুটকেশ থেকে পোশাক বের করে দিচ্ছি, তৈরি হয়ে নাও।

একটু হেসে শিশির বললে, আমার ওটাকে স্যুটকেশ বলছো? ওটা স্টিলের ট্রাঙ্ক। বয়ে আনতে যা কষ্ট হয়েছে না!

ম্যারিয়া হাসলো, খুব হয়েছে? আমারটাও কি কম ভারী নাকি!

—আফটার অল, ওটা স্যুট্‌কেস্‌।

ম্যারিয়া বললে,—মানলাম। এখন ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক অনেক জায়গায় যেতে হবে। টাকা ভাঙানো টাঙানো অনেক কাজ। তোমার জাহাজী কাগজপত্রও সঙ্গে নেবে! আইডেনটিটি কার্ডটার্ড সব। এসব ঝামেলা আজই চুকিয়ে ফেলা দরকার।

বলে, ম্যারিয়া ভিতরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ দেখা গেল, দিদিমা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন, হাত একটা বিবর্ণ লাল রঙের জীর্ণ কাপড়ের মোড়ক।

—দিদিমা!

বুড়ি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে যা বললেন, তার অর্থ, তোদের সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।

তারপরে শিশিরের দিকে তাকিয়ে,—বইঠো বেটা।

ওকে ধরে ম্যারিয়া বসিয়ে দিলো কৌচটাতে। নিজে গিয়ে দাঁড়ালো বুড়ির পাশটিতে, একটা হাতল ঘেঁষে।

বুড়ি সামনের টিপয়ে মোড়কটা রেখে আবার ওর দিকে তাকালেন পুরু কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে। অদ্ভুত কোমল দৃষ্টি।

ম্যারিয়া বললে, এটা কী, দিদিমা?

দিদিমা উত্তর না দিয়ে মোড়কটা খুলতে লাগলেন। খুলতে গিয়ে হাতটা থরথর করে কাঁপছিল।

ম্যারিয়া বললে, কী এটা? বই?

দিদিমা মুখ নিচু করলেন। টপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো মোড়কটার ওপর।

কী একটা বস্তুর ওপর লাল কাপড়টা জড়ানো। সেটার পাক খুলতে খুলতে অবশেষে লম্বা ধরণের কী একটা বস্তু বেরিয়ে এলো। সেটা আবার মোটা

সুতোয় জড়ানো। বহু পুরাতন জরাজীর্ণ জিনিসটা। সুতোটা কালো হয়ে গেছে, সেটা কোথাও গিঁট বেঁধে গিয়ে থাকবে। বুড়ি পারছিল না দেখে ম্যারিয়া তার কৌচের হাতলটার ওপরে বসে ওটা হাতে নিয়ে সুতো ধরে টান দিতেই সুতোটা ছিঁড়ে গেল। বুড়ি কানে শোনে না, কিন্তু মনে হলো সুতো ছেঁড়ার শব্দটুকুও বুঝি তার মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে। ম্যারিয়া ততক্ষণে পটপট করে সব সুতোগুলোই ছিঁড়ে ফেললো।

দেখা গেল, লম্বা দুটো কাঠ, তার মধ্যে লম্বা ধরনের মোটা কাগজ, না কী, ফিকে হলুদে, তাতে টানা টানা কালো অক্ষরে কী সব লেখা।

ম্যারিয়া সবিস্ময়ে বললে, বই নাকি? এ আবার কী ধরণের বই? কোথা থেকে পেলে?

কথাগুলো সে জোরেই বলছিল হিন্দীতে, দিদিমা যেন শুনতে পায়।

দিদিমা উত্তরে বললেন, আমার কাছে ছিল।

—দেখি নি তো কখনো?

দিদিমা ম্লান হাসলেন—১৯০৫ সালের পর থেকে আর খোলা হয় নি।

—সে কী! - ম্যারিয়া বললে,—এটা কী ভাষা?

দিদিমা ওটা ইঙ্গিতে শিশিরকে দিতে বললেন।

শিশির হাতে নিয়েই চমকে উঠলো। কাগজ নয়, তালপাতা। বহু পুরাতন তালপাতা। আংশিক জীর্ণ হয়ে গেলেও একেবারে খসে যাবার মতো হয় নি।

শিশির অস্ফুট গলায় বলে উঠলো, পুঁথি!

কী আশ্চর্য, কথাটা কানে গেল দিদিমার। এইদিকে অখণ্ড মনোযোগ ছিল বলেই বোধহয় শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা উজ্জ্বল হলো তাঁর। শব্দটা যেন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, ওর মুখে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা তাঁর মনে পড়ে গেল। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, পোথি।

ম্যারিয়া অবাক হয়ে সব দেখছিল। উত্তেজনায় শিশিরের গলার স্বরও কাঁপছিল। বাংলায় বলে উঠলো,—এ কী! এ যে বাংলা লেখা!

নাতনী-দিদিমা দুজনেই ওর মুখের দিকে তাকালো।

তালপাতার প্রথম পৃষ্ঠাটার মাঝখানেই লেখা রয়েছে পুঁথির নাম—লেখকের নাম। পরিষ্কার মাত্রা-টানা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'মনসার ভাসান',—'দ্বিজ বংশীদাস'।

জোরে জোরে কথাগুলো পড়েই ফেললো শিশির। শুনে দিদিমার চোখে এবার বোধহয় তীব্র আনন্দেই জল এসে গেল।

বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করলো শিশির—এ পুঁথি আপনার?

দিদিমার হাত পা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। কোনোক্রমে মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

—আপনি কি বাঙালী?

দিদিমার মুখখানা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কোনক্রমে কথাগুলো টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন, হামি বাংগালী।

শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো,—বুঝলে ম্যারিয়া? You understand? She from my land!

—কালকুত্তা?

দিদিমা অবসন্নভাবে নিজেকে কৌচের ওপর এলিয়ে দিতে দিতে উঁহু উঁহু করে মাথা নাড়লেন। বললেন,—মমিন—মমিন Sing.

শিশির বলে উঠলো, মৈমনসিং। আমি জানি।

কিন্তু দিদিমা ততক্ষণে সমস্ত শরীরটাকে কৌচে এলিয়ে দিয়েছে। সারা অঙ্গ দেখতে দেখতে শিথিল হয়ে গেল। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো ম্যারিয়া। তারপরে দিদিমার মাথাটা বার কয়েক নেড়ে, বুকে হাত দিয়ে, নাড়ি টিপে দেখে, একটু যেন আশ্বস্ত হলো, বললে, হোঁশ নেহী! Faint হো গয়ী।

সন্ধ্যাবেলা দিদিমার ঘরে বসেই পুঁথিখানা পড়ছিল শিশির। দিদিমার শরীরটা দুর্বল, বিছানায় এলিয়ে শুয়ে আছেন। শিয়রে সাদা একটা গাউন পরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে ম্যারিয়া, মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দিদিমার মাথায়। অদূরে একটা টুল পেতে বসে আছে ফরিদা। শিশিরের চেয়ারের সামনে একটা টিপয়, তার ওপর টেবিলল্যাম্প আর সেই পুঁথিখানি। জোরে জোরেই পড়ছিল শিশির—

'সম্বাদ পাঠাইয়া আনে ধন্বন্তরী সুতে।
চান্দ বলে লখাইরে জিয়াও ত্বরিতে।
তারে শুনি সুষেণ কহিল খড়ি লেখে।
বিনা পদ্মা পূজিলে জিয়ন নাহি দেখে।
কোপ করি বলে চান্দ সে তো আমি নই।
ধন্বন্তরীর বেটা দেখি তে কারণে নাই॥

শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কানী পরাণ থাকিতে।
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া।'

পড়তে পড়তে এইখানে একটু থামলো শিশির, জিজ্ঞাসা করলো,—বুঝতে পারছেন ?

দিদিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—থোড়া থোড়া—ইয়ানে—

শিশির বললে, কিছু কিছু।

—কিছু কিছু—দিদিমা বললেন, —১৯০৫—ইস্‌কো বাদ ও বাষা বলতাম না। বুলে গেছি।

শিশির ম্যারিয়াকে দেখিয়ে বললে, আপনার পরিচয় এরা কিছু জানতো না ?

হাত নেড়ে দিদিমা জানালেন, না। ইথানে ইণ্ডিয়ান কিছু ছিল, কায়রোতে আছে, সার্চ করলে বাংগালী মিলতো। হামি যায় না। গোঁসা হয়ছিল।

তারপরে ম্যারিয়াও যাতে কথাগুলো বুঝতে পারে সেইজন্য তাঁর অভ্যস্ত ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে দিদিমা যা বলতে শুরু করলেন, তার তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়, —এটা ১৯৬৩ সাল, কেমন ? তাহলে আঠান্ন বছর আমি ও-পুঁথি খুলি না, বা ও-ভাষা বলি না। সেইজন্য সব ভুলে গেছি।

শিশির বললে, পুঁথিটা কি আপনার ?

দিদিমার গলাটা ধরে এলো। কোনক্রমে বললেন, আমার মায়ের। মা পেয়েছিল তাঁর বাবার কাছ থেকে। আমার টিনের বাক্সতেই ওটা থাকতো। যখন তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে চলে আসি, তখন ভুলে ওটাও চলে এসেছে।

একটু দম নিয়ে দিদিমা আবার বলতে শুরু করলেন তার অভ্যস্ত ভাষায়—সালটি বেশ মনে আছে: ১৯০৫ সাল। আমার তখন আঠারো বছর বয়স। মা মারা গেছে বছর দশেকের সময়। বিমাতার ঘরে থাকি। সুখে ছিলাম না, খুব কষ্টেই দিন কাটতো। সেইজন্য তখন হঠাৎ এক লোভে পড়লাম। বিয়ে থা হয় নি। একটি ছেলেকে জানতাম, কলকাতায় থাকতো, ছুটিতে ছুটিতে দেশে আসতো। সে আমাকে বিয়ে করতে চাইল। ভিন জাত। তার কথায় ভুলে একদিন তার সঙ্গেই পালিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। ওখানে

কদিন থেকে ছেলেটা বললো, পিছনে পুলিস লেগেছে, চলো পালিয়ে যাই। নিয়ে তুললো একেবারে বোম্বাই। এখানেই কথা বলতে বলতে হিন্দী শিখেছিলাম। কিন্তু একদিন তার নেশা বোধহয় কাটলো। আমাকে কায়দা করে বিক্রি করে দিলো মেয়ে-কারবারীদের হাতে। তারা যে কী করে আমাকে কায়রোতে নিয়ে এলো সে আর শুনতে চেয়ো না। কায়রোতে হঠাৎ এই ম্যারিয়ার দাদামশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। বড়ো ঘরের ছেলে। তিনি জগলুল পাশার দলের লোক, উদার চরিত্রের। আমাকে কোনক্রমে বোম্বেটেদের হাত থেকে উদ্ধার করে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। তাঁর ধর্মই আমার ধর্ম হলো। আমাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। সেই থেকে আমার দেশের ওপর অভিমান, দেশের লোকের ওপর অভিমান। আমার চার চারটি ছেলে ছিল, একটি মেয়ে। মেয়েটি ছোট। ছেলেরা সবাই গুপ্ত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাবা একে একে মারা পডলো। তাদের বাবা তো সবাব আগে। আলেকজান্দ্রিয়ায় তখন গুপ্ত হত্যা লেগেই ছিল। কখনো বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে লডাই করে লোক প্রাণ হারাচ্ছে, কখনো ভুল সন্দেহে দলের লোকেরা এসে মেরে যাচ্ছে। যাক. সেসব দিনের কথা না বলাই ভালো। মেয়ের বিয়ে দিলাম একটি গ্রীক ছেলের সঙ্গে। এখানকার কলেজে পডতো, খুব সুপুরুষ ছিল। সেই-ই হচ্ছে ম্যারিয়ার বাবা। এই তো সেদিনের কথা। মেয়ে জামাইতে হঠাৎ কী নিয়ে ঝগডা হলো। জামাই সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে গ্রীসে ফিরে গেল। এই মেয়ে তখন বছর পাঁচেকের। তারপরে লাগলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জামাই আর ফিরে এলো না। শোনা যায় সেখানে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পডে শেষপর্যন্ত মারাই গেছে। এদিকে যুদ্ধের সময় মিশরে যা হয়েছিল তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমরা তখন খেতে পাই না এমন অবস্থা। আমার মেয়ের আয়েই তখন সংসার চলছিল। নাতনী বড়ো হলো, স্কুলে পড়ে পাসও করল, এই সময় হঠাৎ ওর মা একজনের সঙ্গে ভাব করে ইংলণ্ডে চলে গেল। আর এলো না। সেই থেকে আমি পড়েছি নাতনীর ঘাড়ে। আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না। নইলে হঠাৎ এই এতদিন পরে বুড়ো বয়সে সেই কোথাকার দেশ নিয়ে আমার এত ছট্‌ফটানি বাড়বে কেন? কোথাও কোনো ইণ্ডিয়ান এসেছে শুনে যেতে ইচ্ছে করতো। কখনো ম্যারিয়াকে এসব বলিনি। তবু কী করে যেন আমার মনের ভাবটা ও টের পেতো। তাই দেখে ওর জাহাজে কাজ নিয়ে বোম্বাই ছুটে যাওয়া, কলকাতায় ছুটে যাওয়া।

বলতে বলতে এইখানে আবার গলাটা ভঁর ধরে এলো। ম্যারিয়া ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলো, থাক, আর বোলো না। এখনো খুব দুর্বল তুমি। ওষুধ খাওয়ার সময় হলো।

ছাই ওষুধ! ওষুধে কী হবে?

বলতে বলতে শিশিরের দিকে ফিরলেন দিদিমা, বললেন, আমার তো তবু দোষ আছে। বিমাতার দেওয়া জ্বালা, অপমান আর মারধোর সহ্য করতে না পেরে একজনের কথায় লোভে পড়ে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু জোর করে মেয়ে চুরি করে চালান দেয়, এটা এখনো আছে! তোমাদের দেশ না স্বাধীন হয়েছে? যে মেয়েদের চুরি করে চালান দেয়, তাদের অবস্থা কী হয়, এই নিয়ে এখনো কেউ ভাবছে না! কাল আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম। একটা বাড়িতে একটি মেয়েকে এনে পুরেছে। ইণ্ডিয়ান শুনেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, শুধু ভারতীয়ই নয়, বাঙালী। মেয়েচোরদের কাছ থেকে এক শেখ তাকে অনেক টাকায় কিনে নিয়েছে। শাদিও হয়ে গেছে তার ঐ শেখের সঙ্গে। ভারতীয় কারও সঙ্গে মিশতে দেয় না, আমাকে ভারতীয় জানলে আমাকেও কথা বলতে দিতো না। পুঁথিটা তাকে দিয়েই পড়াবো ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারি নি। যদি মেয়েটার ওপর নির্যাতন হয়!

শিশির বিস্ফারিত চোখে দিদিমার কথাগুলো শুনছিল। ম্যারিয়াও নির্বাক হয়ে গেছে। ফরিদারও মুখে কথা সরছিল না।

এক মুহূর্ত থেমে থেকে দিদিমা বলতে লাগলেন, –মেয়েটার ইতিহাস শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। মেয়েটির বাপকে কেটেছে মেয়ের সামনে, মাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে। একটা ভাই ছিল, তাকেও খুন করেছে। এক দিদি ছিল বিধবা; পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলে সঙ্গে। তাদেরও কোনো উদ্দেশ নেই। মেয়েটির চরম সর্বনাশ করেও বদমাসদের লালসা মেটেনি, তাকে আরও যুবতী মেয়ের সঙ্গে এক জাহাজে উঠিয়ে একেবারে দূর বিদেশে কোথায় চালান করে দিয়েছে। মেয়েটি বললে, জাহাজ যখন ছাড়ে, তখন জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দিনী মেয়েগুলো চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তাদের সেই বুকফাটা কান্না শুনে কেউ কি বিচলিত হলো না? কেউ একবার প্রতিবাদ করলো না? জেটিতে পুলিস ছিল, কাস্টম্‌স ছিল, পাহারাদার ছিল, কেউ একবার ছুটে এলো না হতভাগিনীদের উদ্ধার করতে?

মুখ নিচু করে বসে রইল শিশির। ঘরটা তখনো দিদিমার শেষ কথাগুলোর

ধ্বনিতে থমথম করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে শিশির মুখ তুললো। কী যেন বলতেও গেল, কিন্তু পারলো না।

ম্যারিয়া চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছে। মুখখানা কিসের এক প্রতিজ্ঞায় যেন দৃঢ়। নিস্তব্ধতার মধ্যেই সময় পার হয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ একসময় মুখ তুলে ম্যারিয়া তার দিদিমাকে বললে, কাল আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারো সেখানে ?

দিদিমা বললেন, পাগল ! কাউকে দেখা করতে দেয় না। আমি বুড়ি থুথ্‌রি বলে বোধহয় আপত্তি করে নি।

আর কোনো কথা হলো না। আবার অখণ্ড নীরবতা নেমে এলো।

একটু পরে বাইরে কার পদশব্দ বেজে উঠলো। ফরিদা উঠে দরজার কাছে গেল। ম্যারিয়া সেইদিকে তাকালো, জিজ্ঞাসা করলো, হোটেল থেকে লোক এলো বুঝি ?

—না—ফরিদা বললে,—টেলিগ্রাম।

পিওনের খাতায় ফরিদাই সই করে তারটা নিলো। ম্যারিয়া বললে,—কার ?

—তোমার,—বলে ওর কাছে এসে ওর হাতে তারটা তুলে দিলো।

খাম খুলে ম্যারিয়া এক নিঃশ্বাসে পড়লো টেলিগ্রামটা, তারপরে শিশিরের দিকে এগিয়ে দিলো। শিশির পড়লো—Ship arrived Lake Timshah Captain wants both you join ship at Port Said—Miani. অর্থাৎ, মিয়ানী তার পাঠিয়েছে, ক্যাপ্টেন চায় তোমরা দুজনেই পোর্ট সৈয়দে জাহাজে এসে ওঠো। জাহাজ এখন লেক টিমসাহ্‌তে এসে পৌঁছেছে।

শিশির মৃদু গলার জিজ্ঞাসা করলো, 'টিমশাহ্‌' লেকটা কী ?

ম্যারিয়া উত্তর দিলে, 'লিটল বিটার, 'গ্রেট বিটার', এই দুটো লেক পেরিয়ে আবার একটা ছোট ক্যানাল পার হতে হয়। তারপরে পড়ে 'টিমশাহ্‌' লেক। এখান থেকে মূল সুয়েজ ক্যানাল শুরু। জাহাজগুলো এখানেই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঢোকবার জন্য। এই লেকের ক্যানাল-পয়েন্ট থেকে ইসমাইলিয়া শহর চার-পাঁচ মাইল হবে। কিন্তু নাবিকরা এটাকেই ইসমাইলিয়া বলে। আমরা যখন সুয়েজ থেকে ট্রেনে আসছিলাম, তখন এরই মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে আমরা গেছি। লাইনটা এখান থেকেই বাঁক নিয়েছে পশ্চিম দিকে।

শিশির বললে, তা তো হলো। এইবার ?

তাচ্ছিল্যের স্বরে ম্যারিয়া বললে, ওটা ছিঁড়ে ফেলো।

—ক্যাপিতানির রাগ পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

মুখখানা কঠিন হয়ে গেল ম্যারিয়ার। বললে, রাখো দেখি ওসব কথা।

দিদিমা এইবার মুখ ফেরালেন ওদের দিকে, বললেন,—কী সব বলাবলি করছিস তোরা ?

ম্যারিয়া খাট থেকে নেমে পড়লো, বললো, ঘর-সংসারের কথা। এবার খেতে-দিতে হবে না ? ওঠো।

—তোদেরটা এসেছে ?

—আসছে। তুমি নিরামিষ খাও, তোমারটা তুমি সেরে নাও না ?

বোম্বে থেকে কল্যাণ হয়ে যে অপরিসর বাঁধানো রাস্তাটা পুনার দিকে চলে গেছে, তার মাঝামাঝি জায়গা থেকেই পর্বতমালার বিস্তার বলা যায়। আর তারই মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে সুদৃশ্য পুনা পথ। এইরকমই পর্বতসংকুল একটি জায়গার নাম, 'নোনাভ্‌লা'। বহু সৌখীন লোক এখানে বাড়ি করেছেন। সুন্দর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কেউ কেউ সারা সপ্তাহ বোম্বেতে থেকে সপ্তাহান্তিক ছুটিটা এখানে কাটিয়ে যান। কেউ কেউ আবার এখানেই থাকেন, মটোর যোগে রোজ বোম্বে যাতায়াত করেন।

কোন্‌ এক প্রখ্যাত শিপিং কোম্পানীর বড়কর্তা এমনিভাবেই এখানে এসে উঠেছিলেন তাঁর স্বল্পমেয়াদী ছুটিটা কাটাবার জন্য। আমাদের সেজোবাবু এঁরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বম্বে থেকে সরাসরি ট্যাক্সি করে। এখন ট্যাক্সি করেই আবার ফিরে চলেছেন বম্বে। হয়ত আরও একটু বসতেন, হয়ত বা সন্ধ্যা পর্যন্তই থাকতেন, কিন্তু অকস্মাৎ 'মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং' লক্ষ করে বেলা থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়লেন। মনটা ভালো ছিল না, কারণ, কার্যোদ্ধার হয় নি।

বোম্বে পৌছতে রাত হয়ে গেল। আটটা-সাড়ে আটটার কম নয়। ফিরোজ শা' মেটা রোডের বাড়ির তেতলায় বসন্তের ফ্ল্যাটে যখন পৌছলেন, তখন বসন্ত সবে তার অফিসের কাজকর্ম সেরে পাশের ঘরে এসে সোফাটার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। ওঁকে দেখেই উঠে বসলো, কী তার কাজ হলো ?

ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে সেজোবাবু বিরস মুখে বললেন, না।

—কী বললো সাহেব?

—স্পষ্টই বললো, 'বিল'-এ কোনো কন্সিডার করা সম্ভব হবে না।

—একটু পীড়াপীড়ি করেছিলেন?

—তা আর করিনি?

বসন্ত একটু অর্থপূর্ণ হেসে বললে, অন্য কিছু? We will satisfy you by every possible means?

দুঃখের মধ্যেও সেজোবাবু একটু হাসলেন, বললেন, -লোক বড়ো কড়া। সেইদিকের ধার দিয়েও গেল না।

বসন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, -হুঁ, শুনেছি, লোকটা ঐরকম। তা আপনাদেরও বলি, জেদের মাথায় অমন 'লো' টেণ্ডার দিতে গেলেন কেন? 'লেবার' নিয়ে কারবার, একটু হুঁশিয়ার হয়ে কাজকর্ম করা উচিত নয় কী?

—কতো আর হুঁশিয়ার থাকা যায় বলো? কনট্রাক্টরি ব্যবসা তুলে দেওয়াই উচিত।

বসন্তের দাদার বন্ধু হচ্ছেন এই সেজোবাবু। সেই সূত্রে উনি বসন্তকে বরাবরই 'তুমি' করে বলতেন। নতুনের মধ্যে বসন্তকে নিজে থেকেই সিগারেট অফার করেছেন, বলেছেন, আরে খাও—খাও, লজ্জা কী?

আপাতত চা যখন এলো, তখন চায়ের পর দুজনে ধূমপানে রত হতে আর দ্বিধা করলেন না।

বসন্ত বললে, খুবই হার্ড টাইম। তা এখন তাহলে কী করবেন ঠিক করেছেন?

সেজোবাবু সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, করবো আর কী! তোমাদের ঋণ শোধবার সবরকম চেষ্টাই করতে হবে। অবশ্য বাড়ি অ্যাটাচ্ করতে পারবে না, ব্যবসাটাকে ঘা দিতে পারো।

বসন্ত বললে, আমার দাদাদের এরকম কোনো মতলব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ভালো কথা, একটি খবর জানেন? হান্সা লাইন নতুন করে আবার খুলছে।

সেজোবাবু বললেন,— জানি।

—চেষ্টাচরিত্র করছেন নাকি?

—তা একটু-আধটু।

বসন্ত বললে, আমাদের লোক সোজা জার্মানী চলে গেছে। গতকাল কলকাতা থেকে ট্রাঙ্কল পেয়েছি, জার্মানীর 'কেবল' এসেছে, সংবাদ শুভ।

—সে কী!—সেজোবাবু বললেন, —একেবারে জার্মানী! কে গেল?

—আমি যেতে চেয়েছিলাম। আমাকে পাঠালো না।

—কেন?

অল্প একটু হেসে বসন্ত বললে,—আজকালকার যুগ তো? ভাই ভাইকে বিশ্বাস করে না। কী জানি ওটা যদি আমি নিজের নামেই বাগিয়ে নেই? তাই আমাদের ম্যানেজার মশাইকে পাঠানো হয়েছে।

—হুঁ—বলে মুখ কালো করে বসে রইলেন সেজোবাবু। রিশটার সাহেবকে চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু কোনো উত্তর আসে নি। এখন যা শোনা গেল, তাতে করে উত্তর আর আসবে বলে মনে হয় না। সশরীরে ছুটে যাওয়া আর চিঠি লেখায় অনেক তফাৎ। সোজাসুজি জার্মানী যাওয়ার কথাটা সেজোবাবুদের মাথায় আসে নি।

বসন্ত বললে, আমার নিজস্ব কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

- বলো।

বসন্ত একটু ইতস্তত করে তারপরে বললো, অনেক কথা। একেবারে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিয়ে বসলে হতো না?

—বেশ।

তাই হলো। খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে ওদের সেই ঘর, অর্থাৎ শোবার ঘরেই এসে বসলো ওরা দুজনে। বোম্বেতে ঘরের চাহিদা অসম্ভব, তাই একটি ঘরেই ওদের পাশাপাশি দুটো সরু সরু খাট পড়েছে। অন্যদিকে সোফা-কাউচ সাজানো। পাশের ঘরটি অফিসঘর। ঠাকুর আর চাকর শোয় ষ্টোররুমে। কখনো বা ভিতরের বারান্দায়, যেখানে খাবার টেবিল রয়েছে, সেখানেও শোয়। এই হলো বোম্বের চেহারা। এই দুখানা ঘর পেতেও কি কম মেহনত করতে হয়েছিল? সেজোবাবু বালিশে মাথা রেখে শুয়েই পড়লেন বিছানায়। বললেন, বলো, কী তোমার বক্তব্য?

বসন্ত বললে, দেখুন, জার্মানী যাওয়া নিয়ে আমি একটু মর্মাহত হয়েছি। এতগুলো টাকা খরচা করে প্লেনে লোক পাঠানো! এতে ভাইয়ের থেকে বাইরের লোক বেশি আপনার হয়ে গেল?

সেজোবাবু বললেন, এ নিয়ে কিন্তু তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়।

যেভাবেই হোক, কাজটা পেয়ে যাচ্ছো তো? All well that ends well.

বসন্ত বললে, তা অবশ্য। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কী?

—আমার শেয়ার নিয়ে আমি আলাদা হয়ে যাবো কিনা?

প্রায় উঠেই বসলেন সেজোবাবু, বললেন,—বলছো কী? নতুন একটা লাইন পাচ্ছো! আলাদা হয়ে গেলে তার কোনো advantage-ই পাবে না যে!

—নাইবা পেলাম,—বসন্ত বললে,—আপনি কি ভাবছেন ঐ কনট্রাক্ট পেয়ে খুব একটা কেউ লাভবান হবে? হবে না। লেবার-প্রবলেমও সল্‌ভ্‌ড হবে না, কনট্রাক্টারদেরও সিকিউরিটি আসবে না।

সেজোবাবু কথাটা চিন্তা করলেন। তারপরে বললেন,—তা যা বলেছো। হাড়ে-হাড়ে জিনিসটা এখন বুঝছি!

বসন্ত বললো, বাকি রইলো ডুবাসিং। তা-ও প্রত্যেকটি জিনিসের বাজার-দর বেঁধে দেওয়া থাকে মিউনিসিপ্যাল-লিস্টে। একটা আইটেমেও আপনি এক পয়সা বেশি নিতে পারবেন না। কী এমন লাভ থাকে, বলুন? এই কম্‌পিটিশনের মার্কেটে?

সেজোবাবু বললেন, এসব ছেড়ে, যা দেখছি, চাকরি করাই ঢের ভালো ছিল?

বসন্ত বললে, সে আপনি পারবেন না। চাকরির টেমপারমেণ্ট আলাদা। আপনার অভ্যেস নেই, পারবেন কেন? এক পাই-ই আসুক, বা একটা টাকাই আসুক, নিজের ব্যবসা তো বটে! এ-উপার্জনের একটা আনন্দ আছে।

সেজোবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা আছে, কিন্তু সব কিছু কেমন বদলে যাচ্ছে দেখছো তো? প্রতি বছর টেণ্ডার দিয়ে কাজ নিতে হচ্ছে। পুরোনো ঘর ছুটে যাচ্ছে। কলকাতা বন্দরের অবস্থা খারাপ। এক পারা যায় নতুন নতুন যে সব বন্দর হচ্ছে, সেখানে যাওয়া। যেমন ধরো, ওখা, কি কাণ্ডলা।

বসন্ত একটু হেসে বললে, অর্গানাইজ করা শক্ত। লেবার নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে। যেহেতু আপনি বাঙালী, আপনার পক্ষে ভিন্ প্রদেশে কাজ করা অসম্ভব হবে।

সেজোবাবু সোজা হয়ে বললেন, কলকাতায় সবাই আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। নিরাশ হয়ে যখন ফিরবো, তখন সারা বাড়িটা যেন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। বাড়ির বাচ্চা ছেলেটাও চেঁচিয়ে কথা বলতে ভয় পাবে।

বসন্ত বললে, শুনুন স্যার, আমি আপনাকে একটা কথা সোজাসুজি বলি। জাহাজ ছেড়ে অন্য দিকে মন দিতে হবে। হাতে কিছু থাকলে 'A to Z' ব্যবসা করা যায়। আমি অন্তত সেইভাবে চিন্তা করছি। দাদাদের লিখেছিলাম। দাদারা রাজী নয়। তার ওপরে নতুন লাইন পাচ্ছে, এখন তো কোনো কথাই কানে তুলবে না।

সেজোবাবু বিস্মিত হয়েই বললেন, তুমি কি সিরিয়াস্‌লি ভাবছো নতুন কিছু করার কথা ?

বসন্ত বললে, সেই মাছের গল্পটা মনে আছে তো ? অনাগত বিধাতা'? আমিও বোধহয় সেইরকম। জার্মানী যাবার ব্যাপারটা নিয়ে যা ঘটেছে, তাতে করে আমি আমাদের পরিবারের আসন্ন ফাটলটা লক্ষ করেছি। দ্বিতীয়ত, ঋণের ব্যাপারটা নিয়েও আপনাদের ওপরে এখন এত চাপ দেবার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। চিঠিতে আমার মতামত জানিয়েও ছিলাম। তাতে দাদারা যা লিখেছিলেন, তা মুখ ফুটে আপনার কাছে বলা দুষ্কর।

—কেন, বলোই না ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে বসন্ত বললে, হ্যাঁ, বলাই ভালো। লিখেছিল, ভাবী শ্বশুরবাড়ির প্রতি এত টান দেখছি ? আর শুধু তা-ই নয়। আপনি আসছেন ওরা খবর পেয়ে গিয়েছিল। আপনার আসার আগের রাত্রেই আমাকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন ওঁরা। যা বুঝলাম, আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো সম্বন্ধ স্থাপন, এতে ওদের আর আগ্রহ নেই। কমার্শিয়াল মানুষ, ব্যারোমিটারের মতো ওদের মতামত ওঠানামা করে।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সেজোবাবু। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। তারপরে ধীরে ধীরে একসময় বললেন, আমার বোধ হয় তোমার এখানে এসে না ওঠাই উচিত ছিল।

বসন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, না—না, আপনি 'আমার' কাছে এসে উঠেছেন, 'আমাদের' কাছে এসে ওঠেন নি। আমারও তো একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে।

তারপরে একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে লাগলো বসন্ত,—শুনুন স্যার, আমি মতিস্থির করে ফেলেছি। আর এই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে একটি চিঠি আমাকে সাহায্য করেছে। আপনাকে দেখানো উচিত হচ্ছে কিনা জানি না, তবু দেখাচ্ছি। এই নিন, পড়ুন।

চিঠিটা হাতে আসতেই চমকে উঠলেন সেজোবাবু। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন। তারপর যথারীতি ভাঁজ করে খামে পুরে ওর হাতে ফিরিয়ে দিলেন, ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, উত্তর দিয়েছো ?

—না।

আর কোনো কথা নেই। দুজনেই যে যার চিন্তার সমুদ্রে অবগাহনে নেমেছে যেন।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন সেজোবাবুই প্রথম। বললেন, একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করে। এ-সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কী ?

বসন্ত বললে, কী, সেটা কি আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে দাদা ?

যে মানুষটি কাজ ছাড়া জীবনে আর কিছু জানেন না, কখন যে সূর্য ওঠে আর কখন যে সূর্য অস্ত যায়, তার দিকে কোনোদিন তেমন করে তাকিয়ে দেখবার অবকাশও যাঁর আসে নি, তিনি আজ হঠাৎ জুহু বীচে বসে একা একা অলস সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন অস্তরাগের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্রের ক্ষীণ ঢেউগুলি জীবনের ভার বয়ে বয়ে ক্লান্ত মানুষগুলোর মতো তীরভূমির ওপর এসে পড়ছে।

কাজ হয়ে গেছে, আজই প্লেনে ফিরে যাবার কথা, কিন্তু সমস্ত উদ্যম যেন হঠাৎ থমকে থেমে গেছে। ট্রাঙ্ককল করবার কথা ছিল, নিদেনপক্ষে টেলিগ্রাম। কিন্তু কিছুই করা হলো না, যাওয়া পিছিয়ে দিয়ে বোম্বাইয়ের এদিক-ওদিক অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা দুপুর। তা-ও একা একা। অবশেষে এই জুহু বীচ।

সমস্ত সমস্যা আর চিন্তার জাল সরে গিয়ে একটি কথাই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। একটা চিন্তাই ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে সেজোবাবুর মস্তিষ্কে। সুষমা। একটা নতুন আলোয় যেন দেখতে পেলেন সুষমাকে। ও যে অমন করে গুছিয়ে কাউকে চিঠি লিখতে পারে, এ যেন তিনি কোনোদিন কল্পনাই করতে পারেন নি। তারপরে ঐ নিদারুণ কথাটা। একান্নবর্তিতা। আর তার সঙ্গে মিশে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'।

তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা ছোট, কিন্তু একদিন তো ঐ সুষমার মতোই বড়ো হবে। সেদিন তারাও যদি এমনি করে মাথা তুলে দাঁড়ায়! একান্নবর্তিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ? সত্যিই তো, তাদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য আছে।

ধীরে ধীরে অস্ত গেল সূর্য। উঠে দাঁড়ালেন। আবার ট্যাক্সি। আবার সেই ফিরোজ শাহ্ মেটা রোডের বাড়ি। বসন্তের ঘর। কালই বলেছিল বসন্ত, আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন দাদা।

সাংঘাতিক প্রস্তাবই দিয়েছে বসন্ত। বলেছে তার সঙ্গে পার্টনারশিপে যোগদান করতে। আমরা জাহাজী ব্যবসাই করবো না। আমরা যা করবো, তা ফিল্মের ব্যবসা। রাতারাতি অবস্থা ফেরাবার মতো যদি কোনো ব্যবসা থাকে তো, সে এই ফিল্মের ব্যবসা—ফিল্ম-প্রডাকৃশনের ব্যবসা। হুঁশিয়ার হয়ে যদি কাজ করা যায়, তো, এতে কোনো নিষ্ফলতা নেই। প্রোডাকশন দিয়ে শুরু করে ব্যবসার মোড় অন্য দিকেও ফেরানো যায়। ক্রমে ক্রমে 'একজিবিটার'ও হওয়া যায়। বসন্ত বলেছিল, দেখছেন না? মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু সিনেমার সামনে লম্বা কিউ? সেজোবাবু বলেছিলেন, কিন্তু দেখ বসন্ত, যে ব্যবসা জানি না—শুনি না! সে ব্যবসা—! বসন্ত বলেছিল, ব্যবসার মূল সূত্র সর্বত্রই এক। এর যে সমস্ত টেকনিক্যাল সাইড, সে আমাদের প্রথম দিকে বোঝবার দরকারও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এই যে জাহাজের কাজ আমরা করি, ওর সব টেকনিক্যালিটিজ আমরা কি বুঝি? তবু চলে তো যাচ্ছে।

যাইহোক, ঘুরে ফিরে সেজোবাবু যখন বসন্তর ঘরে এলেন, তখন রীতিমত সুপুরুষ এক ভদ্রলোক বসে গল্প করছিলেন বসন্তের সঙ্গে। ওঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো বসন্ত, দেখাদেখি সেই ভদ্রলোকও।

বসন্ত বললে, এসেছেন দাদা, আপনার জন্যই বসে আছি। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু—মিস্টার ভবেন্দ্র।

—নমস্কার।

বসন্ত বললে, বাঙালী নন, কিন্তু বাংলা শিখেছেন, বাংলা সাহিত্য পড়বেন বলে। ইনি বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি ওঁকে বিস্মিত করেছে।

বসলেন ওঁরা। চা ইত্যাদি এলো। ভবেন্দ্র একজন ফিল্মস্টার। এঁকে নিয়েই ছবি করার কথা ভাবছে বসন্ত। বসন্ত বললে, আমরা তিনজনে পার্টনার হয়ে অনায়াসে ছবির কাজে হাত দিতে পারি।

ভবেন্দ্র বললে, হিন্দী ছবি তো অনেক করছি, কিন্তু আমার বাংলা ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে আছে।

সেজোবাবু বললেন, তাহলে কাজকর্ম সব হবে আমাদের কলকাতায় গিয়ে কী বলো বসন্ত?

বসন্ত উত্তর দিলো, আমার তো সেটাই ইচ্ছে। হিন্দীতে অনেক বেশি ক্যাপিট্যাল দরকার হয়, বাংলা ছবি দিয়েই হাতেখড়ি হোক।

কিন্তু এসবও আসল কথা নয়। সে সব কথা শুরু হলো রাত্রে, খাওয়া দাওয়ার পরে। সেজোবাবু বললেন, কালই চলে যাবো ভাবছি।

বসন্ত বললে, থাকুন না আর দু-দিন! আমি আপনাকে শূটিং-টুটিং দেখিয়ে আনবো।

সেজোবাবু বললেন না ভাই, ওসব দেখায় আমি ইণ্টারেস্ট পাবো না। সিনেমাই দেখি না কোনোদিন। ওসব বাড়ির মেয়েদের জন্যে।

বসন্ত বললে, কিন্তু কালকে যাবেনই বা কী করে? প্লেনে সিট্ বুক করাই হয় নি যে!

সেজোবাবু বললেন, ভাবছি ট্রেনে যাবো।

—সে কী!

সেজোবাবু ম্লান হেসে বললেন,—কী জানো, কাজের পেছনে ছুটে কোনোদিন বাইরের দিকে তাকানো হয়নি। ভাবছি ট্রেনের ধারে জানলায় বসে যতদূর দেখা যায়, শুধু দেখতে দেখতে যাবো।

বসন্ত একটু অবাক হয়েই ওঁর দিকে তাকালো।

সেজোবাবু বললেন, আমি তোমার পার্টনার হতে পারবো কিনা কথা দিতে পারছি না কিন্তু।

—কেন, দাদা?

সেজোবাবু বললেন, একান্নবর্তিতার অভিশাপটা বুঝি। কিন্তু এতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সবার সুখে-দুঃখে এমন জড়িয়ে গেছি যে, চট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছি না, কোথায় যেন টান পড়ছে।

একটু থামলেন, তারপরে আবার বললেন,—তবে সুষমার ব্যথাটা বুঝি। আচ্ছা, বসন্ত?

—বলুন?

—যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

—করুন না?

—সুষমাকে—মানে—ইয়ে—সুষমাকে কি কিছু বলতে হবে

বসন্ত মুখ নিচু করলো। কী যেন ভাবলো একটুক্ষণ। তারপরে বললে,—আমার কলকাতায় যেতে মাসখানেক সময় লাগবে। তার মধ্যে তোড়জোড় সব করে ফেলবো। যাতে গিয়ে ছবির কাজ শুরু করতে পারি। একজন 'অল ইণ্ডিয়া ফেম'-এর 'নায়ক' পাচ্ছি, কতো অ্যাডভাণ্টেজ বলুন তো? আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ছবিটা শুরু করতে চাই। আপনি শুধু ওকে বলবেন, অনেক বই-টই তো পড়ে, একটা ভালো দেখে বই ঠিক করে রাখতে। ভবেন্দ্র সাহিত্যটাহিত্য পড়ে বা বোঝে, আমি ঠিক বুঝি না ওসব। সেজোবাবু বললেন, তবেই দেখ, যার ওপর ভিত্তি করে ছবি, সেই গল্পই যদি আমরা না বুঝি—

বাধা দিয়ে বসন্ত বললে,—সেইজন্যই তো এমন মানুষের দরকার, যে এসব বুঝবে। ও-রকম চিঠি যে লিখতে পারে, তার রুচির ওপর ভরসা করা যায়।

কলকাতায় ফিরে আসবার পর যখন অসাফল্যের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাড়িটাকে নিঃঝুম মৃত-মানুষের বাড়িতে পরিণত করেছে, তখন তার ছোট ঘরটিতে বসে সুরঝংকার না তুলে, তার পরিবর্তে ডায়রির পাতায় আবার অক্ষরের সারি বসিয়ে চলেছে সুষমা টেবিল-ল্যাম্পের ঘনিষ্ঠ আলোয় বসে।

লিখছিল: আমাকে গল্প বেছে দিতে হবে। ছোট্ট কথা। সেজদা এর বেশি একটি কথাও বলে নি। চিঠিটা ওঁকে সে দেখিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। আজ তিনদিন হলো সেজদা ফিরে এসেছে। ব্যবসার লোকসানের খবরে বাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেছে, কেউ হাসছে না, বসে বসে গল্প করছে না, সাজগোজ করে বাইরেও বেরুচ্ছে না। আমি কিন্তু বিমর্ষ হয়ে থাকতে পারি নি। অদ্ভুত খুশিতে সারা মন যেন অনুক্ষণ ভরে ছিল।

এবং যা কোনোদিন সে করেনি, তাই করে বসেছিল। চুপিচুপি একা গিয়ে ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে এসেছিল। একদিন নয়, পর পর দুদিন। দুটিই বাংলা বই। মন্দ লাগেনি, হাসিঠাট্টা, গান আর মানুষের সুখদুঃখের একটু কথা। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় লাইব্রেরী থেকে আনানো উপন্যাস নিয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ?

কলমটা থামিয়ে চুপচাপ ভাবছিল। একটুক্ষণ পরে আবার শুরু করলো সুষমা: কিন্তু একটা যে ভয় হচ্ছে! ভয় হচ্ছে, আমি নিজের মনের সাঁড়াটা ঠিক শুনেছি তো? কোনো উদ্বেগের তাড়া আমাকে ভীত কোনো জীবের মতো ওর পায়ের কাছে ফেলে দিচ্ছে না তো? বারবার—বারবার এই চিন্তাটা

আমাকে পেয়ে বসেছে। আর তাছাড়া সিনেমার কাজ কি ভালো? শুনেছি পুরুষের সামনে এসে পড়ে নানান প্রলোভন। না—না—কী সব ছাই-পাঁশ ভাবছি, যে মানুষটা সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা দাঁড়াবার ভরসা রাখে, তার থেকে আবার ভয়টা কিসের?

ডায়রি লেখার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে তবু অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি সুষমার। একটু তন্দ্রা এসেছে, আর কী এক দুর্বোধ্য আতঙ্কে চমকে চমকে উঠেছে। কে একটা লোক যেন তাকে জোর করে নিজের বুকের ওপর চেপে রাখতে চায়। লোকটা যে কে তা বোঝা যায় না, অনুভব করা যায় দুটো অদৃশ্য হাত। ভয় পেয়ে বেড সুইচটা টিপে বার কয়েক আলো জাললো সুষমা, ঘরে খিল আঁটা, হাওয়া লেগে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটা শুধু দুলছে, আর সর্ সর্ শব্দ করছে মাঝে মাঝে।

এখানকার মানুষগুলো চট্ করে কারও সঙ্গে আলাপ করতে চায় না। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বিদেশী বলে বুঝতে পারলে চোখ তুলে তাকায় বটে, কিন্তু যেচে এসে আলাপ করে না। কয়েকটা দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে এই ধারণাই হয়েছিল শিশিরের।

অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ম্যাবিয়ার। সাজসজ্জায় সৌখীন ছিল বরাবর। মুখে সামান্য প্রসাধনটুকুও ছোঁয়াতে চায় না। গম্ভীর হয়ে গেছে আগের থেকে। বাইরে কাজ না থাকলে বেরোতে চায় না, ঘর সংসারের কাজ নিয়ে আছে, এমন কি রান্নাবান্নাও করে মাঝে মাঝে।

দুপুরে শিশির যখন দিদিমার কাছে বসে 'মনসার ভাসান' পড়ে, তখন কাছে এসে চুপচাপ বসে থাকে বটে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, ওতে তার মন নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় শিশির ওকে জিজ্ঞাসা করলো, মিয়ানীর টেলিগ্রামের উত্তর কিন্তু দেওয়া হলো না। কী হবে? ফিরবে কি জাহাজে? ম্যারিয়া বললে, দিদিমার হার্টের অবস্থা ভালো নয়। রোজ ডাক্তার আসছে, ওষুধ চলছে, এ অবস্থায় ওকে ফেলে যাই কী করে?

—কিন্তু আমি কী করবো?

ম্যারিয়া ওর চোখের দিকে তাকালো। বললে, তোমার জাহাজে যাওয়া না-যাওয়া সমান। ওদের কিছুই আসে যায় না। তোমার কাজটা মিয়ানী

চালিয়ে নেবে। আমার ধারণা,—ও টেলিগ্রাম আমার জন্য। আমার এখন কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। দিদিমা শেষ নিঃশ্বাস ফেলুক, তখন ভাববো, ডাঙা, না জল? মাটি, না সমুদ্র?

যেদিন এইসব কথা হলো ম্যারিয়ার সঙ্গে, তার পরদিনই ওর হাতে পৌঁছলো মিয়ানীর চিঠি। ইংরেজিতে লেখা, তবে বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে ধরে ধরে লেখা, যাতে ওর পড়তে না কষ্ট হয়। তারিখ দেখে বোঝা গেল, টেলিগ্রামের আগে লেখা, ডাকে আসতে দেরি হয়েছে। মিয়ানী লিখেছে, ক্যাপিতানির রাগ বোধ হয় পড়েছে। অবাক হবো না যদি সে নিজেই চলে যায় ইসমাইলিয়া হয়ে ম্যারিয়ার কাছে। এর মধ্যে তার ভালোবাসা কতখানি কাজ করছে জানি না, তবে একটা কমপ্লেক্স কাজ করছে। যদিও জাহাজের তুচ্ছ লস্করটিও জানে ম্যারিয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা আসলে কী, তবু ওর ধারণা অন্যরকম। বারে বারে কথাবার্তায় 'মাই ওয়াইফ—'মাই ওয়াইফ' বলে সবার কাছে উল্লেখ করছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমাদের জাহাজ ইয়োরোপ ঘুরে গ্রীসের একটি বন্দরে এসে তার যাত্রা শেষ করবে। অন্তত সেদিন পর্যন্ত তার 'ওয়াইফ' তার সঙ্গে থাকলে তার মান রক্ষা হয়। তারপরে সবার অলক্ষ্যে, যদি ম্যারিয়া আর থাকতে না চায়, তাহলে তাকে ক্যাপিতানি ছুটি দেবে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা আর অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি এটা টের পেয়েছি। কিন্তু যাক ওদের কথা। আমি তোমার কথাই ক্রমাগত ভাবছি, আমি অভিজ্ঞ মানুষ, chequered with experience ('chequered শব্দটার মানে কী? শিশির বুঝতে পারলো না। ম্যারিয়াকে চিঠিটা দেখালো সে হেসে বললে, পড়ে কী করবো? কী জানতে চাও তাই বলো। শিশির প্রশ্ন করলো, chequered মানে কী? ম্যারিয়া বললো, আমিও জানি না। দাঁড়াও ডিক্সনারি দেখছি। কিন্তু এত বই, খুঁজে পেতে ডিক্সনারি পাওয়া গেল না। যাকগে—)

মিয়ানীর চিঠির বাকি অংশ: তুমি নিতান্ত কাঁচা, সেইজন্য তোমাকে অত ভালো লাগতো। তুমি চলে যাওয়ায় আমারও মন টিকছে না। জাহাজ পোর্ট সৈয়দ থেকে জিব্রাল্টার যাবে। জাহাজ যেখান দিয়ে যাবে, তার কুড়ি মাইলের মধ্যে আমার দেশ, সাইপ্রাস। কিন্তু এত কাছে থেকেও দেশে যাওয়া হবে না। তোমাকে যদি আমাদের দেশে নিয়ে যেতে পারতাম! যাই হোক, পোর্ট সৈয়দে নিশ্চয়ই জাহাজে আসবে। তোমার চিঠি আসবে।

মনে আছে? (এই চিঠিই তো তার ভয়ের কারণ। যদি সে কিছু লিখে বসে? যদি লিখে বসে এমন কোনো কথা, যাতে ওর মন তৎক্ষণাৎ ঘরের দিকে ছুটে যেতে চাইবে। হয়ত আরও প্রশ্রয় পেয়ে ভাবতে বসবে এমন সব কথা, যা তার মনের কোণেও জেগে ওঠা উচিত নয়। মিয়ানী বলে, তোমার প্রেম, তোমার স্বর্গীয় স্মৃতির সুষমা! মনটা উৎফুল্ল হলেও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। কিন্তু না আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আমি তোমাদের সর্বনাশ করতে চাই না। বোম্বের বসন্তবাবুর সঙ্গে তোমার জীবনসূত্র গ্রথিত হয়ে যাক। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন। আমি তার কাছে—কে? একদিক থেকে ভাবতে গেলে, সৌভাগ্য তাকে অসম্ভব বস্তু এনে দিয়েছে। তার জাহাজে চড়ে বসাটাই ত এক অসম্ভব বস্তু। কিন্তু সৌভাগ্যও যে চরম ভার হয়ে উঠতে পারে, শিশির তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ।)

মিয়ানীর চিঠির শেষ অংশ: আমি মিশরে না থেকেও মিশরের ইতিহাস জানি। আলেকজান্দ্রিয়া শহর বিখ্যাত 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট'-এর কীর্তি। তাঁর মৃত্যুর পর ওখানকার রাজা হন Ptolemy (এ কথাটার উচ্চারণ কী ম্যারিয়া? ম্যারিয়া কাছে এসে ওটা দেখে নিয়ে হেসে বললে—টলেমি, দেখি?)

বাকিটা ম্যারিয়াই ওকে পড়ে শোনালো: টলেমিরা মিশরী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। রোমেরও আগে আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলের মিশরীরা খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করে। সপ্তম শতাব্দীতে আবার পট-পরিবর্তন, আরবরা মিশর জয় করে। মিশর হয়ে যায় খলিফার রাজ্যভুক্ত। আরবী ও আরব সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার, প্রাচীন মিশরী ভাষা অন্তর্হিত। (এসব লেখবার মানে কী? ক্লিওপেট্রার কথা কোথায়? কতটুকু জানে মিশরকে, লোকটা?)

শিশির বললে, কী হলো, পড়ো?

ম্যারিয়া বললে, চিঠির নামে মিশরী সভ্যতার ওপর essay লিখতে বসেছে কেন? মামেলুকদের রাজত্ব থেকে শুরু করে ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ জাহাজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর গোলাবর্ষণ পর্যন্ত লিখেছে। আরও আধুনিক কাল পর্যন্ত লিখতে পারতো। জালালুদ্দিন আফঘানির সংস্কার থেকে জগলুল পাশার জাতীয়তাবাদ, তাই-ই বা বাদ দিলো কেন? নাও, তোমার চিঠি।

রাগ করে পাশ থেকে উঠেই গেল ম্যারিয়া।

শিশির পড়তে লাগলো। ইতিহাস-বর্ণনাই বটে। শেষে লিখেছে, 'সাবধানে থেকো। ছুটি শেষ হলেই জাহাজে ফিরে আসবে।'

ম্যারিয়া এলো একটু পরেই। পাশে এসে আবার বসলো। বললে, খুব যে ভাবনায় পড়লে ?

—পড়ো না চিঠিটা ?

—পড়লাম তো।

—কতটুকু আর পড়েছো ! প্রথম থেকে সবটা পড়ো।

—থাক। পরে দেখা যাবে।

ম্যারিয়া নিস্পৃহ ভঙ্গিতে মাথাটা সোফার ওপরে এলিয়ে দিলো। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে।

ফরিদা এসে ঘরে ঢুকলো। ম্যারিয়ার কাছে এসে ওদের ভাষায় কী যেন বললো। মনে হলো সে কোথাও যেতে চায়, অনুমতি চাইছে। ম্যারিয়া অবাক হয়ে তাকে কী সব বললো। ফরিদা তার উত্তর দিলো। অবশেষে যেন বিরক্ত হয়েই ম্যারিয়া তাকে অনুমতি দিলো।

ফরিদা সামনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যেতেই ম্যারিয়া ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, দিদিমা ওকে কোথায় পাঠালো জানো ? সেই শেখের বাড়িতে। সেই ধরে আনা ইণ্ডিয়ান মেয়েটার কাছে।

একটু চকিত হলো শিশির। বললে, তারপর ?

—দিদিমা অসুস্থ, তাই শেখ যদি তাকে একবার পাঠায়। কিন্তু এ-ও কি কখনো সম্ভব ? উল্টে কোনো কিছু সন্দেহ করে মেয়েটার ওপরে অত্যাচার না করে !

—তুমি যেতে দিলে কেন ফরিদাকে ?

—ইচ্ছে ছিল না। দিদিমার ইচ্ছে, বুঝলে না ?

শিশির বললে, ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমিও ক্রমাগত ভাবছি।

ম্যারিয়া উঠে দাঁড়ালো। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। যেন বিশেষ একটা সমস্যা ওকে পীড়া দিচ্ছে, আর ও তার সমাধান করতে পারছে না। একটা অদ্ভুত অস্থিরতা বুঝি ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শিশির একটু অবাক হয়েই ওকে লক্ষ করতে লাগলো। মেয়েটির কথা শোনবার পর থেকে ম্যারিয়াও কেমন যেন বদলে গেছে। সেই অভ্যস্ত প্রসাধন নেই, নেই সেই লীলা চাপল্য।

পায়চারি করতে করতে ম্যারিয়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, এক এক সময় কী মনে হয়েছে জানো ? যা টাকা পয়সা লাগে সব দিয়ে প্লেনে হোক অথবা যেমন করেই হোক, মেয়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দেই।

—তাকে উদ্ধার করবে কী করে ?

ম্যারিয়া বললে, চেষ্টা করতে হবে।

ওর কাছে এসে বসলো সে, বললো, ধরো তুমি যদি দেশে যাও, তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতাম।

শিশির বললে, ও তো কলকাতাব মেয়ে নয়। ও যেখানকার মেয়ে. সেটা এখন আর ইণ্ডিয়া নয়।

ম্যারিয়া ওর মুখের দিকে কয়েকমূহূর্ত তাকিয়ে রইলো। বললে, বুঝেছি। দেশ-ভাগাভাগিব খবরও কি রাখি না মনে করো ? কিন্তু, মেয়েটা 'বাংগালী' তো ?

—তা অবশ্য।

মারিয়া তারপর বললে, না, তা হবার নয়। কোনো লাভ নেই। কটা মেয়েকে আমি বাঁচাবো ? আর তাতে লাভই বা কী ? এখানে শেখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, ওখানে শেখের থেকেও খারাপ লোকের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে। একমাত্র সেন্টিমেণ্ট—দেশ। আমার দিদিমার মতো। মেয়েটার মন ভিতরে ভিতরে গুমরে মরবে দেশের জন্য, দিদিমার যা হতো। আমি সেকথাও ভেবে দেখেছি! আচ্ছা বলতে পারো, 'দেশ'-এর থেকে বড়ো কিছু মানুষের জীবনে আছে কিনা ?

—বুঝতে পাবছি না তোমার কথা!

ম্যারিয়া বললে, দিদিমার দেশ—ইণ্ডিয়া। সেজন্য ইণ্ডিয়ার ওপর আমার একটা ভীষণ টান ছিল। আমার দেশ—মিশর। মিশরের ওপর টান থাকা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আর আমার যিনি জন্মদাতা, তাঁর দেশ—গ্রীস। গ্রীসের ওপরও আমার টান অসাধারণ। খবরের কাগজে এই তিন দেশের খবরই আমি সমান আগ্রহে পড়ি। গ্রীকদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসি. মিশরীদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসি, আবার ভারতীয়দের সঙ্গেও মিশতে ভালোবাসি। একটা মানুষের যদি একই সঙ্গে তিনটি দেশই সমান ভালো লাগতে পারে, তাহলে সারা পৃথিবীর সব দেশের মানুষকেই বা ভালো লাগবে না কেন ? আমি ইংরেজদের সঙ্গেও মিশেছি, ফরাসীদের সঙ্গেও মিশেছি, এই আলেকজান্দ্রিয়াতেই। এখানে তুমি সব জাতই পাবে। সবাই আমাকে কানে কানে সমান সুরে বলেছে—I love you! আমার দেহেমনে প্রায় সারাটা পৃথিবীই স্বাক্ষর রেখে গেছে। আমি নিজেকে তাই Internationalist

ভাববো না কেন? Nation এর চিন্তা থেকে ওপরে উঠবো না কেন? তোমাদের দর্শনে বিশ্বপ্রেমের কথা আছে, আমি ঠিক সেই দার্শনিক মানব প্রেমের কথা বলছি না, আমি বলছি একেবারে নিছক বস্তুতান্ত্রিকতার দৃষ্টিতে। জানিনা কতটা আমার মনের ভাব তোমাকে বোঝাতে পারছি, আমার দিদিমার মতো আজও যে সব মেয়ে দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে, এই একটি চিন্তা তাদের বাঁচাতে পারে নিজেদের জীবনের গ্লানি থেকে। বলো সত্যি কি না?

বিস্ফারিত চোখ মেলে শিশির ওর কথাগুলো শুনছিল। বললে, ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

ম্যারিয়া বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওর একটা হাত চেপে ধরে বলতে লাগলো, আমি চিন্তা ভাবনার কোনো ধার ধারতাম না। কিন্তু এই মেয়েটার কথা শোনবার পর থেকে আমি যেন নতুন আলোয় নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, বিচার করতে পাচ্ছি। দিদিমার ফেলে আসা জীবনটাকেও যেন আজ অন্য চোখে অনুধাবন করতে পারছি।

ঠিক এই সময় ফরিদা এসে ঘরে ঢুকলো, ম্যারিয়া ওদের ভাষায় ওকে কী সব প্রশ্ন করলো। ফরিদা উত্তর দিলো। এইভাবে কয়েকটি মিনিট তাদের বাদানুবাদ চলতে লাগলো। শেষে ফরিদা ফিরে গেল ভিতরের দিকে দিদিমার কাছে।

ম্যারিয়া শিশিরকে বললে, বুঝতে পারলে? ফরিদা বললে, মেয়েটির দেখা সে পেয়েছিল। এমন কি দিদিমার অসুখ শুনে শেখ ওকে পাঠাচ্ছিল বাড়ির বুড়ো চাকরটার সঙ্গে। মেয়েটাই এলো না।

- কেন।

ম্যারিয়া বললে, ফরিদার বাচালতা। মেয়েটিকে চুপি চুপি বলে ফেলেছে তোমার কথা। বলেছে, তোমার দেশের একজন লোক এসেছে আমাদের বাড়িতে। ব্যস, একথা শুনে সেই যে মেয়েটা বেঁকে দাঁড়ালো, আর ওকে নড়ায় কার সাধ্য! এখন বুঝলে ব্যাপারটা? ঠিক আমার দিদিমার মনোভাব যা ছিল, তাই। অভিমান। তীব্র অভিমান। আমি বলবো, ঠিক করেছে। দেশ আবার কী? মানুষই সব। ভাষা, ধর্ম, দেশ—মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলতে দিচ্ছে না।

—সে কী!

ম্যারিয়া বললে, না, 'ওয়ান ওয়ার্লড থিয়োরি' বলতে যা বোঝায় আমি তা বলছি না। সারা পৃথিবী জুড়ে এক ভাষা হবে, এক ধর্ম হবে, এক গভর্ণমেন্ট হবে, এটা অসম্ভব। আর হলেও it will give rise to facism.

—ফ্যাসিজ্‌ম কী?

ম্যারিয়া বলে উঠলো, ও জিউস! তোমাকে এসব বোঝানো মুশকিল তুমি কিচ্ছু জানো না। মোট কথা, এটুকু শুনে রাখো. যার যার ভাষা, ধর্ম, দেশের গণ্ডি, সব থাক। মানুষের মন এসব বোধের থেকে আরও বড়ো উপলব্ধিতে এসে পৌঁছাক, যে উপলব্ধি ছাড়িয়ে ভাষা, ধর্ম আর দেশ কখনো বড়ো হয়ে দেখা দেবে না।

—কিন্তু সে উপলব্ধি আসবে কী করে?

—সেই পথটাই তো খোঁজা দরকার, ম্যারিয়া বললে, এ সবের প্রচণ্ড বাধ কোথায় জানো? ক্যাপিটালিজম। ক্যাপিটালিস্ট আর তাদের গোষ্ঠী। জমানো টাকার পাহাড়। আর এই টাকার পাহাড়ই ক্ষমতার পাহাড় কাছে টেনে আনে। এদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার একমাত্র পথ—যাকে বলে 'সমাজতন্ত্রবাদ'। বাঁচবার এই একটি মাত্র পথ। এছাড়া আর কোনো পথ নজরে পড়ে না।

ঠিক এই সময় বাইরে একটা লোক এসে দাঁড়ালো। বোধ হয় দরজার প্রান্তে টোকাও দিলো।

—ডাক্তার এলো নাকি?

ম্যারিয়া এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পর্দা সরিয়ে বাইরে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো, হাতে একটি টেলিগ্রাম।

—এই নাও। তোমার। দেখ, জাহাজের কী খবর।

শিশির তাড়াতাড়ি খুললো খামটা। মিয়ানীর টেলিগ্রাম। Ship reached Port Said. No Letter. (জাহাজ পোর্ট সৈয়দে পৌঁছেছে। তোমার চিঠি নেই)।

ম্যারিয়ার হাতে দিলো। ম্যারিয়া বললে, No Letter মানে কী?

শিশিরের চোখদুটো নিজের অজ্ঞাতেই ছলছল করে এসেছিল। বললে, বাড়ি থেকে আমার চিঠি আসার কথা ছিল।

—কার চিঠি?

—বাড়ির।

—বাড়ির কার? বাড়িতে তোমার তো কেউ নেই বলেছিলে।

শিশির বললে,—না, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

—তবে? কে তোমাকে চিঠি লিখবে?

—যিনি বা যাঁরা পাঠিয়েছিলেন জাহাজে।

—তুমি তাঁদের চিঠি দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—উত্তর আশা করেছিলে। এই তো?

শিশিরের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। মুখখানা ফেরালো সে।

—ও কী!

ম্যারিয়া এগিয়ে এসে জোর করে ওর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো। শিশির ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরে চোখ মুছে নিলো।

ম্যারিয়া অবাক হয়ে বললে, কে এমন মানুষটি বলো তো, যার চিঠি না পাওয়ায় তুমি এত কাতর হয়ে পড়লে?

শিশির অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। ওর দিকে ফিরে সোফাটার শিয়রে এলো। মৃদুগলায় বললে, না, কেউ নয়।

ম্যারিয়া খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে বললে, কী ব্যাপার? কোনো 'লেডি-লাভ' আছে নাকি?

মুখ তুললো শিশির, গলায় একটু জোর এনে চট করে বলে ফেললো, কিন্তু তুমি তো তাতে বিশ্বাস করো না।

ম্যারিয়া উত্তর দিলো, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও দুনিয়ায় পাগল তো অনেক রকম থাকে। তাদের কাছে 'প্রেম' একটা জীবন-মরণ সমস্যা। তোমারও সেরকম কোনো সমস্যা আছে নাকি?

শিশির এসে সোফাটার এককোণে বসলো। ম্যারিয়া সরে এলো একেবারে ওর গা ঘেঁষে ওর কাঁধের ওপর নিজের হাতখানা উঠিয়ে দিয়ে। বললো, বলো না, সত্যি কি না?

কিন্তু কী বলবে শিশির? সে মুখ আরও সরিয়ে নিয়ে চুপ করে রইলো।

কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে ম্যারিয়া বললে, বুঝেছি।

—কী বুঝেছো?

ওর গলার স্বরে বুঝি একটু উত্তেজনাই জেগে থাকবে। ম্যারিয়া সেটা লক্ষ করলো। বললো, তাই এতো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব!

—তার মানে?

ম্যারিয়া ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি টেনে এনে বললো, জ্বলন্ত আগুনের মতো আমি আশেপাশে ঘুরছি, অন্য পুরুষ হলে—

চট করে উঠে দাঁড়ালো শিশির, বললো, বাজে কথা বোলো না। তুমি ত নিজেই বলেছো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না।

চোখ দুটো যেন মুহূর্তে ধক্ করে জ্বলে উঠলো ম্যারিয়ার। বললে,—আমি কাকে ভালোবাসি? অ্যান্টিলোপ জাহাজের ক্যাপিতানিকে?

শিশির বললো, না ম্যারিয়া, আমি তোমার কথা তুলতে চাই নি। আমার বলার ধরণটা হয়ত ভুল হয়ে গেছে। আমিই হয়ত তোমাকে ভালোবাসিনি, তাই—

এবার স্পষ্টই হেসে উঠলো ম্যারিয়া। ওকে বাধা দিয়ে বললে, তাই তোমার প্রিয়ার কথাগুলো সব সময় জপ করে চলেছো! বেশ তো, যাও না চলে তোমার প্রিয়ার কাছে, কালকুত্তায়? এই আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে একটি জাহাজ এসে লেগেছে আমি কাগজে দেখেছি, যেটা দু-চার দিনের মধ্যেই ছেড়ে ইণ্ডিয়ার বম্বেতে গিয়ে লাগবে। আর যদি খুব তাড়া থাকে, ট্রেনে কায়রো চলে যাও, সেখান থেকে প্লেনে একেবারে কালকুত্তা!

—অত টাকা কোথায় আমার?

—না হয় সে টাকা তোমাকে আমিই দেবো।

শিশির এক মুহূর্ত থেমে থেকে কী যেন ভাবলো, তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, না, তা হয় না। আমি ভাবছি আমাদের জাহাজেই ফিরে যাবো।

ম্যারিয়া বললে, তাহলে তো কাল ভোরেই রওনা দিতে হয়। পোর্ট সৈয়দ ট্রেনে করেই যেতে পারবে ইসমাইলিয়া হয়ে।

শিশির ওর কাছে এগিয়ে গেল, বললে, তুমি ছুটি দিচ্ছো?

মুহূর্তে সমস্ত উজ্জ্বলতা যেন বিদায় নিলো ম্যারিয়ার মুখ থেকে। ওর চোখ থেকে চোখ ফেরালো সে। নিচের ঠোঁটটা আর চিবুকের কাছটায় দেখতে দেখতে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠলো। আবার ওর চোখের দিকে তাকালো, বললে,—না।

—কেন?

ম্যারিয়া বললে, জাহাজে তোমার যাওয়া হবে না।

—তাহলে?

ম্যারিয়া বললে, খুব কি কষ্ট হচ্ছে এখানে? পৃথিবীতে আমার সব থেকে প্রিয় মানুষটি হচ্ছে এই আমার দিদিমা। আমি জানি দিদিমা আর বাঁচবে না। ওর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্তটি পর্যন্ত থাকো। দিদিমা তোমাকে পেয়ে যেন ওর সেই ফেলে-আসা স্বপ্নের দেশকেই ফিরে পেয়েছে।

এর ওপর আর কোনো কথা চলে না। শিশির চুপ করে রইলো।

ম্যারিয়া বলতে লাগলো, আমি আজ দুপুরে ব্যাঙ্ক ফেরৎ পুরোনো শহরের একটি বারে গিয়ে চুপচাপ খানিকক্ষণ বসেছিলাম। একদিকে সমুদ্রের খাড়ি ভিতরের দিকে কিছুটা ঢুকে এসে হ্রদের মতো রূপ নিয়েছে, অন্যদিকে ভাঙা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ মূর্তিমান ইতিহাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে, ওখানেই ছিল টলেমির মিউজিয়াম আর সেই বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরি। বসে থাকতে থাকতে কী মনে হচ্ছিল জানো? ওখানে বসেই তো ইউক্লিড তাঁর জ্যামিতি লিখেছিলেন, হিপার্বনিকস আকাশের সব তারাগুলির তালিকা তৈরি করেছিলেন। কবি আর সাহিত্যিকরাই হতেন এখানকার লাইব্রেরিয়ান। জানো? খৃষ্টপূর্ব ৪৮ সালে যখন এই লাইব্রেরিটা ভস্মীভূত হয় তখন এর গ্রন্থসংখ্যা ছিল নাকি পাঁচ লক্ষ। সব দেশের সব গ্রন্থ জড়ো হয়েছিল নাকি এখানে। কিন্তু কোথায় গেল সে-সবের গৌরব? এটা যে ইউক্লিড-হিপার্বনিকসদের সাধনভূমি, একথা কে মনে রাখে?

মনপ্রাণ দিয়ে কথাগুলি শুনছিল শিশির, বলে উঠলো, আচ্ছা, ঐ লাইব্রেরিটা যদি আজও থাকতো?

ম্যারিয়া ওর কাছে সরে এলো, বললে,—না, থাকে না। কোনো জিনিসই চিরকাল থাকে না। ও স্বপ্ন দেখে কোনো লাভ নেই। দিদিমাকে ভালোবাসি বলে দিদিমার কাছে তোমাকে এনে দিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কী-ই বা দরকার ছিল? কষ্ট দেওয়া হলো তো তোমাকে?

শিশির ওর হাতটা ধরে কী যেন বলতে গেল, ম্যারিয়া তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালো, বললে, ঐ দেখ ডাক্তার এসেছেন। Come in, Doctor.

বেঁটে খাটো গোলগাল দেখতে ডাক্তারটিকে। ঘরে ঢুকে বললেন, ইয়ানে শীচা আংলাইস? (ইংরেজি বলছো যে!)

শিশিরকে দেখিয়ে ম্যারিয়া বললে, He speaks 'Anglais.'

ডাক্তার হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে 'নভ' করলেন, তারপর ম্যারিয়ার সঙ্গে ওঁদের স্থানীয় 'কপ্‌ট্-ক্রিশ্চান-গ্রীসীয়' ভাষায় কথা বলতে বলতে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ডাক্তার এসেছেন দিদিমাকে দেখতে, শিশিরেরও যাওয়া উচিত। কয়েক মুহূর্ত পরে শিশিরও গেল। বিছানার ওপরে স্থাণুর মতো শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর শিয়রের কাছে সেই পুঁথিটি রাখা আছে। ডাক্তার পরীক্ষা-টরিক্ষা করে ইনজেক্‌শন দিলেন। তারপরে একটু নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতেই চলে গেলেন মনে হলো। ফরিদা গেল তাঁর সঙ্গে ওষুধ আনতে।

– কী বললেন ?

ম্যারিয়া বললে, একটু ভালো আছে।

বৃদ্ধা মুখ ঘুরিয়ে বোধ হয় শিশিরকেই খুঁজছিলেন। ম্যারিয়া ওকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলো। শিশির ওঁর দিকে ঝুঁকে বাংলায় বললো, কিছু বলছেন ?

বাংলাতেই তিনি উত্তর দিলেন অতি কষ্টে, থেমে থেমে,—পোঁথি পড়বে তুমার কস্‌ট হোবে।

—না-না-আমার কোনো কষ্ট হবে না,—বলে, শিশির পুঁথিটা খুলে, টুলের ওপর বসে পড়া শুরু করলো একটা জায়গা বেছে নিয়ে। কিন্তু সামান্য একটু পড়তে না পড়তেই লক্ষ করলো, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। ঘুমটা ধীরে ধীরে ভেঙে আসছে শিশিরের। কোথায় যেন মুরগি ডাকছিল। চোখ মেলে চাইতেই তার মনে হলো, ঘরের মধ্যে সোফার ওপর আর একজন কে যেন চুপচাপ বসে আছে।

ঘুম-ঘুম চোখে একটু চমকেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো শিশির—কে ?

যে বসেছিল, সে ওর দিকে মুখ ফেরালো।

—ম্যারিয়া !

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো শিশির। সাদা গাউনের ওপর কালো স্কার্ফখানা গলায় দুটি পাক দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। পায়ে ওর জুতো, আর এক পাশে ওর সেই পরিচিত সুটকেসটা।

—কী ব্যাপার ?

ম্যারিয়া ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বললে,—তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি ভোর হয়ে আসছে। কাছে এসো।

ওর পাশে গিয়ে বসলো শিশির।

ম্যারিয়া বললে, রাত তখন প্রায় দুটো। দিদিমা মারা গেছেন।

—মানে! —চমকে উঠে দাঁড়ালো শিশির।

ম্যারিয়া শান্ত গলায় বললে,—বোসো।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শিশির বললে,—আমায় ডাকো নি কেন?

—প্রয়োজন হয়নি,—ম্যারিয়া বললে,—ফরিদা আমাকে ডাকলো। কাছে গেলাম। সেই শেষ দেখা। চোখ বুজলেন। কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো শারীরিক কষ্টও নেই, যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। হাঁক ডাক করে এ শান্তি ভঙ্গ করতে আমার ইচ্ছা হলো না।

—আমি দেখে আসি

ম্যারিয়া বললে,-থাক। দেখবার অনেক সময় পাবে। আর একটু ফর্সা হলে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবো। তাঁর সার্টিফিকেট চাই। কফিনের ব্যবস্থাও করে যাবো। কিন্তু বাকি সব করতে হবে তোমাকে।

—মানে!

ম্যারিয়া বললে, বাড়ি ভাড়ার দরুণ চেক্ কেটে রেখেছি আমার ঘরের টেবিলে। আসবাবপত্র সব ফরিদা নিক। আর তুমি? টাকাকড়ি রেখে যাচ্ছি, 'বেরিয়েলে'-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে তুমি বন্দরের দিকে চলে যাবে। সেখানে বম্বেগামী জাহাজটায় উঠবে। কায়রো হয়ে প্লেনে যাওয়া অনেক ঝঞ্ঝাট। প্লেনে বুকিং পাওয়াও শক্ত। তাই ভেবে দেখলাম, জাহাজে যাওয়াই তোমার ভালো। হয়ত কিছু দেরি হবে। তা হোক। এই নাও একটা খাম। এতে একটি চিঠি আছে।

—কার?

—বন্দরের শিপিং অফিসের এক বড়ো অফিসারের,—ম্যারিয়া বললে,—আমার খুব পরিচিত। ইংরেজি জানেন। এ চিঠি পেয়ে তোমার সব কাজ তিনি করে দেবেন, তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

শিশির বললে, তাহলে আমি দেশেই ফিরে যাবো?

ম্যারিয়া বললে, কী করবে এখানে থেকে? কার কাছেই বা থাকবে?

—তুমি?

ম্যারিয়া অল্প একটু হাসলো। সে হাসি বুঝি কান্নারই নামান্তর। বললে, আমি প্লেন ধরতে যাচ্ছি। ডাক্তার এলেই আমি রওনা হবো।

—কিন্তু যাবে কোথায় তুমি ?

ম্যারিয়া বললে,—পোর্ট সৈয়দ। অ্যান্টিলোপ জাহাজ।

—সে কী!

ম্যারিয়া বললে,—মাটির শেষ আশ্রয়টুকুও গেল। এবার ভেসে ভেসে বেড়াই। সমুদ্রে-সমুদ্রে। যতদিন পারি।

—কিন্তু এই কে একটা জীবন ?

—নিশ্চয়ই—ম্যারিয়া বললে,—আমার মতো মনোভাব যে মেয়ের, তার এ জীবনের থেকে সুন্দর আর কী হতে পারে ? আমার দেহটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে যতদিন রাখতে পারবো, ততদিন কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু যেই দেখবো বয়সের ছাপ পড়ছে, কুৎসিৎ হয়ে যাচ্ছি, তখনই জোরালো ঘুমের ওষুধ আমাকে সব জ্বালাযন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

শিশির বললে,—অন্য জীবনও তো হতে পারতো ?

ম্যারিয়া আবার একটু হাসলো, ম্লান সে হাসি। বললে,—না। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও নিয়েছি। সন্তানও মেয়েদের একটা বন্ধন। আমি সন্তানদের দাসত্বও করতে চাই না। সে সব চিত্রও আমার দেখা আছে। আমার ঘেন্না করে।

বলতে বলতে ওর হাতখানা চেপে ধরলো ম্যারিয়া, বললে, চারদিক ফরসা হয়ে গেল। এবার ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই। কমরেড, আমাকে বিদায় দাও।

বাড়িটার সামনে কতগুলি ইঁটের টুকরো, ঝুরো বালি, ভাঙা কংক্রিট্ এসব একেবারে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে ফুটপাথের ওপরে। বিকেলের স্নিগ্ধ আলো যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে, একটি ইঁটের ওপর বসে এক মনে বিড়ি টানছিল মুন্সিজী, হঠাৎ রাস্তার মোড়ে কী যেন দেখে একেবারে চমকে উঠলো। প্রথমেই ছুঁড়ে ফেলে দিলো হাতের বিড়ি। তারপরে অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠলো, শেষ পর্যন্ত ওখান থেকে নেমে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলো মোড়ের দিকে। সবিস্ময়ে বলে উঠলো,—আই বাপ! শিশিরবাবু! লেকিন ওখানে ট্যাক্সি থেকে নামলো কেন, বাড়ির দোরগোড়ায় নামতে পারতো! ঐ যে সেই ট্র্যাঙ্কটা নামাচ্ছে ট্যাক্সির পিছন থেকে। ঈস! পরণে স্যুট, চেহারা দিব্যি

গোলগাল, গায়ের রঙ ঝকঝক করছে,—এই শিশিরবাবুকে মুন্সিজী ছাড়া চট্ করে চিনবে কে? মেজোবাবু? চোখে চশমা নিতে হবে। রেশনের দোকান করার ফিকিরে ঘুরলেই কি সব হয়ে গেল? তা সেখানেও তো দরকার এই মুন্সিজীর। মেজোবাবু বললে, কারবার তো গুটোলো মুন্সিজী, সম্পত্তিরও বখরা হচ্ছে। একটা কিছু তো করা দরকার? রেশন সপের পারমিট যদি বার করতে পারি. তুমি একটা সুবিধেমতো ঘর বেছে দিতে পারবে কাছে-পিঠে কোথাও? আমি বললাম, জরুর! বুঝলেন শিশিরবাবু, আমি বললাম. মুন্সিজী ইচ্ছে করলে বাঘের দুধভি এনে দিতে পারে। আপনি টাকা ফেলুন।

অদ্ভুত লাগলো মুন্সিজীকে শিশিরের। ঠিক সেইরকমই আছে। সেই-রকম একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলা। কিন্তু খবরটা মুন্সিজী কী দিলো তাকে? কারবার গুটোলো মানে?

মুন্সিজী বললে, ট্র্যাঙ্কটা পায়ের কাছে নিয়ে কতক্ষণ এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন? দিন. আমার মাথায় তুলে দিন।

—না-না-আমি হাতে ঝুলিয়ে নিচ্ছি। খুব ভারী নয়। চলো, বাড়ি চলো।

মুন্সিজী বললে,—ও বাড়িতে গিয়ে কী আর করবেন শিশিরবাবু? দেওয়াল ভেঙে, মেঝে খুঁড়ে, সে এক কাণ্ডই করে তুলেছে ওরা! সব ভাগ হচ্ছে। ভাগে ভাগে ভাড়া দেওয়া হবে। বাড়ির সামনে ঐ রাবিশ জড়ো করা হয়েছে, দেখছেন না?

—বাবুরা?

মুন্সিজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি ট্র্যাঙ্কটা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি দেখা করে আসুন।

শিশির আর কিছু না বলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অফিসঘর কিন্তু তেমনি আছে। তার সামনের দেওয়ালের খানিকটা ভাঙা।

—কে?

অফিসঘরের মধ্যে বড়োবাবু বসেছিলেন একা—চুপচাপ। পায়ে তখনো প্লাস্টার করা। ক্রাচ্ নিয়ে নিচে নেমেছেন। ঘরের কোণে ক্রাচ দুটো শোভা পাচ্ছে।

সে সাড়া দিয়ে বললে, আমি শিশির।

ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো বড়োবাবুর। বললেন, শিশির? তা, কী মনে করে?

একটু অবাকই হলো শিশির। সে তো এ-বাড়িরই মানুষ, এ-বাড়িরই

বাসিন্দা একজন! অথচ বড়োবাবুর গলার স্বরে মনে হচ্ছে, সে যেন বাইরের কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে।

শিশির এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলো, বললো, আমি এই মাত্র বম্বে থেকে হাওড়া এসে পৌঁছলাম।

—তুমি না জাহাজে ছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে জাহাজ ছেড়ে অন্য জাহাজে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বম্বে এলাম। এইটুকু আসতেই দিন পনেরো লাগলো। সুয়েজের মুখে আটকে থাকতে হয়েছিল।

—ও,—বড়োবাবু আর কিছু বললেন না।

শিশির জিজ্ঞাসা করলো, - মেজোবাবু-সেজোবাবু কোথায়?

—মেজোবাবু? —বড়োবাবু উত্তর দিলেন, - আছে কোথাও। তবে তোমার মুরুব্বি সেজোবাবু এখানে থাকে না। একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেছে। তুমি বরং সেখানেই যাও। কাছেই।

বলেই হেঁকে উঠলেন, এই, কে আছিস? একে সেজোবাবুর বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে আয় তো?

শিশির অবাক হলো, ব্যথিত হলো। অভিমান-ভারাক্রান্ত গলায় বললে, আজ্ঞে, দরকার নেই, আমি চিনে যেতে পারবো।

—ঠিক আছে।

ঠিক যেন মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়িটার বাইরে এলো শিশির।

মুন্সিজী বললে,—কী হলো স্যার?

—ভুল হয়েছিল—শিশির বললে,—ট্যাক্সটা দাও। কোনো সস্তার মেস্-টেস্ খুঁজে নেই।

কেন! —মুন্সিজী বললে,—সেজোবাবুর কাছে চলুন না?

শিশিরের গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। বললো,—না। তিনিও যদি তাড়িয়ে দেন!

মুন্সিজী একটু ভ্রূ কুঁচকে বললে,—তিনি কি ওরকম হবেন? বলা যায় না। আপনি এখন পুরোপুরি জাহাজী লোক। ডাঙার লোকেরা আর কি আপনাকে পেয়ার করবে?

স্তম্ভিত হয়ে গেল শিশির। কী বললে মুন্সিজী? জাহাজের লোককে মাটির মানুষেরা ভালোবাসে না?

মুন্সিজী অল্প একটু হাসলো। বললে, —তার থেকে আমার সঙ্গে আপনি আর এক জায়গায় চলুন। ডাকবো ট্যাক্সি? রেস্ত আছে?

—তা আছে।

—ব্যস-ব্যস-ঠিক আছে। এই ট্যাক্সি?

মুন্সিজী হাঁক ডাক করে একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করালো। বললে, উঠুন?

উঠে বসবার পর শিশির জিজ্ঞাসা করলো, যাচ্ছি কোথায় আমরা?

মুন্সিজী বললে, সত্যি বলবো স্যার? আমার এই গরিবখানায়। ওখানে ট্র্যাঙ্কটা রেখে একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে তারপর সবার সাথে দেখা করতে বেরুবেন।

—মুন্সিজী?

—কী স্যার?

—তুমিও কি জাহাজী মানুষ?

মুন্সিজী বললে, জরুর। জাহাজে না গেলেও জাহাজী মানুষ। পরের ডেরায় ভাড়া দিয়ে মাথা গুঁজে যারা থাকে, ভাড়া দিতে না পেরে এ-ডেরা সে-ডেরা করে বেড়ায়, তারা জাহাজী মানুষ ছাড়া আর কী, শিশিরবাবু?

শিশির হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলো শুধু, আর কিছু বললো না।

—কে?

—আজ্ঞে, আমি শিশির।

সেজোবাবু ঘরের পর্দা ঠেলে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ওকে দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গেলেন।

—কী রে, কোথা থেকে? আয়—ভেতরে আয়—থাক আর প্রণাম করতে হবে না।

শিশির ভিতরে ঢুকতেই সাদা শাড়ি-পরা একটি মহিলা তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সেজোবাবু বললেন, আরে! একে দেখে লজ্জা পাচ্ছিস্ কী? এ শিশির।

মহিলাটি মুখ ফেরালেন।

আগের থেকে শরীর হয়েছে আরও লাবণ্যময়ী। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর!

—আপনি!

সুষমা মুখ নিচু করলো। সেজোবাবু বললেন,—তুই শিশিরের সঙ্গে কথা বল। আমি ততক্ষণ বাইরে গিয়ে একটা জরুরি ফোন সেরে আসি। জানো শিশির, এ বাড়িতে এখনো ফোন আসে নি।

সেজোবাবু বাইরে যেতেই সুষমা মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো, বললো, জাহাজ থেকে ছাড়া পেলে ?

শিশির বললে, আমিই ছেড়ে চলে এলাম।

—কেন ?

—কী জানি। একটু বসবো ?

সুষমা বললো,—বসো। আমি এখানে থাকি না। একটু আগে এসেছি সেজদার সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখি, বউদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে কী এক বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে।

শিশির বললে, কোথায় থাকেন আপনি ?

—টালিগঞ্জে।

—ওখানেই শ্বশুরবাড়ি ?

সুষমা বললে, হ্যাঁ। ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে থাকি। আমরা দুজন।

একটুক্ষণ সময় পার হলো নীরবে।

শিশির বললে, কবে হলো ?

—কী ?

—বিয়ে ?

সুষমা ওর বলার ধরণে একটু হেসে ফেললো,—মানুষ হয়েছো দেখছি। আকারে প্রকারে সে মানুষ বলে চেনা যায় না! যাই হোক, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেই। দিন পনেরো হলো বিয়ে হয়েছে। বড়দা-মেজদার অমত ছিল। সেজদার চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

শিশির একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে, আমি কিন্তু এটা ভাবি নি।

—কেন ?—সুষমা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে,—কী ভেবেছিলে তুমি ?

—আমি ভেবেছিলাম,—শিশির বললে, বোম্বের সেই বসন্তবাবু—

হেসে উঠলো সুষমা। হাসতে হাসতে রাঙা হয়ে উঠলো মুখখানা। তারপরে বললে, সেই মানুষই তো। উনি বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসেছেন। আলাদা ব্যবসা করছেন। সেজদাও আছে ওঁর সঙ্গে।

শিশির চুপ করে রইলো। সুষমাও নীরব। কোথায় একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে কটা যেন বাজলো।

সুষমা ব্যস্ত হয়ে বললে, কী আশ্চর্য, সেজদা কোথায় গেল ফোন করতে ? এখনো আসছে না যে!

শিশির মুখ তুলে ওর দিকে সোজা তাকালো, বললে, ভাবছিলাম উত্তর পাবো।

—কিসের।

—আমার চিঠির।

সুষমার চোখে ফুটে উঠলো তীরস্কারের তীর্যক ভঙ্গি। বললে,—কেন?

—বুঝতে পারছেন না, কেন?

সুষমা একটু বিরক্ত হয়েই বললে,—না।

শিশির বললে, জাহাজে আমাকে পাঠালো কে? আপনি বলবেন, সেজদা। আমি বলবো, না, যে আমাকে পাঠিয়েছে, তার নাম—সুষমা।

মুখখানা মুহূর্তে যেন সাদা হয়ে গেল সুষমার। বললে,—আস্পর্ধা দেখছি ভীষণ বেড়েছে! নাম ধরে ডাকা?

শিশির বললে, ভুল করবেন না, এ স্পর্ধা আপনিই দিয়েছিলেন, মনে করে দেখুন।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো শিশির, বললে,—আমি চললাম। সেজদা এলে বলবেন, শিশিরবাবু থাকলেন না, চলে গেলেন।

—তারপর?

ছেঁড়া মাদুরের ওপর কোলে একটা বালিশ টেনে নিয়ে বসেছিল শিশির। মুন্সিজী শিশিরের দেওয়া সিগারেটটার ধোঁয়া ছাড়ছিল খুশি মনে।

শিশির বললে, তারপর? সেজোবাবু দেখতে পেলেন না, আমি ঠিক ভিড়ের মধ্যে মিশে বেন্টিক স্ট্রীটে গিয়ে পড়লাম। আমি যে এখানে তোমার কাছে আছি, বলো নি তো?

—জী, একেবারেই না—মুন্সিজী বললে,—এরই নাম মুন্সিজীর জবান। লেকিন শিশিরবাবু, আপনি কি সাচমুচ্ জাহাজেই ফিন্ চলে যাবেন নাকি?

—জরুর!—শিশির বললে,—আমি সবাইকে ধরাধরি আরম্ভ করেছি। একটু আধটু খরচ পত্তরও করতে হবে। তা হোক, মাটি আমার আর সইবে না মুন্সিজী, আমার জলই ভালো। জলে জলেই ঘুরবো। দু-একবার ডাঙায় নামবো, আবার যাবো জলে।

মুন্সিজী সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিলো। তারপরে বললে, সেজোবাবু শুনলে আপনাকে কভি ছাড়বে না।

—খুব ছাড়বে!—শিশির বললে, ওদের আমি কে, সেটা বলো? কেউ না। ছাড়বে না কেন?

—সেজোবাবু আপনাকে পেয়ার করে।

মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলো শিশির, বললে,—খবরদার মুন্সিজী ও কথাটা বলবে না। ওর থেকে বেশি মিথ্যে কথা দুনিয়ায় আর নেই! এখন দেখছি, একজন আমাকে ঠিকই বলেছিল। আমি তার একজনের স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বলে তাকে আপনার করে নিতে পারি নি। সে কিন্তু আমার ভাগ্যরেখাটিকে ঠিক দেখতে পেয়েছিল।

কে? কার কথা বলছেন শিশিরবাবু?

শিশির বললে,—শুনতে চাও? সেই অ্যান্টিলোপ জাহাজের কথা। ক্যাপিতান তাকে ডাকতো 'অ্যান্টিলোপী' বলে। কথাটাব মানে কী জানো? হরিণী। কিন্তু তাকে আর আমি পাবো না। আমি বন্দরে বন্দরে তাকে খুঁজে বেড়াবো। সে ঠিক আমাব আগে আগে ছুটবে, তার নাগাল আমি আর কখনো পাবো না। না-ই বা পেলাম, ছোটার মূল্য কি কম? দুনিয়ায় তামাম আদমিই তো ছুটে বেড়াচ্ছে! তাই না, কমরেড?

মুন্সিজী অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওরা লক্ষ করেনি, বাইরে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ঝর-ঝর—ঝম-ঝম। দেখতে দেখতে বস্তির ভিতরকার বাঁধানো উঠোনটা জলে জলে একাকার হয়ে গেল। কোন্ ঘরের এক বাচ্চা বুঝি জলের ওপর কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে। সেগুলো ভাসতে ভাসতে ওদের চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ওরা দুজনেই সেই দৃশ্যটা দেখতে লাগলো একমনে, চুপচাপ।

খোলার চালের ওপর ঘন বর্ষা আরও জোরে নেমে এলো বুঝি। ঝড়ের বুকে জাহাজের মতো ঘরটা দুলতে লাগলো।

মুন্সিজী নির্বিকার। অভিজ্ঞ নাবিকের মতোই সে নিঃশঙ্কচিত্তে বসে রইলো, শিশিরের পাশাপাশি।